GIFT

"নেতৃত্বের সংকট প্রেক্ষিত বাংলাদেশ"

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞানে এম.ফিল. ডিগ্রির জন্য উপস্থাপিত গবেষণা অভিসন্দর্ভ

গবেষক

এস, এম, রফিকুল ইসলাম

রেজিস্ট্রেশন নং-১৪৪

শিক্ষাবর্ষ ঃ ২০০২-২০০৩

রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ঢাকা-১০০০।

Dhaka University Library
449999

449999

তত্ত্বাবধায়ক

অধ্যাপক ড. হাসানুজ্জামান চৌধুরী

রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ঢাকা-১০০০।

জমা দানের তারিখঃ ২৯/০৯/২০১০

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

M.

449999

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

ঘোষণাপত্র

আমি এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, "নেতৃত্বের সংকট প্রেক্ষিত বাংলাদেশ" শীর্ষক এম.ফিল. অভিসন্দর্ভটি সম্পূর্ণরূপে আমার নিজস্ব গবেষণাকর্ম। আমার জানামতে এ শিরোনামে ইতোপূর্বে অন্য কেউ গবেষণা করেনি। এম.ফিল. ডিগ্রির জন্য উপস্থাপিত এ অভিসন্দর্ভ বা এর অংশ বিশেষ অন্য কোনো বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোনো প্রকার ডিগ্রি বা প্রকাশনার জন্য আমি উপস্থাপন করিনি।

এস, এম, রফিকুল ইসলাম

এম.ফিল. গবেষক

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ঢাকা-১০০০।

449999

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

অনুমোদন পত্র

জনাব এস, এম, রফিকুল ইসলাম কর্তৃক পেশকৃত "নেতৃত্বের সংকট প্রেক্ষিত বাংলাদেশ" শীর্ষক গবেষণা অভিসন্দর্ভটি আমার তত্ত্বাবধানে গবেষকের এককভাবে সম্পাদিত একটি মৌলিক গবেষণা। গবেষণা অভিসন্দর্ভটি মাস্টার অব ফিলসফি ডিগ্রি লাভের প্রয়োজনীয় চাহিদার আংশিক পরিপূরক হিসেবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদভুক্ত রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগে উপস্থাপনের জন্য অনুমোদন করা হলো।

449999

২৭/৫/১০

অধ্যাপক ড. হাসানুজ্জামান চৌধুরী

গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক

রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ঢাকা-১০০০।

অধ্যাপক,
রাষ্ট্র বিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

সমগ্র বিশ্ব আজ গভীর সংকটে নিপতিত। রাষ্ট্রসমূহ স্থবিরতায় নিমজ্জিত। রাষ্ট্রে-রাষ্ট্রে, জাতিতে-জাতিতে, সংঘাত ও সংঘর্ষ নিত্যদিনের ঘটনা। পৃথিবীর একপ্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্তে চলছে যুদ্ধ, সংঘর্ষ ও সংঘাত। সৃষ্টিশীলতা, উদ্ভাবন, উন্নয়ন ও বন্ধুত্বের পরিবর্তে চলছে স্থবিরতা, ধ্বংস, বিপর্যয় ও শত্রুতা। শুভবুদ্ধি, শুভশক্তি ও সংস্কৃতায়িত সমাজের পরিবর্তে জঙ্গিবাদ, মৌলবাদ, পশ্চাদমুখিতা মানুষকে পেয়ে বসেছে। মানবতার ধ্বংসস্তূপের মাঝে অমানবিকতার বিকাশ ঘটছে। বিশ্বজুড়ে শোষণ, বঞ্চনা ও বৈষম্য বাড়ছে। ফলে অস্থিরতা ও অস্থিতিশীলতাও বাড়ছে। হত্যা, খুন, গুম ও বোমাবাজি নিত্যদিনের ঘটনায় পরিণত হচ্ছে। অকাতরে প্রাণ হারাচ্ছে মানুষ। এসব কিছুর মূলে রয়েছে যথাযথ নেতৃত্বের সংকট। স্বাধীনতাত্তোরকালে বাংলাদেশেও নেতৃত্বের সংকট প্রকট আকার ধারণ করেছে। অথচ এক কালজয়ী নেতৃত্ব ও মহান মুক্তিযুদ্ধের মধ্যদিয়ে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে। ৩০ লক্ষ শহীদের রক্তের বিনিময়ে ১০ লক্ষ মা-বোনের ইজ্জতের বিনিময়ে অর্জিত হয়েছে স্বাধীনতা। ৯ মাসের রক্তক্ষয়ী মুক্তি সংগ্রামের মধ্যদিয়ে দেশ স্বাধীন হয়েছে, চূড়ান্ত বিজয় অর্জিত হয়েছে। এক সাগর রক্তের বিনিময়ে বাংলাদেশ স্বাধীন হলেও এদেশের কোটি কোটি মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তি, যেমন আজও সম্ভব হয়নি তেমনি একটি সুস্থ গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক সংস্কৃতি অর্জন সম্ভব হয়নি। যার মূলে নেতৃত্বের সংকট। কোটি কোটি মানুষ, জাতিকে পথ দেখায় না। পথ দেখায় একজন নেতা। যার অঙ্গুলি হেলানে জাতি অসম্ভবকে সম্ভব করে। বন্ধনের শৃঙ্খল ছিন্ন করে। নেতা জাতিকে স্বপ্ন দেখায়। বাঁচার মন্ত্র শেখায়। মুক্তির কৌসল তুলে ধরে জাতির সামনে। বর্তমান বিশ্বায়নের যুগে নেতা জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে কৌসুলি নেতৃত্ব দিয়ে জাতীয় স্বার্থকে সমুন্নত রেখে, বিশ্বের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলবেন। দেশের অর্থনীতি, রাজনীতি ও সমাজব্যবস্থাকে টেকসই ও যুগোপযোগী করে গড়ে তুলবেন। কিন্তু ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর যে কারণেই হোক কাঙ্ক্ষিত নেতৃত্বের অভাব লক্ষ্য করা গেছে বলেই **"নেতৃত্বের সংকট প্রেক্ষিত বাংলাদেশ"** শীর্ষক গবেষণাকর্মটি বাস্তবতার নিরিখে যথেষ্ট গুরুত্বের দাবি রাখে।

গবেষণার ক্ষেত্রে আমার দক্ষতা ও যোগ্যতার অভাব সুবিদিত। বাংলাদেশের বর্তমান অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থা দেখে আমার বড় কষ্ট লাগে। কতো সংগ্রাম, কতো আত্মত্যাগ, কতো জীবনের বিনিময়ে দেশ স্বাধীন হলো। অথচ আজ মানুষের দূরাবস্থার শেষ নেই। কষ্টের

Dhaka University Institutional Repository

সীমা নেই। লক্ষ লক্ষ বেকার জনগণ ধুঁকে ধুঁকে মরছে। সন্ত্রাস, নৈরাজ্য, শোষণ ও নির্যাতন সকল সীমা অতিক্রম করে গেছে। দেশের সম্পদ মুষ্টিমেয় মানুষ দখল করে রেখেছে। এমনকি বিদেশে পর্যন্ত পাচার করছে। মানুষ শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত, স্বাস্থ্যসেবা পাচ্ছেনা। বখাটের দৌরাত্ম্য কিশোরীকে আত্মহননে বাধ্য করছে। ক্ষুধার জ্বালায় মা, শিশু সন্তানকে হত্যা করে আত্মহত্যা করছে। ছিন্নমূল মানুষের ভিড়ে নগরী ভারাক্রান্ত। প্রিয় জন্মভূমি আজ অচেনা দেশে পরিণত হয়েছে। কেন এমন হলো? নেতৃত্বের সংকটকেই অন্যতম কারণ বলে মনে হয়েছে। সে জন্যেই এ ক্ষুদ্র প্রয়াস। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় লাইব্রেরি, পাবলিক লাইব্রেরি ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের সেমিনার থেকে প্রয়োজনীয় বই ও জার্নাল আমার গবেষণায় যথেষ্ট সাহায্য করেছে। তাছাড়া যখনই বিষয় সংশ্লিষ্ট কোনো বইয়ের সন্ধান পেয়েছি, তা সংগ্রহ করে সাহায্য নিয়েছি অকাতরে। আমার পরম শ্রদ্ধেয় শিক্ষক ও তত্ত্বাবধায়ক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. হাসানুজ্জামান চৌধুরীর অকুণ্ঠ সাহায্য, উৎসাহ, উদ্দীপনা, প্রেরণামূলক বক্তব্য ও দিক নির্দেশনা আমাকে এ কঠিন দুরূহ এ গুরুভার গবেষণাকর্মটির সফল পরিসমাপ্তিতে একান্ত ভাবে সাহায্য করেছে। তিনি প্রচণ্ড ব্যস্ততার মাঝেও ভীষণ আন্তরিকতার সঙ্গে আমার পাণ্ডুলিপি পড়ে মূল্যবান পরামর্শ প্রদান করেছেন ও প্রয়োজনীয় তথ্যের সমাবেশ ঘটাতে সাহায্য করেছেন। তত্ত্বাবধায়ক স্যার অনেক ব্যস্ততার মাঝেও আমাকে বিস্তর সময় দিয়ে, অনুপ্রেরণা দিয়ে ও মূল্যবান নির্দেশনা দিয়ে অপরিশোধ্য ঋণে আবদ্ধ করেছেন। এম.ফিল. প্রোগ্রামে ভর্তি হওয়া থেকে শুরু করে শেষ পর্যন্ত রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের শ্রদ্ধেয় শিক্ষকমণ্ডলীর মূল্যবান পরামর্শ, সাহায্য-সহযোগিতা ও দিক নির্দেশনা **"নেতৃত্বের সংকট প্রেক্ষিত বাংলাদেশ"** এর মতো একটি জটিল ও গুরুভার বিষয়ে ভাববার, অনুধাবন করার ও অনুসিদ্ধান্তে পৌঁছবার প্রয়োজনীয় চিন্তার রসদ জুগিয়েছে। এজন্য বিভাগীয় শিক্ষক অবসরপ্রাপ্ত এম. সাইফুল্লাহ ভূঁইয়া, অধ্যাপক ড. আবদুল ওদুদ ভূঁইয়া, অধ্যাপক ড. সাব্বীর আহমেদ, সর্বোপরি রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. শওকত আরা হোসেন সহ সকল শিক্ষকদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

গ্রন্থাগার ব্যবহারের জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম.ফিল. শাখার কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ, জাতীয় গ্রন্থাগারের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের সেমিনারের দায়িত্বপ্রাপ্ত জনাব মোঃ আব্দুল হাকিম ভাই, এম.ফিল. শাখার আব্দুল মান্নান ভাই, অফিস সহকারী সাঈদ ভাইসহ ডিপার্টমেন্টের সকলের কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। গবেষণার প্রতিটি স্তরে মূল্যবান পরামর্শ, আলোচনা ও তথ্য দিয়ে আমাকে গবেষণার কাজটি সম্পন্ন করতে বিপুল উৎসাহ

Dhaka University Institutional Repository

জোগানের জন্য এম.ফিল. প্রোগামের সহপাঠী বন্ধুবর মোঃ এখলাসুর রহমান টুটুল, মোঃ নুরুল আমীন হিরুকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। তবে সার্বক্ষণিক খোঁজ-খবর নিয়ে এম.ফিল. প্রোগ্রামের গবেষণা কর্মটি সম্পন্ন করতে সব সময় আমাকে উৎসাহ দিয়েছেন আমার মা ও বাবা। গভীর রাতেও দেখেছি, মা বিনীদ্র, জানতে চেয়েছেন লেখালেখির সর্বশেষ অবস্থা। এছাড়া আমার বড়বোন মাহ্মুদা নাসরিন, ভাগ্নী তাবাচ্ছুম ও ভাগ্নে মাহি আমার গবেষণা কর্মে আনন্দের খোরাক যুগিয়েছে।

একজন আইনজীবী হিসেবে পেশার অতিরিক্ত এ গবেষণাকর্মটি সম্পন্ন করতে আমাকে সার্বক্ষণিক অনুপ্রেরণা যুগিয়েছেন আমার বড়ভাইতুল্য অ্যাডভোকেট হোসেন আলী, অ্যাডভোকেট কামরুল ইসলামসহ বহু সহকর্মীবৃন্দ। আমি আরও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি আমার সহপাঠী এম.ফিল. গবেষক রুমা আক্তার, নাজনীন ও সুকান্তাকে। তাদের নিরলস প্রেরণা ও উৎসাহ আমাকে শক্তি যুগিয়েছে গন্তব্যে পৌছার। আমার ছোটভাই আশিকুল ইসলাম মাশুক ও নাসির উদ্দিনসহ সকলকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি প্রেরণা দানের জন্য।

পরিশেষে কম্পিউটার কম্পোজে সহায়তা করার জন্য বিশেষ ধন্যবাদ জানাচ্ছি তোফায়েল আহম্মদ, শাহীন ও মোকসেদ ভাইকে।

এস, এম, রফিকুল ইসলাম
এম.ফিল. গবেষক
রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা-১০০০।

Dhaka University Institutional Repository

সার-সংক্ষেপ

বাংলাদেশ বিশ্বের একটি অন্যতম দরিদ্র দেশ। স্বাধীনতার ৩৯ বছর পরও গণমানুষের পূর্ণাঙ্গ মুক্তি ঘটেনি। একদা এদেশ ছিল সুজলা, সুফলা, শস্য শ্যামলা। আজ বড় বিবর্ণ। ৩০ লক্ষ শহীদের রক্তের বিনিময়ে ১০ লক্ষ মা-বোনের সম্ভ্রমের বিনিময়ে ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে। এরপর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের শাসনামল শুরু হয়। যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশে অতিদ্রুত একটি সংবিধান প্রণীত হলো। ভারতীয় মিত্রবাহিনীকে ফেরত পাঠান হলো। কিন্তু শেষ পর্যন্ত অনেক অর্জন সত্ত্বেও মুজিব সরকার দেশি-বিদেশি চক্রান্তের শিকার হয়ে এবং নেতৃত্বের সংকটের কারণে, দলীয় নেতাকর্মিদের দুর্নীতি ও সীমান্তপাচারের কারণে বাংলাদেশ "তলাবিহীন ঝুড়ি"-র খেতাবে ভূষিত হয়। দেশে দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়, অগণিত মানুষ মরতে থাকে অনাহারে। সংকটে নিপতিত বঙ্গবন্ধু দ্বিতীয় বিপ্লব ঘোষণা করেন। চিরকালীন স্বপ্ন সংসদীয় গণতন্ত্রের অবসান করে একদলীয় শাসন "বাকশাল" কায়েম করতে চাইলেন। চারটি পত্রিকা বাদে সকল পত্রিকা বন্ধ করে দিলেন। মানুষ হতবিহ্বল হলো। এরই মধ্যে ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের মর্মান্তিক ঘটনা ঘটলো। বঙ্গবন্ধু স্বপরিবারে নিহত হলেন। দেশে সামরিক শাসন জারি হলো। জেনারেল জিয়াউর রহমানের শাসনামল ছিল ১৯৭৭ থেকে ১৯৮১ পর্যন্ত। অতঃপর ১৯৮২ সালে লে. জে. হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ ক্ষমতা দখল করেন এবং ১৯৯০ সালে পদত্যাগ করেন, জনতার দাবির মুখে। ১৯৯১ সালের পর থেকে দেশ পুনরায় সংসদীয় সরকার ব্যবস্থায় ফিরে যায়, অদ্যাবধি চলছে। কিন্তু মানুষের ভাগ্যের পরিবর্তন হলো না। সংকট থেকেই গেল। আর এ সংকট হলো নেতৃত্বের সংকট। রাজনৈতিক দলে নেতৃত্বের সংকট, সিভিল সোসাইটিতে নেতৃত্বের সংকট। বক্ষমান গবেষণায় নেতৃত্বের সংকটের স্বরূপ অনুসন্ধান, উদ্‌ঘাটন ও তা নিরসনের উপায় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। যা নেতৃত্বের সংকট নিরসনে সহায়ক ভূমিকা রাখবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

Dhaka University Institutional Repository

সূচিপত্র

ঘোষণাপত্র			iii
অনুমোদন পত্র			iv
কৃতজ্ঞতা স্বীকার			v
সার-সংক্ষেপ			viii
প্রথম অধ্যায়	:	ভূমিকা	১-২৮
	:	তত্ত্বগত কাঠামো	
	:	গবেষণার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা	
	:	গবেষণার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য	
	:	অনুকল্প গ্রহণ	
	:	গবেষণা পদ্ধতি	
	:	গবেষণার সীমাবদ্ধতা	
দ্বিতীয় অধ্যায়	:	বাংলাদেশে বিভিন্ন শাসন আমলে নেতৃত্বের স্বরূপ	২৯-১৫০
		(ক) শেখ মুজিবুর রহমানের শাসনামল	
		(খ) জিয়াউর রহমানের শাসনামল	
		(গ) হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদের শাসনামল	
		(ঘ) বেগম খালেদা জিয়ার শাসনামল	
		(ঙ) শেখ হাসিনার শাসনামল	
তৃতীয় অধ্যায়	:	বাংলাদেশের রাজনৈতিক নেতৃত্বের সংকটের কারণ	১৫১-১৯০
		(ক) প্রশাসনিক দুর্বলতা	
		(খ) রাজনৈতিক জ্ঞান ও দক্ষতার অভাব	
		(গ) প্রাতিষ্ঠানিক জ্ঞানের অভাব	
		(ঘ) মনস্তাত্ত্বিক ও সাংস্কৃতিক সংকট	
		(চ) নেতৃত্বের ঐতিহ্যের সংকট	
চতুর্থ অধ্যায়	:	বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতি ও নেতৃত্বঃ প্রত্যাশা ও প্রাপ্তি	১৯১-২১১
পঞ্চম অধ্যায়	:	সিভিল সোসাইটির নেতৃত্বের সংকট	২১২-২২৩
ষষ্ঠ অধ্যায়	:	নেতৃত্বের সংকট নিরসনের উপায়	২২৪-২৪১
		উপসংহার	২৪২-২৪৫
		সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী	২৪৬-২৬১

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

"নেতৃত্বের সংকট প্রেক্ষিত বাংলাদেশ"

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

নেতৃত্বের সংকট প্রেক্ষিত বাংলাদেশ

ভূমিকা:

বাংলাদেশ আজ একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র। বহু সংগ্রাম, আন্দোলন ও অকাতরে জীবন উৎসর্গের বিনিময়ে এদেশ স্বাধীনতা অর্জন করেছে বার বার এবং তা আবার ষড়যন্ত্রের কালোমেঘে ঢেকে গেছে। দুর্ভিক্ষ, খরা, বন্যা, মহামারী ও বিদেশি আগ্রাসন বহু বার গ্রাস করেছে লোকালয়, নগর-বন্দর, শস্যের ভূমি। প্রাণ হারিয়েছে নিরপরাধ ও সাধারণ জনগণ। সোনার বাংলা পরিণত হয়েছে শ্মসানে। সর্বশেষ এক সাগর রক্ত, ৩০ লক্ষ শহীদের জীবন ও ২ লক্ষ মা-বোনের ইজ্জতের বিনিময়ে ১৯৭১ সালে ৯ মাসের রক্তক্ষয়ী সংগ্রামে অর্জিত হলো স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ। জাতি পেল মানচিত্র, পতাকা, স্বাধীনতা ও সরকার। কিন্তু দীর্ঘলালিত স্বপ্নের বাস্তবায়ন আজও সুদূর পরাহত রয়ে গেল। প্রশ্ন হল এমন কেন হলো? এর জন্য দায়ী কি সাধারণ জনগণ, না যারা নেতৃত্ব দেন তারা? পুরা জাতির প্রত্যাশা ও প্রাপ্তির মাঝে সংকট কোথায়। গাঙ্গেয় সমভূমির এ বাংলার মানুষ সংগ্রামী। সহজ সরল পরিশ্রমী এদেশের ভূমি উর্বর, প্রকৃতিও বৈচিত্র্যময়। কবির ভাষায় সুজলা, সুফলা, শস্য, শ্যামলা আমাদের এ জন্মভূমি। কিন্তু অভাব, দারিদ্র্য, অশিক্ষা, পশ্চাতপদতা আজও আমাদের নিত্যসঙ্গী। মানুষের ভাগ্যের পরিবর্তন সুদূর পরাহত। দুর্নীতি ও দুঃশাসন আজ সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে মিশে আছে। এতসব কিছুর মূলে হয়তো অনেক কারণ বিদ্যমান। কিন্তু নেতৃত্বের সংকটকেই প্রধানতম কারণ হিসেবে বিবেচনা করে আলোচ্য গবেষণায় তার স্বরূপ উদ্‌ঘাটনের চেষ্টা করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

তাত্ত্বিক আলোচনা

তাত্ত্বিক বিবেচনায় নেতৃত্বঃ

ইতিহাস পূর্বকাল থেকেই মানুষ কোনো না কোনোভাবে নেতৃত্ব নির্ভর ছিল একথা নিশ্চিতভাবেই বলা চলে। আজকে নেতৃত্ব বলতে যতটা সুসংহত, মতাদর্শ ও দল, গোষ্ঠী বা সংগঠনকে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যাভিমুখী করে পরিচালিত করে একটি প্রত্যাশিত লক্ষ্যে পৌছে দেয়ার প্রয়াসকে বুঝায় তা হয়তো ইতিহাস পূর্বকালে ছিল না বা থাকার কথাও নয়। তবে যে কারণেই হোক মানুষ কাউকে না কাউকে নেতা মেনেছে। তার আদেশ, নির্দেশের আজ্ঞাবহ হয়েছে এবং তাকে মান্য করেছে এমন দৃষ্টান্ত ইতিহাসে দুর্লক্ষ্য নয়। এ কারণেই সমাজবিজ্ঞানে নেতৃত্বের ধারণাটি বেশ গুরুত্ব লাভ করেছে। শতাব্দির পর শতাব্দি জুড়ে পণ্ডিত মহলে নেতৃত্বের বৈশিষ্ট্য ও ধরন ধারণ নিয়ে তর্ক বিতর্কের ঝড় বয়ে গেছে। বস্তুত কোনো বিশেষ লক্ষ্যাভিমুখী কর্মকাণ্ডে জনগণকে উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করার কার্যক্রমই নেতৃত্ব।[১] একটি সংগঠিত গোষ্ঠীর লক্ষ্য নির্ধারণ ও লক্ষ্য অর্জন কার্যক্রমকে প্রভাবিত করার প্রক্রিয়াকে নেতৃত্ব বলে অভিহিত করা যায়।

নৃ-বিজ্ঞানের মতে আদিম সমাজই নেতৃত্বের সূতিকাগার। আরণ্যিক জীবনে মানুষ যখন প্রকৃতি ও প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে লড়াই করে বেঁচে থাকার জন্য যুথবদ্ধজীবনে সবচেয়ে শক্তিমান ব্যক্তিকে, যাপিত জীবন কাঠামোর আওতাই নেতা হিসাবে মেনে নেয়া হতো। পশু শিকার বা সংঘবদ্ধ বিরুদ্ধ শক্তির মোকাবেলায় তার সাহসী ভূমিকা থাকতো। যদিও যুথবদ্ধ জীবন ব্যক্তির প্রাধান্যকে, কখনো, কখনো খর্ব করেছে। তবে যৌথ নেতৃত্বকে সকলের সামগ্রিক কল্যাণে সাদরে গ্রহণ করেছে। তাই ঐতিহাসিকভাবে একথা সত্য যে, আদিম সমাজে ব্যক্তির বীরত্ব, সাহস ও সক্ষমতা তাকে নেতৃত্বের আসনে সমাসীন করেছে। আবার মাতৃতান্ত্রিক সমাজে পরিবার ও গোষ্ঠীবদ্ধ জীবনযাপনে নারীকেই নেতৃত্বের আসনে সমাসীন করা হয়েছে। এরই পথ ধরে মাতৃতান্ত্রিক সমাজে পরিবার ও গোষ্ঠীবদ্ধ জীবনযাপনে নারীর নেতৃত্বকে মেনে নেয়া হয়েছে। মূলত. আদিম মাতৃতান্ত্রিক সমাজে মা-ই পরিবারের প্রধান।[২] সমাজ বিকাশের ঐতিহাসিক ধারায় লক্ষ্যণীয় যে, আদিম সমাজে গোত্রপতি ছিল গোত্রের নেতা, দাস সমাজে দাস মালিক এবং সমাপ্ত সমাজে সামন্তপ্রভু ছিল নেতা।

---

[১] গুস্তাভ লা বঁ.-The Crowd অনুবাদঃ নুর মোহাম্মদ মিয়া, বাংলা একাডেমী, ঢাকা। পৃষ্ঠ-৭৫

[২] বাশার আফজালুল, "বাংলাদেশে নেতৃত্বের সমস্যা," লোকায়ত, ষষ্ঠ বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, ঢাকা, জুন-১৯৮৮। পৃষ্ঠা-১০

Dhaka University Institutional Repository

বস্তুত নেতৃত্বের আলোচনায় নেতৃত্ব কী বা কাকে বলে, নেতৃত্বের বৈশিষ্ট্য, নেতৃত্বের শ্রেণীবিভাগ ও নেতৃত্বের গুণাবলী প্রভৃতি বিষয় সংক্ষিপ্ত পরিসরে আলোচিত হবে।

নেতৃত্বের সংজ্ঞা ঃ

বিভিন্ন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী, সমাজবিজ্ঞানী, দার্শনিক ও মনোবিজ্ঞানী বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে নেতৃত্ব সম্পর্কে বহু মতামত ব্যক্ত করেছেন এবং নেতৃত্বকে সংজ্ঞায়িত করেছেন। সমাজ, দল, প্রতিষ্ঠান এবং সর্বোপরি রাষ্ট্রের কল্যাণে ব্যক্তির গৃহীত প্রচারিত ও কার্যে পরিণত যুক্তি, মতবাদ, আদর্শ ও কর্মপদ্ধতিই নেতৃত্বের বিষয়বস্তু হয়ে উঠেছে। নেতৃত্ব সম্পর্কিত মতবাদ ও ধারণার সংকলন নিম্নরূপ ঃ-

১। "Leadership may be considered as the act of influencing the activities of an (organized) organised group in its efforts towards goal setting and goal achievements." (Ralph Stogdill-1950)

২। নেতৃত্ব হচ্ছে এক ধরনের যোগ্যতা যা নারী পুরুষকে কোনো একটি সর্বজনীন উদ্দেশ্যে পরিচালিত করতে পারে।[৩] (মার্শাল মন্টোগোরামী)।

৩। সামাজিক অবস্থা কিংবা পরিবেশের প্রয়োজনীয়তা মেটানোর জন্য সম্পাদিত যে কাজ তাই হচ্ছে নেতৃত্ব। (ফিলিফ সেলজনিক)।

৪। Leadership is a process of influence between a leader and those who are followers (Hollander-1978)

৫। কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে জনগণকে প্রভাবান্বিত করার দৃঢ় যোগ্যতাই হচ্ছে নেতৃত্ব। (রবার্ট গোলেম বিউইস্কি)।[৪]

৬। নেতৃত্ব হচ্ছে সিদ্ধান্ত প্রণয়নের কর্তৃত্ব অর্জনের অধিকার ও অনুশীলন।

---

[৩] Pigors, Leadership on Domination, Milfom. 1935.

[৪] Cartwright, Political Leadership in Africa, Croom Helom, London, 1983, P-214.

Dhaka University Institutional Repository

৭। Leadership is the behaviour of an individual when he is directing the activities of a group towards a shared goal (Hemphill and Coons-1957)

নেতৃত্ব সম্পর্কে উপরিউক্ত সংজ্ঞাগুলো বিশদভাবে পর্যালোচনা করলে যে বিষয়গুলো স্পষ্ট হয়ে ওঠে তা নিম্নরূপঃ-

ক) যেখানে দল বা গোষ্ঠীর অস্তিত্ব বিরাজমান সেখানেই রয়েছে নেতৃত্বের অস্তিত্ব। অতএব, সামাজিক যুক্তির একটি বিশেষ প্রক্রিয়া হিসেবে নেতৃত্বকে বিবেচনা করা যায়, যার মাধ্যমে দলীয় সদস্যরা সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ও মূল্যবোধের আলোকে সার্বিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে। কাজেই নেতা হবার অপরিহার্য শর্ত হলো- দলের সদস্য হওয়া। কেননা, নেতার চিন্তাভাবনা ও আচরণের মাধ্যমেই প্রকাশিত হয় দলের আদর্শ, লক্ষ্য ও বাস্তব কর্মপন্থা। অর্থাৎ নেতার ওপরেই দলের নেতৃত্ব নির্ভরশীল।

খ) প্রকৃতপক্ষে নেতাকে দলের অন্যান্য সদস্যের তুলনায় শ্রেষ্ঠ ও উত্তম হতে হবে। নেতার সততা, চারিত্রিক শুদ্ধতা, সাহস, ত্যাগ ও বিচক্ষণতার কারণে তিনি দলের স্বভাবতই শ্রেষ্ঠ হয়ে উঠেন।

গ) যেহেতু একজন নেতা হন দল, সমাজ, গোষ্ঠী এবং সর্বোপরি একটি জাতির। কাজেই নেতাকে তার অনুসারীদের আশা, আকাঙ্ক্ষা, সুখ-দুঃখ, ব্যথা, বেদনাসহ যাবতীয় অনুভূতি উপলব্ধি করার ক্ষমতাসম্পন্ন হতে হবে। গণচেতনাকে হৃদয়ঙ্গম করতে ব্যর্থ হলে নেতার নেতৃত্ব বিফলতায় পর্যবসিত হতে বাধ্য। নেতাও তার অনুসারীদের আত্মিক ও মানসিক ব্যবধান যত কম হয় নেতা তত বেশি সফল হন।

ঘ) একজন নেতাকে অবশ্যই ভারসাম্যপূর্ণ জ্ঞানের অধিকারী হতে হবে। অনুসারীদের নার্ভ অনুধাবনের ক্ষমতা থাকতে হবে। জাতির অতীতকে চেতনায় ধারণ ও অনাগত ভবিষ্যত নির্মাণের মতো প্রজ্ঞা থাকতে হবে। তাকে হতে হবে দক্ষ নীতি নির্ধারক, প্রশাসক ও সংগঠক। নীতি ও আদর্শের ব্যাপারে নেতাকে হতে হবে একশত ভাগ খাঁটি এবং তার দৈনন্দিন কার্যকলাপ, আচার আচরণ, বাচনভঙ্গি এমন আকর্ষণীয় হতে হবে, যাতে করে দলীয় সদস্যরা তাকে আদর্শ মনে করে অনুকরণে উৎসাহী হয়।

Dhaka University Institutional Repository

ঙ) নেতৃত্ব প্রদানকারী নেতাকে ও ব্যক্তিকে অনুসারী দল, গোষ্ঠী বা জাতির সংহতি, ঐক্য ও অগ্রগতির মূর্ত প্রতীক হিসেবে দলীয় সদস্যদের কাছে গ্রহণযোগ্য হতে হবে।

চ) নেতা চরিত্র, আদর্শ, প্রজ্ঞা, দৃঢ়তা, দর্শন, প্রত্যুতপন্নমতিত্বের কারণে অনুসারীদের কাছে প্রত্যাশিত মুক্তির মূর্তপ্রতীক হয়ে উঠেন।

সুতরাং নেতৃত্ব হচ্ছে নেতার সক্ষমতার মানদণ্ড আচরণ ও মননের ব্যাপার এবং অনুসারীদের কাছে নেতার গ্রহণযোগ্যতা ও তাদেরকে প্রভাবিত করার বিষয় যা একই সঙ্গে অনুসারীদের বৈশিষ্ট্য, ইচ্ছা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করে থাকে। মূলত. নেতৃত্বের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে অনুসারীদেরকে নেতার লক্ষ্যাভিমুখী হওয়ার জন্য প্ররোচিত করার যোগ্যতা।[৫]

নেতৃত্বের ধরন

নেতৃত্বের তাত্ত্বিক আলোচনায় সমাজবিজ্ঞানীদের মাঝে নানা মতপার্থক্য থাকলেও একটি বিষয়ে ঐক্যমত্য রয়েছে। তাহলো নেতৃত্বের ধরন সম্পর্কে- তাই, নেতৃত্বের আলোচনায় দীর্ঘকাল ধরে তিনটি প্রধান ধরন নির্দিষ্ট হয়ে আছে। সেগুলো হলো ঃ-

১। স্বৈরতান্ত্রিক বা একনায়কসুলভ নেতৃত্ব।[৬]

২। অংশগ্রহণমূলক বা গণতান্ত্রিক নেতৃত্ব এবং

৩। অবাধ বা লাগামছাড়া নেতৃত্ব।

উল্লিখিত তিন ধরনের নেতৃত্ব সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করলে দেখা যাবে প্রত্যেকটিরই যেমন কিছু ইতিবাচক দিক রয়েছে, তেমনি নেতিবাচক দিকও রয়েছে। কোনো নেতৃত্বই যেমন পরিপূর্ণ নয়, তেমনি নেতৃত্বের সবগুলো ভালো উপাদানও একজন নেতার কাছে আশা করা যায় না।

---

[৫] সেনগুপ্ত, প্রমোদবন্ধু, সমাজ-মনোবিজ্ঞান,ব্যানার্জি পাবলিশার্স, কোলকাতা-১৯৯০, পৃষ্ঠা-৮৮।

[৬] আহমেদ কাজী জালাল, প্রশাসনিক নেতৃত্ব।

Dhaka University Institutional Repository

আচরণবাদী বিজ্ঞানীরা নেতৃত্ব সম্পর্কে এ যাবত তিন ধরনের তাত্ত্বিক প্রেক্ষাপট আলোচনা পর্যালোচনা করেছেন।[৭] সেগুলো হলো ঃ–

১। বিশেষত্ব তত্ত্ব (Trait theory)

২। আচরণতত্ত্ব (Behavioural theory)

৩। পরিস্থিতিগত তত্ত্ব Situational theory)

১। বিশেষত্ব তত্ত্ব (Trait theory)

নেতৃত্বের বিশেষত্ব তত্ত্ব কতগুলি অতিসাধারণ সনাতন বৈশিষ্ট্য ও ধারণার ওপর প্রতিষ্ঠিত যেমন- জন্মসূত্রে নেতা হয়, নেতা ক্ষণজন্মা, শতবর্ষে নেতা জন্মায় ইত্যাদি আপ্ত ধারণা, বিশেষ চারিত্রিক দৃঢ়তা, অসামান্য ও অনন্য সাধারণ ব্যক্তিত্ব, শিক্ষাগত যোগ্যতা ও বুদ্ধিবৃত্তিক সৃজনশীলতা এবং শারীরিক যোগ্যতা যা প্রাচীন সমাজে নেতৃত্ব প্রদানের যোগ্যতা বলে বিবেচিত ছিল।

নেতৃত্বের আলোচনায় অবশ্য একথা বলা হয়ে থাকে, সমাজতান্ত্রিক ম্যাক্স ওয়েবার উদ্ভাবিত আমলাতন্ত্রের মডেলে নেতৃত্বের যে ধারণা ব্যক্ত হয়েছে তা একটি বিশেষ ধারণার ওপর প্রতিষ্ঠিত। এ তত্ত্বের ওপর দীর্ঘকাল ধরে গবেষণা করে এর অসারতা প্রমাণ করে নেতৃত্ব সম্পর্কে নতুন দিক নির্দেশনা ও তত্ত্ব উপস্থাপন করা হয়েছে যার সার-সংক্ষেপ নিম্নরূপ ঃ-

১। সামর্থ্য (Capacity) যা বুদ্ধিমত্তা, সতর্কতা, সম্ভাব্য সুযোগ সুবিধা, স্বকীয়তা ও বিচার বুদ্ধির ওপর নির্ভরশীল।

২। সফলতা (Achievement) যা মেধা, প্রজ্ঞা ও ক্রীড়ামূলক মনোভাব দিয়ে অর্জন করতে হয়।

---

[৭] মজিদ মুক্তফা, লোক প্রশাসনের তাত্ত্বিক প্রসঙ্গ, প্রশাসনিক গবেষণা কেন্দ্র, ঢাকা।

Dhaka University Institutional Repository

৩। দায়িত্ব (Responsibility) যা পারস্পরিক নির্ভরশীলতা উদ্যোগ, অধ্যবসায় ও অটলতা, সাহসিকতা ও নিজের প্রতি আস্থা এবং উৎকর্ষ অর্জনের আকাঙ্ক্ষার ওপর নির্ভরশীল।

৪। অংশগ্রহণ (Participation) যা সক্রিয়তা বা কর্ম তৎপরতা, সামাজিক, সহযোগিতা ও সহমর্মিতা, অভিযোজন এবং সৌহার্দ্যপূর্ণ বিষয়ের ওপর নির্ভরশীল।

৫। পদমর্যাদা (Status) যা আর্থ-সামাজিক অবস্থা ও জনপ্রিয়তার ওপর প্রতিষ্ঠিত।

৬। পরিস্থিতি (Situation) যা মানসিক অবস্থা, পদমর্যাদা, দক্ষতা গ্রহণযোগ্যতা এবং অনুগামীদের স্বার্থ, উৎসাহ এবং অর্জিত আকাঙ্ক্ষা বা উদ্দেশ্যের ওপর নির্ভরশীল।

মূলত বিশেষত্ব তত্ত্বের সার সংক্ষেপ হলোঃ– নেতার উল্লিখিত আদর্শিক বৈশিষ্ট্যাবলী তাঁকে অনন্য সাধারণ নারী বা পুরুষে পরিণত করে। এ ধরনের নেতা লোক প্রশাসনের ব্যবস্থাপনার প্রয়োজনীয়তার উর্ধ্বে অবস্থান করে বলেই প্রতীয়মান হয়। তবে তৃতীয় বিশ্বের রাজনৈতিক অঙ্গনে এ ধরনের নেতৃত্বের উল্লিখিত বৈশিষ্ট্য কখনো গণমানুষের অভিন্ন স্বার্থে আবশ্যকতার অপেক্ষা রাখে, আবার কখনো কখনো তা নিন্দনীয় হয়ে প্রত্যাখ্যাত হয়ে থাকে।

২। আচরণবাদী তত্ত্ব (Behavioural Theory)

এ তত্ত্ব মূলত ফলপ্রসূ বা কার্যকর নেতৃত্বের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত আচরণের কারণগুলো নির্ণয় করে, নেতার আচরণশৈলী ও সম্পর্কের ওপর এ তত্ত্ব সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেয় এবং সেভাবেই এ তত্ত্ব বিকশিত হয়েছে। এ তত্ত্বে যা লক্ষ্যণীয় তাহলো নেতাকে অবশ্যই একটি নিয়ম পদ্ধতির মধ্যদিয়ে তাঁর অনুসারিদের সঙ্গে আচরণ করতে হবে, অনুসারীদের নির্দেশ, পরামর্শ প্রদান ও পরিচালনা করতে হবে। এতে ব্যর্থ হলে দলে বা সংগঠনে জটিলতা সৃষ্টি হতে পারে। এমনকি এক অস্বস্তিকর পরিবেশ সৃষ্টি হওয়াও অমূলক নয়। অন্যদিকে অনুসারীরা কিভাবে নেতার আচরণ গ্রহণ করবে অর্থাৎ তাদেরকে নেতা কিভাবে প্রভাবিত করছেন সেটাও বিবেচ্য ও লক্ষ্যণীয় দিক। এক্ষেত্রে নেতা প্রাতিষ্ঠানিক নিয়মাচার পালন করছেন কিনা কিংবা আইনানুগ আচরণ পদ্ধতি অবলম্বন করছেন কিনা সে বিষয়টিও বিবেচ্য হবে, অনুসারীদের নিকট। নেতার অনুসারী, অনুগামী, সহযোগী কিংবা অধঃস্তনরা কখনো অন্য ধরনের আচরণে নেতার ওপর

Dhaka University Institutional Repository

হতে আস্থা হারাতেও পারেন। আচরণবাদী তত্ত্ব নিয়ে এ যাবৎ বিশদ গবেষণা সম্পাদিত হয়েছে। গবেষণা শুরু হয়েছিল চল্লিশের দশকে। মোটামুটিভাবে দুই ধারায় এ গবেষণা সম্পন্ন হয় : যথাক্রমে-

(i) Ohio state university studies

(ii) University of michigan studies.[৮]

চল্লিশের দশকের গোড়ারদিকে ohio state university এর অন্তর্ভুক্ত Bureau of Business Research এর মাধ্যমে পরিচালিত গবেষণায় নেতার আচরণের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য নির্ণয়ের অনুসন্ধান করা হয়। এতে দুটি বিষয় নির্ণীত হয়।

১. প্রারম্ভিক গঠন (Initiative Structure)

২. বিষয় বিবেচনা (Consideration)

প্রারম্ভিক গঠনে নেতাদের অনুসারী কিংবা সংগঠনের অধঃস্তন এবং নেতা বা প্রধান নির্বাহীর মধ্যকার সম্পর্ক। বিশেষত সুষ্ঠু ও পরিকল্পিত যোগাযোগ পদ্ধতি গড়ে তোলা ও কার্যপ্রণালী প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে নেতার আচরণকে নির্দেশ করে। অন্যদিকে বিষয় বিবেচনায় নেতা দলের সদস্যদের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক, পারস্পরিক বিশ্বাস, শ্রদ্ধাবোধ আন্তরিকতা ও পরিচালনা বা নির্দেশনার আচরণগুলিকে নির্দেশ করে।

প্রায় একই সময় Michigan University এর অধ্যয়ন দল তাদের গবেষণায় সংগঠনের নেতৃত্বের ওপর পাঁচটি নির্ণায়ক উল্লেখ করেছিলেন।

১। পরিদর্শকের লক্ষ্য রেখা নির্ণয়

২। সহযোগিতা সম্পর্ক নির্ণয়

৩। সম্পর্কের নীতি নির্ণয়

৪। ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি নির্ণয়

৫। সংযোগ বিন্দুর ধারণা নির্ণয়

---

[৮] মজিদ মুস্তফা, প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

মূলত দুটি বৈশিষ্ট্যর পরিপ্রেক্ষিতে এ অধ্যয়নটি করা হয়েছে ঃ-

১। উৎপাদন ভিত্তিক এবং

২। উৎপাদক ভিত্তিক[৯]

১। **উৎপাদন ভিত্তিক ঃ** উৎপাদন ভিত্তিক নেতৃত্ব কর্মচারীকে সাংগঠনিক লক্ষ্য অর্জনের উপায় হিসেবে সর্বাধিক উৎপাদন করার নির্দেশ প্রদান করেন এবং সেভাবে কর্মপরিচালনা নির্দেশ করেন।

২। **উৎপাদক ভিত্তিক ঃ** উৎপাদক ভিত্তিক নেতৃত্ব কর্মক্ষেত্রে অধীনস্তদের সমস্যা নির্ণয় করে উন্নতমানের কাজ সম্পাদনের জন্য দক্ষ, সক্ষম ও প্রশিক্ষিত জনশক্তি কিংবা কর্মিদল সংগঠনের ওপর দৃষ্টি রাখেন।

৩। পরিস্থিতিগত তত্ত্ব (Situational Theory) ঃ

পরিস্থিতিগত তত্ত্বের মূল প্রতিপাদ্য হচ্ছে স্থান কাল বিবেচনা করে নেতা তার অনুসারীদের সঙ্গে কেমন আচরণ করেন এবং তার ভিত্তিতে তিনি কী সিদ্ধান্ত প্রণয়ন করেন। এর অন্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এক পরিবেশ থেকে অন্য পরিবেশে এ আচরণের তারতম্য। অর্থাৎ এক্ষেত্রে নেতৃত্বের ধরন একটি বিশেষ পরিস্থিতির ওপর নির্ভর করে গড়ে ওঠে এবং এ নেতৃত্ব সাধারণত তিনটি ধারণার ওপর ভিত্তি করে প্রতিপন্ন করা হয়। যথাঃ-

১। ধরন

২। গঠন

৩। সন্নিবেশ

এ প্রসঙ্গে সমাজতাত্ত্বিক Ralph M. Stogdill তাঁর গবেষণায় ফলপ্রসূ নেতৃত্বের বিবেচনায় বলেন, নেতৃত্বের গুণগতমান নির্ধারিত হয় সাধারণত নেতৃত্বের যোগ্যতা, বৈশিষ্ট্য এবং আরো

---

[৯] Stephen P. Robbins, The Adminstrative Process, 2nd ed. Prentice Hall Inc. Englewood Cliffs, 1980 Page-322.

Dhaka University Institutional Repository

কিছু গুণাবলীর ওপর যেগুলো সাধারণত নির্ধারিত হয়ে থাকে পারিপার্শ্বিকতার ওপর ভিত্তি করে।

এখানে Stogdill বিশেষ অবস্থায় একদল অনুসারীদের মাঝে কিভাবে একক ব্যক্তি মানুষ রূপে আবির্ভূত হন এবং বিশেষ অবস্থায় অনুসারীরা কিভাবে তাঁর নেতৃত্ব মেনে নেয় তা নির্দেশ করার চেষ্টা করেছেন।

এ তত্ত্বে বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়, একটি বিশেষ পারিপার্শ্বিক অবস্থায় একজন ব্যক্তিমানুষ তাঁর মেধা, মনন, বুদ্ধিমত্তা দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা এবং প্রখর দূরদৃষ্টির মধ্য দিয়ে পরিবেশ ও পরিস্থিতিকে তাঁর অনুকূলে এনে অনুসারীদের মাঝে প্রভাব বিস্তার করে সম্ভাব্য সমস্যা নিরুপণ ও সমাধানের ওপর নির্দেশ প্রদান করেন।

তাই একথা বলা যায়, নেতৃত্বে আচরণবাদী তত্ত্বের মূল কথা হলো নেতা ও অনুসারীদের মাঝে সংঘটিত পারস্পরিক আচরণ ও ক্রিয়াকর্ম এবং অপরপক্ষে পরিস্থিতিগত তত্ত্বের মূলভিত্তি হলো পারিপার্শ্বিকতার আলোকে নেতার ক্রিয়াকর্ম।[১০]

নেতৃত্বের শ্রেণীবিভাগ : (Classification of Leadership)

১। আরোপিত নেতৃত্ব (Ascribed leadership)

২। অর্জিত নেতৃত্ব (Achieved leadership)

৩। রীতিসিদ্ধ নেতৃত্ব (Formal leadership)

৪। প্রকৃত নেতৃত্ব (Real leadership)

৫। প্রভুত্বব্যঞ্জক নেতৃত্ব (Authoritarian leadership)

৬। গণতান্ত্রিক নেতৃত্ব (Democratic leadership)

৭। প্রত্যক্ষ সংযোগ নেতৃত্ব (Direct contact leadership)

---

[১০] মজিদ মুক্তকা, লোক প্রশাসনের তাত্ত্বিক প্রসঙ্গ, প্রশাসনিক গবেষণা কেন্দ্র, ঢাকা।

Dhaka University Institutional Repository

৮। দূরবর্তী সংযোগ নেতৃত্ব (Distant contact leadership)

৯। দার্শনিক নেতা (Thinker leader)

১০। কর্মী নেতা (Leader of action)

১১। অবাধ বা লাগাম ছাড়া নেতৃত্ব (Uncontrolled leadership)

১২। জনমত সৃষ্টিকারী নেতৃত্ব (Leadership of mobilizing public opinion)

১৩। ধর্মীয় নেতৃত্ব (Religious leadership)

১৪। প্রতীকী নেতৃত্ব (Symbolic leadership)

১৫। রাজনৈতিক নেতৃত্ব (Political leadership)

১। **আরোপিত নেতৃত্ব (Ascribed leadership):** যখন নেতৃত্ব বাইরে থেকে চাপিয়ে দেয়া হয় তখন তাকে আরোপিত নেতৃত্ব বলে। যেমন সেনাধ্যক্ষের নেতৃত্ব তাঁর ওপর আরোপ করা হয়। অবশ্য যে ব্যক্তির ওপর নেতৃত্ব আরোপিত হয় তিনি নিজগুণে পরবর্তীকালে নির্বাচিত নেতার অনুরূপ আসন লাভ করতে পারেন।

২। **অর্জিত নেতৃত্ব (Achieved leadership):** যখন নেতৃত্ব গোষ্ঠীর ব্যক্তিদের ভেতর থেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে উদ্ভূত হয় তাকে অর্জিত নেতৃত্ব বলে। রাজনৈতিক দলের সভাপতির নেতৃত্ব, সমবায় সংগঠনের সভাপতির নেতৃত্ব প্রভৃতি হলো অর্জিত নেতৃত্বের উদাহরণ।

৩। **রীতিসিদ্ধ নেতৃত্ব (Formal leadership):** প্রতিটি সমাজ কতগুলো সামাজিক সংগঠনের অধীন এবং কতগুলি রীতিনীতির নিয়ন্ত্রণাধীন। কতগুলো সমষ্টিগত প্রয়োজনকে কেন্দ্র করে সমাজ জীবনে সংগঠন গড়ে ওঠে। ফলে সমাজের সভ্যদের কতগুলো কার্যসম্পাদন করতে হয় বরং কতগুলো সামাজিক মানবীয় পরিস্থিতির আবির্ভাব ঘটে। যেমন, বিবাহ অনুষ্ঠান, সামাজিক মানবীয় কর্মকাণ্ডের অপরাপর অনুষ্ঠান প্রভৃতি। এসব সামাজিক মানবীয় কর্মকাণ্ডের অনুষ্ঠানের নেতা সমাজের বয়োজেষ্ঠ্য

Dhaka University Institutional Repository

ব্যক্তি অথবা অধিক শিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তিরাই এসব অনুষ্ঠানে নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। এদের কর্তৃত্বের মূলে গুণ বা সামর্থের পরিবর্তে পরিবারের ভূমিকা মুখ্য।

৪। **প্রকৃত নেতৃত্ব (Real leadership):** প্রকৃত নেতৃত্বের ক্ষেত্রে নেতা অপরকে নিয়ন্ত্রণ করেন। যখন এ ধরনের নেতৃত্বের প্রয়োজন দেখা দেয় এবং যিনি সভ্যদের একটি নির্দিষ্ট পথে চালিত করেন এবং তাদের কাজের মধ্যে ঐক্য আনয়ন করতে পারেন তিনিই নেতা হিসেবে আবির্ভূত হন। এক্ষেত্রে নতুন নতুন বিষয় উদ্ভাবনের ফলে সমাজের অর্থনৈতিক কাঠামোর পরিবর্তন ঘটে এবং গতানুগতিক সামাজিক সম্পর্কে সংশোধন অনিবার্য হয়ে দেখা দেয়। যখন গোষ্ঠীর সভ্যদের নৈতিক চেতনায় অগ্রগতি সাধিত হয় এবং জীবনে নতুন ও মূল্যবোধের উপলব্ধির প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয় তখন এ ধরনের নেতার প্রয়োজনীয়তা সমাজে দেখা দেয়। এ সময় যাদের মধ্যে অন্তর্দৃষ্টি রয়েছে, যারা নতুন মূল্যবোধের অধিকারী, যাদের রয়েছে উচ্চতর দৃষ্টিভঙ্গি এবং কাজ শুরু করার উদ্যম তারাই নেতৃত্ব গ্রহণ করতে সক্ষম।[১১]

৫। **প্রভুত্বব্যঞ্জক নেতৃত্ব (Authoritarian leadership):** প্রভুত্বব্যঞ্জক নেতৃত্বের ক্ষেত্রে নেতা সকল প্রকার পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। সকল পরিকল্পনাকে কাজে রূপায়িত করেন। সংগঠনের লক্ষ্য, আদর্শ ও নীতিকে বাস্তবে রূপায়িত করেন। কাউকে শাস্তি বা কাউকে পুরস্কৃত করার চরম অধিকার লাভ করেন। বস্তুত তিনিই হলেন গোষ্ঠীর সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী নেতা। তাঁর অবর্তমানে জনগোষ্ঠীর মধ্যে চরম অরাজকতা দেখা দেয়। প্রভূত্বব্যঞ্জক নেতা নিজস্ব বোধ থেকে স্বতন্ত্র জনগোষ্ঠীকে পরিচালনা করেন সে জনসমষ্টির অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে অভ্যন্তরীণ ব্যক্তিগত সম্পর্ক থাকেনা। নেতাদের সঙ্গে সদস্যদের সম্পর্ক খুব ঘনিষ্ঠ হয় না।

৬। **গণতান্ত্রিক নেতৃত্ব (Democratic leadership):** গণতান্ত্রিক নেতাও ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দুতে আসীন হন। তিনি গোষ্ঠীর যতটা না প্রভু তার থেকে বেশি হলেন অনুমোদিত প্রতিনিধি। তিনি গোষ্ঠীকে সেবা করতে চান, গোষ্ঠীর ওপর কর্তৃত্ব করতে চান না। গণতান্ত্রিক নেতৃত্ব সম্পর্কে গোষ্ঠীর সভ্যদের ধারণা এই যে, তাদের সুবিধার জন্যই তিনি তাদের চালনা করেন এবং গোষ্ঠীর শাসন, গোষ্ঠীর সভ্যদের জন্য এবং

---

[১১] Krech, D. and Crutchfield, Theory and Problems of Social Pychology Miffim ১৯৪৫, পৃষ্ঠা-১৭৯।

Dhaka University Institutional Repository

ব্যক্তি অথবা অধিক শিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তিরাই এসব অনুষ্ঠানে নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। এদের কর্তৃত্বের মূলে গুণ বা সামর্থের পরিবর্তে পরিবারের ভূমিকা মুখ্য।

৪। **প্রকৃত নেতৃত্ব (Real leadership):** প্রকৃত নেতৃত্বের ক্ষেত্রে নেতা অপরকে নিয়ন্ত্রণ করেন। যখন এ ধরনের নেতৃত্বের প্রয়োজন দেখা দেয় এবং যিনি সভ্যদের একটি নির্দিষ্ট পথে চালিত করেন এবং তাদের কাজের মধ্যে ঐক্য আনয়ন করতে পারেন তিনিই নেতা হিসেবে আবির্ভূত হন। এক্ষেত্রে নতুন নতুন বিষয় উদ্ভাবনের ফলে সমাজের অর্থনৈতিক কাঠামোর পরিবর্তন ঘটে এবং গতানুগতিক সামাজিক সম্পর্কে সংশোধন অনিবার্য হয়ে দেখা দেয়। যখন গোষ্ঠীর সভ্যদের নৈতিক চেতনায় অগ্রগতি সাধিত হয় এবং জীবনে নতুন ও মূল্যবোধের উপলব্ধির প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয় তখন এ ধরনের নেতার প্রয়োজনীয়তা সমাজে দেখা দেয়। এ সময় যাদের মধ্যে অন্তর্দৃষ্টি রয়েছে, যারা নতুন মূল্যবোধের অধিকারী, যাদের রয়েছে উচ্চতর দৃষ্টিভঙ্গি এবং কাজ শুরু করার উদ্যম তারাই নেতৃত্ব গ্রহণ করতে সক্ষম।[১১]

৫। **প্রভুত্বব্যঞ্জক নেতৃত্ব (Authoritarian leadership):** প্রভুত্বব্যঞ্জক নেতৃত্বের ক্ষেত্রে নেতা সকল প্রকার পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। সকল পরিকল্পনাকে কাজে রূপায়িত করেন। সংগঠনের লক্ষ্য, আদর্শ ও নীতিকে বাস্তবে রূপায়িত করেন। কাউকে শাস্তি বা কাউকে পুরস্কৃত করার চরম অধিকার লাভ করেন। বস্তুত তিনিই হলেন গোষ্ঠীর সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী নেতা। তাঁর অবর্তমানে জনগোষ্ঠীর মধ্যে চরম অরাজকতা দেখা দেয়। প্রভূত্বব্যঞ্জক নেতা নিজস্ব বোধ থেকে স্বতন্ত্র জনগোষ্ঠীকে পরিচালনা করেন সে জনসমষ্টির অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে অভ্যন্তরীণ ব্যক্তিগত সম্পর্ক থাকেনা। নেতাদের সঙ্গে সদস্যদের সম্পর্ক খুব ঘনিষ্ঠ হয় না।

৬। **গণতান্ত্রিক নেতৃত্ব (Democratic leadership):** গণতান্ত্রিক নেতাও ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দুতে আসীন হন। তিনি গোষ্ঠীর যতটা না প্রভু তার থেকে বেশি হলেন অনুমোদিত প্রতিনিধি। তিনি গোষ্ঠীকে সেবা করতে চান, গোষ্ঠীর ওপর কর্তৃত্ব করতে চান না। গণতান্ত্রিক নেতৃত্ব সম্পর্কে গোষ্ঠীর সভ্যদের ধারণা এই যে, তাদের সুবিধার জন্যই তিনি তাদের চালনা করেন এবং গোষ্ঠীর শাসন, গোষ্ঠীর সভ্যদের জন্য এবং

---

[১১] Krech, D. and Crutchfield, Theory and Problems of Social Pychology Miffim ১৯৪৫, পৃষ্ঠা-১৭৯।

Dhaka University Institutional Repository

তাদের দ্বারাই চালিত হচ্ছে।[১২] গণতান্ত্রিক নেতৃত্ব নিজের সভ্যদের মধ্যে কোনো ব্যবধান রচনা করতে চান না। তিনি তার জনগোষ্ঠীকে স্বনির্ভর করে তুলতে চান যাতে গোষ্ঠী তাঁর নেতৃত্ব ছাড়াও সঠিকভাবে চলতে পারে।

৭। **প্রত্যক্ষ সংযোগ নেতৃত্ব (Direct contact leadership):** নেতা ও সংগঠন বা গোষ্ঠীর সভ্যদের মধ্যে সংযোগের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে উপরিউক্ত শ্রেণী বিভাগ করা হয়েছে। নেতার সঙ্গে সভ্যদের প্রত্যক্ষ সংযোগের মাধ্যমে এ জাতীয় নেতৃত্ব গড়ে ওঠে। জনসভায় বক্তৃতা আলাপচারিতা প্রভৃতি ক্ষেত্রে এ প্রত্যক্ষ সংযোগমূলক নেতৃত্ব চোখে পড়ে।

৮। **দূরবর্তী সংযোগ নেতৃত্ব (Distant contact leadership):** দূর থেকে নেতা সভ্যদের সাথে সংযোগ রক্ষা করে উপরিউক্ত শ্রেণীর নেতৃত্ব কায়েম করতে পারেন। বেতার বক্তৃতা, লেখনীর মাধ্যমে জনমত নিয়ন্ত্রণ দূরবর্তী সংযোগ বিশিষ্ট নেতৃত্বের উদাহরণ।

৯। **দার্শনিক নেতা (Thinker leader):** দার্শনিক নেতা দূরদর্শিতার অধিকারী, তবে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে পুরো সফল নন। কেননা, তত্ত্ব ও প্রয়োগের ব্যবধানটুকু তিনি অনেক সময় ভালো করে বুঝে উঠতে পারেন না।

১০। **কর্মি নেতা (Leader of action):** কর্মি নেতা কাজ করেন প্রচুর কিন্তু অপরের বক্তব্য বুঝে নেয়ার ক্ষমতা ও সময় তার কম। তিনি কাজ করেন এবং কাজের মধ্যেই নিয়োজিত থাকেন। ভবিষ্যতে কী হবে না হবে তা নিয়ে মাথা ঘামাতে আগ্রহী নন। এরা হুকুম তামিলকারী আবেগবর্জিত বাস্তববাদী নেতা।

১১। **অবাধ বা লাগাম ছাড়া নেতৃত্ব (Uncontrolled leadership):** এ ধরনের নেতৃত্ব অবাধ নীতি অনুসরণের ফলে নেতা দলের অধীনস্তদের ওপর বহুলাংশে নির্ভরশীল হয়ে দলের লক্ষ্য স্থির ও সিদ্ধান্ত প্রণয়ন করেন। লক্ষ্যণীয় এ ধরনের নেতা অধীনস্তদের খুব কম নিয়ন্ত্রণ করেন। অনেক ক্ষেত্রেই অনুসারীরা যে ধরনের প্রত্যাশা করেন নেতা সেভাবেই তাদের প্রত্যাশা পূরণে সচেষ্ট হন এবং সেভাবেই তাদের নির্দেশ প্রদান

---

[১২] প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-১৮০।

Dhaka University Institutional Repository

করেন। এতে সমষ্টির স্বার্থের চেয়ে ব্যক্তিস্বার্থ কখনো প্রধান হয়ে গড়ে এবং প্রায় ক্ষেত্রেই মনোযোগী ও যত্নহীনতা এবং অবহেলার কারণে ভুল সিদ্ধান্ত প্রণীত হয়।

১২। **জনমত সৃষ্টিকারী নেতৃত্ব (Leaderships of peoples verdict):** এ ধরনের নেতৃত্ব সমাজদেহে বিরাজমান ক্ষত, অনাচার, দূর করে অসাধারণ বুদ্ধিমত্তার সাথে জনমত সৃষ্টি করে সরকারের ওপর প্রবল চাপ সৃষ্টি করে, জনগণের দাবি আদায় করে থাকেন। এ জাতীয় নেতৃত্ব সমাজ পরিবর্তনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

১৩। **ধর্মীয় নেতৃত্ব (Religious leadership):** যখন কোনো সমাজে ধর্মীয় অবক্ষয় চরমে পৌঁছে বা মানুষ ধর্মের মৌলিক বিধিবিধান থেকে বিচ্যুত হয় অনাচার ও কুসংস্কারে আকণ্ঠ নিমজ্জিত হয় অথবা কোনো বিশেষ ধর্মের ওপর অন্যায় অত্যাচার ও জুলুম চরমে পৌঁছে, তখন ওই সমাজে ধর্মীয় নেতৃত্বের আবির্ভাব ঘটে। হাজী শরীয়তুলাহ, হযরত শাহ জালাল (রা.) ও ভ্যাটিকান সিটির পোপ প্রত্যেকে ধর্মীয় নেতা।

১৪। **প্রতীকী নেতৃত্ব (Symbolic leadership):** এক সময়ে যে সকল নেতৃত্ব দণ্ডমুণ্ডের কর্তা ছিলেন কিন্তু কালের বিবর্তনে সময়ের দাবিতে সকল ক্ষমতা হারিয়ে কেবল একজন প্রতীকী নেতায় পরিণত হয়েছেন। যেমন ইংল্যান্ডের রাণী একজন প্রতীকী নেতা।

১৫। **রাজনৈতিক নেতৃত্ব (Political leadership):** সুনির্দিষ্ট রাজনৈতিক আদর্শকে আশ্রয় করে রাজনৈতিক নেতৃত্ব গড়ে উঠতে দেখা যায়। উন্নয়নশীল দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের জন্য দলমত নির্বিশেষে আপামর জনসাধারণ যখন নেতার প্রেরণায় একতাবদ্ধ হয় এবং আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ে তখনই রাজনৈতিক নেতৃত্ব বিকশিত হয়। রাজনৈতিক নেতৃত্ব তার ত্যাগ, নৈতিকতা ও প্রেরণা দিয়ে জাতিকে সুসংঘবদ্ধ ও উদ্বুদ্ধ করে বিপুল জনগণের আস্থা অর্জন করে লক্ষ্য অর্জনে সক্ষম হয়।

Dhaka University Institutional Repository

নেতৃত্বের মাত্রাঃ

হেমফিল (১৯৫০ সাল) এর মতে, নেতৃত্বের মোট নয়টি মাত্রা নির্দেশ করা যায়।[১৩] এগুলো হলোঃ-

১। উদ্যোগ (Initiative) নেতা কতখানি নতুন ধারণা প্রদান করতে পারেন।

২। সদস্য বৈশিষ্ট্য (Membership) নেতা কতটা নিয়মিত দলের সাথে মিথস্ক্রিয়া (Interaction) করেন।

৩। প্রতিনিধিত্ব (Representation) নেতা দলের উদ্দেশ্য সাধন ও স্বার্থরক্ষায় কতখানি আগ্রহী এবং বাইরের আক্রমণ থেকে দলকে কতটা রক্ষা করেন।

৪। সংহতি (Integration) দলের মাঝে সম্প্রীতিকে উৎসাহী করা এবং অভ্যন্তরীণ বিভেদ দূর করা।

৫। সংগঠন (Organization) সংজ্ঞাদান, পরিকল্পনা প্রণয়ন, নিজের ও দলের কাজ সুগ্রথিত (Structure) করা।

৬। প্রাধান্য (Domination) দলের সদস্যদের সিদ্ধান্ত ও মতামতের ওপর নিজ প্রভাব বিস্তার করা।

৭। যোগাযোগ (Communication) সদস্যদের সাথে তথ্য বিনিময় করা।

৮। স্বীকৃতি (Recognition) সদস্যদের সমর্থন লাভের জন্য নেতার বিভিন্ন আচরণ।

৯। উৎপাদন (Production) কৃতিত্ব অর্জনের জন্য লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ।

নেতার বৈশিষ্ট্য বা গুণাবলীঃ বিভিন্ন লেখক নেতৃত্বের বিভিন্ন গুণাবলীর ওপর গুরুত্বারোপ করেছেন। Chester I. Barnard নেতৃত্বের গুণাবলীর একটি তালিকা তৈরি করেছেন। যেমন-

---

[১৩] দ্বিতীয় উৎস থেকে গ্রহন করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

১। প্রাণবন্ত ও সহিষ্ণুতা

২। দৃঢ় প্রতিজ্ঞ এবং অনুপ্রেরণাদানের সমর্থ

৩। দায়িত্বশীলতা ও বুদ্ধিবৃত্তিগত সক্ষমতা

একইভাবে **George R. Terry** নেতৃত্বের গুণাবলীসমূহকে তালিকাভুক্ত করেছেন এভাবেঃ

১। কর্মশক্তি ও কর্মক্ষমতা

২। মানসিক স্থিতিশীলতা

৩। আবেগ নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা

৪। মানব সম্পর্কে যথাযথ জ্ঞান

৫। ব্যক্তিগত অনুপ্রেরণা

৬। শিক্ষাগত যোগ্যতা

৭। নিজেকে প্রকাশ করার ক্ষমতা

৮। কর্ম দক্ষতা, সামাজিক দক্ষতা ও যোগ্যতা

৯। কারিগরি দক্ষতা ও যোগ্যতা

মনোবিজ্ঞানীরা কতগুলো ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য দ্বারা নেতৃত্বের সম্ভাবনা নির্ধারণ হয় বলে মনে করেন। যেগুলো অনেকাংশে পরিস্থিতি নিরপেক্ষ বলা চলে। তাদের এ বৈশিষ্ট্যগুলো কর্তৃত্ব বা প্রভুত্ব করার ক্ষমতা। দ্রুত প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করার ক্ষমতা, চিন্তার দৃঢ়তা দ্বারা পরিস্থিতিকে মানিয়ে নিয়ে নিজের অনুকূলে নিয়ে আসা প্রভৃতি। এছাড়া অন্যান্য বৈশিষ্ট্য হলো, সংযমের অধিকারী হওয়া, অন্যের কাজে অংশীদার হওয়া, কাজের উদ্দেশ্য ও সামর্থ্য প্রয়োগের ক্ষমতা ইত্যাদি।

Dhaka University Institutional Repository

আবার কোনো সুনির্দিষ্ট দক্ষতার কথা বলা যায় না, যা কোনো ব্যক্তিকে নেতায় পরিণত করে। নেতৃত্ব ব্যক্তির কোনো একটি বৈশিষ্ট্যমূলক মনস্তাত্ত্বিক প্রয়োজনের ওপর নির্ভর করে, একথাও বলা চলে না। কোনো পরিস্থিতিতে যা উত্তম নেতৃত্ব, তা অন্য পরিস্থিতিতে ব্যর্থ নেতৃত্ব এমনও হতে পারে। মূল বিষয় হচ্ছে- তিনি নেতা কিংবা নেতা নন এ উভয়ের মধ্যে কোনো স্থায়ী ব্যবধান রেখা টেনে দেয়া সম্ভব নয়। সার্থক নেতৃত্ব হলো পরিস্থিতির ক্রিয়া (Function of the situation)। যুদ্ধক্ষেত্রে উদ্যমী, বুদ্ধিমান এবং দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণে সক্ষম এমন ব্যক্তিই নেতৃত্বের আসন অলকৃত করেন।

আবার ধর্মীয় বা রাজনৈতিক নেতার মধ্যে আমরা ভিন্ন গুণাবলীর উপস্থিতি প্রত্যাশা করি যা দেশ বা কালভেদে পৃথক। রাজনৈতিক বা ধর্মীয় নেতাদের মধ্যে সহানুভূতি ও সংগ্রামী মনোভাব থাকা প্রয়োজন। একজন আদর্শিক নেতার চারিত্রিক দৃঢ়তা, কঠোর দায়িত্ববোধ, কর্তৃব্যনিষ্ঠা, উদ্যোগী ও উদ্যমী, স্বাপ্নিক ও ভবিষ্যতদ্রষ্টা, সমস্যা নির্মম ও সমাধানে সৃজনশীল, সুকুমার, শৈল্পিক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী আত্মমর্যাদাসম্পন্ন, সহিষ্ণু ও সংযমী, অন্যের ওপর প্রভাব বিস্তারকারী এবং সামাজিক সম্পর্কের নানান গুণে গুণান্বিত অনন্য সাধারণ ব্যক্তিত্বের অধিকারী হওয়া একান্ত আবশ্যক। সাধারণভাবে নেতৃত্বের যেসব বিশেষ গুণ প্রত্যেক প্রশাসকের থাকা প্রয়োজন তা হচ্ছে।[১৪]

১। জনগণের স্বার্থকে নিজের স্বার্থের উর্ধ্বে রাখা

২। দায়িত্ব গ্রহণের ইচ্ছা / উদ্যোগ ও কর্তব্য পরায়ণতা

৩। অন্যকে অনুপ্রাণিত বা প্রভাবান্বিত করার ক্ষমতা

৪। উত্তম চরিত্র সততা ধৈর্য ও আত্মসংযম

৫। একাধিক সমস্যা সমাধানের ক্ষমতা

৬। কর্মকেন্দ্রিক মননশীলতা ও দক্ষতা

৭। উত্তম শ্রোতা ও বক্তা

---

[১৪] ইউনিয়ন পরিষদ ম্যানুয়েল, প্রকাশক: ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব লোকাল গভর্নমেন্ট, আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-জুন, ১৯৯২।

Dhaka University Institutional Repository

৮। সহকর্মীদের ওপর বিশ্বাস ও নির্ভরতা

৯। যোগ্য ব্যক্তির সমাবেশের মাধ্যমে সংগঠনের উৎকর্ষ সাধন

১০। আজ্ঞাপ্রদানকারী না হয়ে সহযোগী হিসেবে কাজ করা

১১। সহকর্মীদের সংগে যুক্ত হয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ

১২। সংস্থার উন্নতির ব্যাপারে সবার পরামর্শ নেয়ার নিরলস প্রচেষ্টা

১৩। অধীনস্ত কর্মচারীদের সাথে শ্রদ্ধার সঙ্গে ব্যবহার করা

১৪। স্বাধীন চিন্তার অভ্যাস

১৫। বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞানের অধিকারী হওয়া

১৬। জনগণের সঙ্গে মতামত বিনিময় করা

১৭। সমস্যা সমাধানে আগ্রহী হওয়া

১৮। জনগণকে প্রভাবান্বিত করার ক্ষমতা

১৯। দূরদর্শিতা এবং

২০। সহিষ্ণুতা

এছাড়াও নিম্নলিখিত তথ্যে একজন যোগ্য নেতার গুণাবলী প্রকাশ পায় [১৫]

১। সংগঠনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সম্পর্কে ধারণা থাকা

২। লোকবল ও সম্পত্তি সম্পর্কে ধারণা থাকা

৩। সংগঠনের ভিতরে ও বাইরে যোগাযোগ রক্ষা করা

---

[১৫] প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

৪। উদ্বুদ্ধ করা, উত্তম কাজের প্রশংসা করা, স্বীকৃতি দেয়া, ব্যক্তিগতভাবে অভিনন্দন জানানো, উত্তম কাজের জন্য বিশেষ সুবিধা প্রদান

৫। সংগঠনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য অর্জনে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হওয়া এবং নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করা

৬। পরিকল্পনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে সকলের মতামত নেয়া, নিজের ধারণা অপরকে দেয়া এবং অপরের ধারণা নেয়া, অপরকে কথা বলার উৎসাহ দেয়া এবং তার কথা শোনা

৭। কর্তব্য পালনে ইচ্ছা, উদ্দেশ্য ও কর্তব্যপরায়ন হওয়া

৮। সময় ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে সচেতন থাকা

৯। ভুল থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা

১০। সহকর্মীদের প্রতি বিশ্বাস ও নির্ভরতা রাখা

১১। কথায় ও কাজে আমি ব্যবহার না করে আমরা ব্যবহার করা

১২। সিদ্ধান্ত ও কাজের বাস্তবায়ন, অগ্রগতি পর্যালোচনা বা ফলোআপ করা

নেতৃত্বের কাজঃ

নেতা কোন্ ধরনের জনপদে কোন্ ধরনের জনগোষ্ঠীর নেতৃত্ব দিচ্ছেন। তার ওপর ভিত্তি করে কাজের মধ্যে পার্থক্য দেখা দেয়। নেতার কাজের মধ্যে কতগুলো হচ্ছে সাধারণ ধরনের, আর কতগুলি বিশেষ ধরনের। এ বিশেষ ধরনের কাজগুলি নির্ভর করে তিনি কী ধরনের গোষ্ঠীর নেতৃত্ব দিচ্ছেন। প্রভূত্বব্যঞ্জক গোষ্ঠীর (Authoritative) যিনি নেতা তাকে কতগুলি বিশেষ ধরনের কাজের ওপর গুরুত্ব আরোপ করতে হয়। আবার গণতান্ত্রিক গোষ্ঠীর প্রকৃতি যাই হোক না কেন সব নেতাকেই কতগুলি সাধারণ কাজ সম্পাদন করতে হয়। নিম্নে সেগুলি আলোচনা করা হলোঃ-

১। **সমন্বয় সাধন করা (Co-ordination):** যেকোনো গোষ্ঠীর নেতাকে গোষ্ঠীর ক্রিয়াকলাপের মধ্যে সমন্বয় সাধন করতে হয়। গোষ্ঠীর লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য নির্ধারণে

Dhaka University Institutional Repository

হয়তো তিনি সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করতে পারেন। কিন্তু গোষ্ঠীর লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য যাতে বাস্তবে রূপায়িত হয়, তার দায়িত্ব নেতাকে যেমন নিতে হয়না তেমনি সব প্রয়োজনীয় কাজগুলো নিজেকে সম্পাদন করতে হয় না। তিনি সেই দায়িত্ব গোষ্ঠীর সভ্যদের মধ্যে ন্যস্ত করতে পারেন।

২। **পরিকল্পনা রচনা করা (Planning) :** গোষ্ঠীর লক্ষ্য ও কর্মপন্থা নির্ধারণ এবং তার বাস্তব রূপায়ন এ দুয়ের মধ্যবর্তী হলো পরিকল্পনা রচনা করার কাজ। নেতাকে অনেক সময় এ পরিকল্পনা রচনার দায়িত্ব গ্রহণ করতে হয়। গোষ্ঠী কিভাবে তার লক্ষ্যে উপনীত হবে তার উপায় নির্ধারণ করতে হয় এবং এজন্য নেতাকে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা তৈরি করতে হয়। অনেক সময় নেতাই এ পরিকল্পনার তত্ত্বাবধায়ক। তিনি পুরো পরিকল্পনার সকল দিক সম্পর্কে অবহিত থাকেন। গোষ্ঠীর অন্যান্য সভ্যরা হয়তো তার অংশবিশেষ সম্পর্কে জ্ঞাত থাকে। সময় সময় সমগ্র পরিকল্পনা সম্পর্কে তারা কিছুই জানেন না।

৩। **নীতি নির্ধারণ করা (Policy making) :** নীতি নির্ধারণের মাধ্যমেই গোষ্ঠী তার লক্ষ্য বা উদ্দেশ্যকে সফলকাম করতে পারে। এ লক্ষ্য তিনভাবে নির্ধারিত হতে পারে। কোনো বাইরের কর্তৃপক্ষ যেমন সরকার এ লক্ষ্য নির্ধারণ করে দিতে পারে, গোষ্ঠীর অধিকাংশ সভ্যের গৃহীত সিদ্ধান্তের দ্বারা এ লক্ষ্য নির্ধারিত হতে পারে যা গোষ্ঠীর লক্ষ্য সাধনের পক্ষে উপযোগী।

৪। **বিশেষজ্ঞদের পরিচালনা করা দেয়া (Directing the experts):** অনেক সময় নেতাকে বিশেষজ্ঞের কাজ করতে হয়। গোষ্ঠীর সভ্যদের প্রয়োজনীয় তথ্যাদি তাকেই সরবরাহ করতে হয় এবং প্রয়োজনীয় পরামর্শ তাকেই দিতে হয়। নেতারা যে সকল বিষয়ে জানেন এমন কথা নয় এবং বিশেষ কোন বিষয় জানতে গোষ্ঠীর সভ্যরা আগ্রহী সে সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞান তাঁর নাও থাকতে পারে। কিন্তু গোষ্ঠীর বৈশিষ্ট নির্ণয়ে নেতাকে সবচেয়ে উপর্যুক্ত ব্যক্তি মনে করা হয়। বিশিষ্ট্য জ্ঞানের অধিকারী হওয়ার জন্যই কোনো ব্যক্তি অনেক সময় দলের নেতা নির্বাচিত হন। যেমন- চিকিৎসক, আইনজীবী, প্রকৌশলী, ক্রীড়াবিদ, গবেষকসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে গুণী জন ও অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ।

Dhaka University Institutional Repository

৫। **অভ্যন্তরীণ সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণ করা (Controlling Internal Relationship):** নেতার অন্যতম কাজ গোষ্ঠীর অভ্যন্তরে সভ্যদের পারস্পরিক সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণ করা। অন্যান্য সভ্যর তুলনায় গোষ্ঠীর সাধারণ খুঁটিনাটি বিষয় সবছিকু নেতাকেই নিয়ন্ত্রণ করতে হয় এবং তার সেই কাজ গোষ্ঠীর অভ্যন্তরীণ সম্পর্কের প্রকৃতিকে প্রভাবিত করে।

৬। **পুরস্কার ও শাস্তি প্রদানের ব্যবস্থা করা (Arrangement of Rewards and Punishments) :** গোষ্ঠীর অভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য গোষ্ঠীর সভ্যদের পুরস্কার ও দণ্ডদান করতে হয় অনেক সময় এ পুরস্কার ও শাস্তি কোনো বাহ্য বস্তুর সাথে সম্পর্কযুক্ত। যেমন দলপতির প্রাপ্ত আর্থিক পুরস্কারের অংশ দলের সভ্যদের মধ্যে বন্টন করেন। আবার অনেক সময় গোষ্ঠীতে ব্যক্তির বিশেষ ভূমিকার জন্য নেতা তাকে পুরস্কার এবং শাস্তি দেন। যেমন কোনো গোষ্ঠীর সভ্যকে কোনো বিশেষ সম্মানে সম্মানিত করা হয় বা এমনও দেখা যায় তার কৃত দুষ্কর্মের জন্য তাকে সংগঠন থেকে বহিষ্কার করা হয়।

৭। **গোষ্ঠীর ঐক্যের প্রতীকরূপে কাজ করা (Symbolising Group Unity) :** কতগুলি উপাদান আছে যেগুলির মাধ্যমে গোষ্ঠীর সভ্যদের কাছে গোষ্ঠীর ঐক্যের দিকটি বড় হয়ে উঠে এবং গোষ্ঠীর সভ্যরা গোষ্ঠীর সঙ্গে নিজেদের একাত্মতা অনুভব করে। পরিচয়জ্ঞাপক স্মারক (Badge) নামে পোশাক প্রভৃতি গোষ্ঠীর ঐক্যের বোধকে গোষ্ঠীর প্রতীক রূপে কাজ করেন। এ প্রসঙ্গে ইংল্যান্ডের রাণীর নাম করা যেতে পারে যিনি একটি গোষ্ঠীর প্রতীক রূপে কাজ করেন। নেতা গোষ্ঠীর প্রতীক রূপে কাজ করেন। এক্ষেত্রে দেখা যায়, তিনি সুদীর্ঘকাল ধরে তার পদ অধিকার করে থাকেন, যদিও ব্যক্তিগত সভ্য পদের বহু পরিবর্তন ঘটে।

৮। **গোষ্ঠীর ভাবধারার উৎসরূপে ক্রিয়া করা (To act as an ideologist) :** নেতা যে শুধু গোষ্ঠীর লক্ষ্য উদ্দেশ্য স্থির করেন বা নীতি নির্ধারণ করেন তা নয়। তিনি গোষ্ঠীর মূল্যবোধগুলোকেও সভ্যদের কাছে তুলে ধরেন। তিনি গোষ্ঠীর ভাবধারা এবং সভ্যদের বিশ্বাসের উৎসরূপে ক্রিয়া করেন।

৯। **গোষ্ঠীর পিতৃত্বের ভূমিকা গ্রহণ করা (To act as father figure) :** গোষ্ঠীর সভ্যরা নেতাকে পিতৃতুল্য বলে মনে করেন। মনোবিশেষকরা মনে করেন, নেতা হলেন

Dhaka University Institutional Repository

পিতার প্রতিভূ (substitute) যার প্রতি সদস্যদের পিতৃতুল্য বা পিতৃসুলভ আবেগ ধাবিত হয়। ব্যক্তির আবেগও অনুভূতির কেন্দ্রবিন্দু হলেন নেতা। তাই সভ্যরা মনে করেন নেতাই হলেন উপযুক্ত ব্যক্তি। যার সঙ্গে তারা একত্রিত হবার ইচ্ছা ব্যক্ত করে। যার মধ্যে তাদের আবেগ ও অনুভূতি স্থানান্তরিত হতে পারে। যার প্রতি তারা আনুগত্য বোধ করতে পারে। কোনো কোনো নেতা তার গোষ্ঠীর ওপর প্রবল ক্ষমতা রাখে। এর মূলে থাকে নেতার সঙ্গে সভ্যদের সম্পর্কের অনুপম সাযুজ্য।

যেহেতু গবেষণার বিষয় হচ্ছে- নেতৃত্বের সংকট তাই নেতৃত্ব সম্পর্কে এ অধ্যায়ে বিষদ আলোচনা করতে গিয়ে নেতৃত্বের সংজ্ঞা, নেতৃত্বের শ্রেণী বা ধরন, নেতৃত্বের গুণাবলী, কাজ মাত্রা নেতৃত্বের প্রয়োজনীয় বৈশিষ্ট্য ইত্যাদি বিষদভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

গবেষণার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা

এক সাগর রক্তের বিনিময়ে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে। ৩০ লক্ষ শহীদের জীবনের মূল্যে ও ১০ লক্ষ মা বোনের ইজ্জতের বিনিময়ে আমরা পেয়েছি স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ। অনেক স্বপ্নের, অনেক প্রত্যাশার, অনেক আকাঙ্ক্ষার বাংলাদেশ, স্বাধীনতার ৩৭ বছর পরেও সেই পুরনো অবস্থাতেই রয়ে গেছে। প্রগতি, অগ্রগদি, স্বনির্ভরতার ছোঁয়া, যেন লাগছেই না। অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক মুক্তির লক্ষ্যে পরিচালিত 'মুক্তিযুদ্ধ / 'মুক্তিসংগ্রাম' যেন ব্যর্থতায় পর্যবসিত হতে যাচ্ছে দিন দিন। গত ৩৭ বছরেও উন্নয়নে ছোঁয়া যেখানে যা কিছু লেগেছে তা প্রয়োজনের তুলনায় এতই সামান্য / অপ্রতুল যে সুফল থেকে মানুষ বঞ্চিতই থেকে যাচ্ছে। এখনো দেশের সিংহভাগ মানুষ দারিদ্র সীমার নিচে বসবাস করছে। শিক্ষার আলো ঘরে ঘরে পৌছে দেয়া সম্ভব হয়নি। মানুষ কুসংস্কারের বেড়াজালে আজও বন্দি। সামাজিক সন্ত্রাস, রাজনৈতিক সন্ত্রাস হত্যা, খুন আজও দেশ থেকে দূর করা সম্ভব হয়নি। কৃষি, শিল্প, যোগাযোগ ও মানব সম্পদ উন্নয়নের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সাফল্য আজও সুদূর পরাহত। গণতান্ত্রিক সরকার ব্যবস্থাকে আজও একটি শক্ত ভিত্তির ওপর দাঁড় করানো সম্ভব হয়নি। উপরিউক্ত সব কিছুর মূলে নিহিত আছে নেতৃত্বের সংকট। ব্যর্থ, ভ্রান্ত ও অযোগ্য নেতৃত্বের কারণে আজ বাংলাদেশ বিশ্বে দুর্নীতিতে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হচ্ছে বারবার। কোনো কোনো রাষ্ট্রচিন্তাবিদদের মতে বাংলাদেশ একটি অকার্যকর রাষ্ট্রে পরিণত হচ্ছে। যার জন্য নেতৃত্বের ব্যর্থতাকেই সবচেয়ে বেশি দায়ী করা চলে। সম্পদের সীমাবদ্ধতা আমাদের

Dhaka University Institutional Repository

আছে তারপরও বলা যায় গত ৩৭ বছরে যে দুর্নীতি হয়েছে তা রোধ করতে পারলেও বাংলাদেশের চেহারা আমূল বদলে যেত। রাজনৈতিক প্রতিহিংসা, অনৈক্য ও সমঝোতার অভাবে, রাজনৈতিক অধিকারের নামে হরতাল অবরোধ করে যে সম্পদের অপচয় করা হয়েছে তার সুষ্ঠু ব্যবহার হলেও হয়তো এদেশের চেহারা বদলে যেত। প্রকৃতি যে বিশাল সম্পদের ভাণ্ডার আমাদের দিয়েছেন তার সুনির্দিষ্ট উন্নয়নের অভাবে আজ বাংলাদেশের সম্পদের ভাণ্ডার শূন্য হতে বসেছে। বিশ্বায়নকে অগ্রগতির হাতিয়ার বানানোর ব্যর্থতা, ভূ-রাজনৈতিক কৌশল নির্ধারণের অক্ষমতা বাংলাদেশকে দিন দিন বিপন্ন রাষ্ট্রের তালিকায় পৌঁছে দিচ্ছে।

দেশের জনসাধারণের অর্ধেক নারী হওয়া সত্ত্বেও তাদের প্রতি বৈষম্য প্রকট। প্রত্যন্ত অঞ্চলের নারী আজও কুসংস্কার, ধর্মান্ধতা ও মৌলবাদীদের স্বীকার হয়ে বোঝা ও ভোগ্য পণ্যে পরিণত হয়েছে। এ সামগ্রিক বিপর্যয়ের জন্য নেতৃত্বের ব্যর্থতাকে দায়ী করা চলে। এ থেকে পরিত্রাণের জন্য এ বিষয়ে গবেষণার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তাকে সকলের উপলব্ধি করতে হবে।

উপর্যুক্ত কারণ অনুদ্ধান, বিশ্লেষণ, পর্যবেক্ষণ ও বিচার করে আমাদের জাতীয় জীবনে পশ্চাৎপদতার পেছনে রাজনৈতিক নেতৃত্বের ব্যর্থতার ধরন, মাত্রা ও পরিমাপ নির্ণয় এবং তা থেকে মুক্তির উপায় অনুসন্ধানে এ জাতীয় গবেষণার পর্যাপ্ত কারণ বিদ্যমান বিবেচনায় অত্র গবেষণার সূত্রপাত।

গবেষণার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য:

প্রস্তাবিত গবেষণাকর্মটি কতগুলি সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যকে সামনে রেখে পরিচালিত হয়েছে। গবেষণা প্রকল্পের তত্ত্বগত কাঠামো নির্মাণ করা, আদর্শ নেতৃত্বের বিভিন্ন দিক পর্যালোচনা করা, বাংলাদেশে বিভিন্ন শাসন আমলে নেতৃত্বের স্বরূপ অনুসন্ধান, সিভিল সোসাইটি, বেসরকারি সংগঠন, স্থানীয় সরকারে নেতৃত্বের সঙ্কটের কারণ উদঘাটন সর্বোপরি নেতৃত্বের সংকট নিরসনের উপায় অনুদ্ধান করা। এছাড়া বর্তমান প্রজন্মকে বিশষ করে তরুণ প্রজন্মকে সকল ধরনের ভুলভ্রান্তি থেকে শিক্ষা নিয়ে যথোপযুক্ত নেতৃত্বের উপযোগী করে গড়ে তোলা। অমিত সম্ভাবনার এ দেশের ললাটে সাফল্যের জয়টীকা বয়ে আনা প্রায় দুরূহ হয়ে পড়েছে। মূলত দেশ ও জাতির ভাগ্য পরিবর্তন করতে জীর্ণ, প্রাচীন, ঘুণেধরা নেতৃত্বের স্থলে, আলোকিত, উদ্ভাসিত, প্রজ্ঞাময়, দূরদর্শী কার্যকর ও নিশানাস্থির নেতৃত্বের আবির্ভাবের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য নিয়ে গবেষণাকর্মটি পরিচালিত হয়েছে। সবচেয়ে বড় কথা আজ জানতে হবে, আমাদের সমস্যাটি

Dhaka University Institutional Repository

কোথায়? সমস্যার ধরন কী ? সমস্যার সমাধানের উপায় কী? সকল মহলকে এ ব্যাপারে মুক্ত মন নিয়ে এগিয়ে আসতে হবে। আগামী দিনের কর্ণধার তরুণ প্রজন্মকে নিরপেক্ষ মূল্যায়ন করতে হবে আমাদের অতীতকে, নিরলস প্রচেষ্টা চালাতে হবে বর্তমানকে গড়ে তুলতে আর নির্ভুল নিশানায় লক্ষ্য স্থির করতে হবে ভবিষ্যত বিনির্মাণে। আর এ লক্ষ্যকে বাস্তবে রূপায়িত করতে আমাদের অতীত নেতৃত্বের চুলচেরা বিশেষণ, তথ্যবহুল গবেষণা ও নির্মোহ বিচার বিশ্লেষণ একান্ত আবশ্যক। মূলত একটি স্বপ্নের বাংলাদেশ, একটি সমৃদ্ধ বাংলাদেশ, মুক্তিযোদ্ধাদের প্রত্যাশার বাস্তবায়নের মধ্যদিয়ে এ জাতির আজন্ম লালিত স্বপ্নের বাংলাদেশ গড়তে এবং অনাগত ভবিষ্যতের জন্য যথোপযুক্ত নেতৃত্বের বিকাশের মাধ্যমে সকল বাধা, বন্ধন, প্রতিবন্ধকতা, ব্যর্থতা, হতাশা, গ্লানি, পশ্চাদ পদতা, দেশপ্রেমবর্জিত প্রতারণার রাজনীতির চির অবসান ঘটিয়ে গণমানুষের প্রত্যাশিত বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিয়েই প্রস্তাবিত বিষয়ে গবেষণায় মনোনিবেশ করা হয়েছে।

অনুকল্প গ্রহণ (Hypothesis Building):

অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক ও সংস্কৃতিক মুক্তির মহান লক্ষ্য নিয়ে। ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল। এদেশের আপামর জনসাধারণ প্রাণপ্রণ লড়াই সংগ্রামের মধ্যদিয়ে ৩০ লক্ষ শহীদের ও ১০ লক্ষ মা বোনের ইজ্জতের বিনিময়ে ৯ মাসের তুমুল যুদ্ধে দেশ স্বাধীন হয়েছে। কিন্তু মানুষের মুক্তি আজও মেলেনি। আমরা দেশকে স্বাধীন করতে সক্ষম হলেও আজও গড়ে তুলতে পারিনি আমাদের অর্থনীতি, একটি ভারসাম্যপূর্ণ সমাজ কাঠামো নির্মাণ সম্ভব হয়নি আজও। বাংলাদেশের মোট জাতীয় উৎপাদন (G.D.P) বিশ্বের সর্বনিম্ন পর্যায়ে রয়েছে। মানুষের মাথাপিছু আয় সর্বনিম্ন স্তরে। বাজেটের সিংহভাগ এখন বৈদেশিক সাহায্যনির্ভর। অর্থনৈতিক স্থবিরতা, সামাজিক অস্থিরতা, সন্ত্রাস, দুর্নীতি নাগরিক জীবনকে অসহনীয় করে তুলেছে। দেশ আজ মহাসঙ্কটে নিপতিত। স্বাধীনতাত্তোর বাংলাদেশে নেতৃত্বের সংকটকেই এর প্রধানতম কারণ বলে মনে করা হয়। বাংলাদেশে নেতৃত্বের সংকটের মূলে বিদ্যমান কারণসমূহ :

ক. শাসকদের অগণতান্ত্রিক আচরণ, দলের প্রতি, দলীয় কর্মিদের প্রতি পক্ষপাতমূলক আচরণ।

খ. নেতাদের ক্ষমতার প্রতি দুর্বার আসক্তি, আইনের প্রতি সম্মান প্রদর্শনে ব্যর্থতা।

Dhaka University Institutional Repository

গ. প্রশাসনিক দুর্বলতা, রাজনৈতিক জ্ঞান ও দক্ষতার অভাব, মনস্তাত্ত্বিক সমস্যা ও গণতান্ত্রিক ঐতিহ্যের অভাব।

ঘ. এছাড়াও সিভিল সোসাইটির যথাযথ ভূমিকা পালনের ব্যর্থতা বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংকটকে ঘনীভূত করেছে। আলোচ্য গবেষণায় উপরিউক্ত অনুকল্পের আলোকে বিস্তারিত আলোচনায় বাংলাদেশে নেতৃত্বের সঙ্কটের বিষয়টি প্রমাণের চেষ্টা করা হয়েছে।

গবেষণার পদ্ধতিঃ

তত্ত্ব, তথ্য ও উপাত্তের প্রাণালীবদ্ধ অনুসন্ধানকেই গবেষণা বলে। সমাজবিজ্ঞান গবেষণার ক্ষেত্রে তথ্য ও উপাত্তের প্রণালীবদ্ধ অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণ করতে হয়। সামাজিকবিজ্ঞানের অংশ হিসেবে যেকোনো গবেষণার বিষয় বিশ্লেষণ এককভাবে কোনো বিশেষ শাখাতে সীমাবদ্ধ থাকে না বরং একাধিক শাখায় মিশ্রণ হয়ে পড়ে। ফলে গবেষণাকর্মটি সম্পন্ন করতে গবেষণার কার্যক্রমে প্রাপ্ত তথ্যাদি বিশ্লেষণমূলক পদ্ধতিও প্রয়োগ করা হয়েছে। এ পদ্ধতিতে সরাসরি মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের প্রয়োজন হয় না। গবেষক গবেষণার জন্য যে তথ্য সংগ্রহ করেছেন এবং যাঁর বা যাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন তার প্রতিক্রিয়া এবং প্রভাবের ওপর যে গবেষণা হয় তাকেই বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ পদ্ধতি বলে।[১৬] সমাজ গবেষণার প্রাথমিক বাহন হলো শব্দ ও ছবি। এ শব্দ ও ছবি বিভিন্ন রূপে যোগাযোগের বাহন হিসেবে ব্যবহার হয়ে আসছে। গবষেণার তথ্যাবলী সংগ্রহের জন্য বই-পুস্তক, পত্র-পত্রিকা, সঙ্গীত, চিত্রকলা ইত্যাদির মাধ্যমে সাহায্য গ্রহণ করা হয়।[১৭]

গবেষণা পদ্ধতির মৌলিক উদ্দেশ্য হলো গবেষণার বিষয়বস্তু প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে বিচার বিশ্লেষণ করা। সামাজিক সমস্যাবলী পরিপূর্ণভাবে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের জন্য কিছু কিছু পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। কিন্তু আমার এ গবেষণায় বিশ্লেষণ ছাড়াও অন্যান্য পদ্ধতির সাহায্য অকাতরে গ্রহণ করা হয়েছে। ঐতিহাসিক প্রামাণ্য দলিল সংগ্রহ এবং বর্ণনামূলক প্রক্রিয়া, বিভিন্ন গ্রন্থ ও প্রবন্ধ, সংবাদপত্র, সাময়িকী গুণীজনের অভিমত ইত্যাদির সাহায্য গ্রহণ করা হয়েছে।

[১৬] খালেক, সরকার ও রহমান, সামাজিকবিজ্ঞান গবেষণা পদ্ধতি, হাসান বুক হাউজ, ঢাকা-১৯৯৮।
[১৭] আলম, ড. খুরশীদ, সমাজগবেষণা পদ্ধতি, মিনার্ভা পাবলিকেশন্স, ঢাকা-১৯৯৩।

Dhaka University Institutional Repository

গবেষণার সীমাবদ্ধতা:

যেকোনো বিষয়ে গবেষণা করতে গেলে কিছু না কিছু সীমাবদ্ধতার সম্মুখীন হতে হয়। আলোচ্য **"নেতৃত্বের সংকট প্রেক্ষিত বাংলাদেশ"** শীর্ষক গবেষণা কর্ম পরিচালনা করতে গিয়ে বেশকিছু সীমাবদ্ধতা পরিলক্ষিত হয়েছে। যেগুলোকে বর্তমান গবেষণার সীমাবদ্ধতা হিসেবে উল্লেখ করা হচ্ছে।

* রাজনৈতিক নেতৃত্বের ওপর বিষদ আলোচনা সংক্রান্ত গ্রন্থের অপর্যাপ্ততা।

* স্বাধীনতাত্তোর বাংলাদেশে রাজনৈতিক নেতৃত্বের ধারাবাহিকতা নিয়ে বিশ্লেষণধর্মী লেখালেখির অপ্রতুলতা।

* বিভাজনের রাজনীতির শিকার লেখকদের একপেশে ও দলীয় সঙ্কীর্ণ মনোভাব সম্বলিত দুর্বল বিচার বিশ্লেষণাত্মক বই-পুস্তক।

* স্বাধীনতাত্তোর সরকারগুলির কর্মকাণ্ডের তুলনামূলক নিরপেক্ষ পর্যালোচনার অপ্রতুলতা।

* বাংলাদেশের রাজনীতি, অর্থনীতি, প্রকৃত সমাজ কাঠামো ও মানুষের প্রকৃত সমস্যাবলীর বিষয়ে নিরপেক্ষ গবেষণাকর্মের অপ্রতুলতা।

* সর্বোপরি দারিদ্রপীড়িত বাংলাদেশে শত সমস্যা অতিক্রম করে অভিনিবেশ সহকারে গবেষণাকর্মে মনোনিবেশ করার সুযোগের অপ্রতুলতা যা আমার নিজস্ব অক্ষমতা বলেই বিবেচিত হবে।

* তৃণমূল পর্যায়ের ও শীর্ষপর্যায়ের নেতাদের মতামত সন্নিবেশিত করার অপারগতা।

* তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহের ক্ষেত্রে আমলাতান্ত্রিক জটিলতা।

* বিভিন্ন প্রকার সমস্যা পরিহার এবং সময় বাঁচানো ও আর্থিক দৈন্যতার কারণে গবেষক অনেক ক্ষেত্রে গবেষণা পদ্ধতির ধারাবাহিকতা রক্ষা করতে পারেনি।

Dhaka University Institutional Repository

* সময় ও সুযোগের স্বল্পতার কারণে প্রশ্নমালা পূরণ ও সাক্ষাতকার গ্রহণ করা সম্ভবপর হয়নি।

পরিশেষে বলা যায়, আলোচ্য গবেষণায় উপরিউক্ত সীমাবদ্ধতা থাকা সত্ত্বেও গবেষকের আন্তরিকতা, গভীর চিন্তা এবং নেতৃত্বের সংকটের কারণ অনুসন্ধান গবেষণাকর্মটিকে হৃদয়গ্রাহী করে তুলতে সক্ষম হবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়

বাংলাদেশের বিভিন্ন আমলে নেতৃত্বের স্বরূপ

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়

বাংলাদেশের বিভিন্ন আমলে নেতৃত্বের স্বরূপ

বঙ্গের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় স্মরণাতীত কাল থেকে রয়েছে বাংলার স্বাধীনতার ইতিহাস। যদিও বার বার বিজাতি ও ভিনদেশীদের কবলে পতিত হয়ে বাংলার স্বাধীনতা বিপন্ন হয়েছে। তবে স্বাধীনতা পুনরুদ্ধারে এ জাতির সংগ্রাম, ত্যাগ ও লড়াইয়ের ইতিহাস চিরন্তন। এ জাতির রয়েছে স্বাধীনতাকামী বহু মৃত্যুঞ্জয়ী বীর। ইবনে বতুতা, হিউয়েন এবং এর মতো বিশ্বখ্যাত পরিব্রাজকেরা এদেশের স্বাধীন সার্বভৌম সত্তার পরিচয় বিধৃত করেছেন তাদের রচনায়। সুলতানি আমল ও মোঘল আমলের এদেশের স্বাধীনতার ইতিহাস দূর লক্ষ্য নয়। অথচ স্বাধীন নবাবী আমলে লর্ড ক্লাইভ, মীরজাফর আর তার সহযোগী এদেশীয় ষড়যন্ত্রকারীদের কবলে পড়ে কেবল বাংলা নয় সমগ্র ভারতবর্ষই প্রায় দুশ বছর পরাধীনতার শৃঙ্খলে বন্দি ছিল। বৃটেনের উপনিবেশে পরিণত হয়েছিল এদেশ। বহু লড়াই সংগ্রামের মধ্য দিয়ে ভারত স্বাধীন হলো ১৯৪৭ সালে।[১] জন্ম হলো ভারত ও পাকিস্তান নামে দুটি দেশের। দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে বিভক্ত পাকিস্তানে পূর্বাঞ্চলের অর্থাৎ পূর্বপাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হলো বাংলাদেশ। স্বাধীনতা প্রাপ্তির কিছুদিনের মধ্যেই রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে দারুণ বৈষম্যের স্বীকারে পরিণত হয় পূর্ব পাকিস্তান।

সর্বোপরি ভাষা আন্দোলনকে কেন্দ্র করে, রাষ্ট্রভাষা বাংলা অর্জনের সংগ্রামে বাংলাদেশের মানুষ স্বকীয় জাতিসত্তায় সুসংহত রূপ ধারণ করে। ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে পশ্চিম পাকিস্তানভিত্তিক মুসলিমলীগের বিরুদ্ধে হক-ভাসানির নেতৃত্বে যুক্তফ্রন্টের অভাবনীয় বিজয়ের মধ্যদিয়ে বাঙালি জাতীয়তাভিত্তিক স্বাধীন রাষ্ট্রের স্বপ্ন দানা বেধে উঠে। ১৯৫৮ সালে জেনারেল আয়ুব খানের সামরিক শাসন জারি ও সংবিধান বাতিলের বিরুদ্ধে প্রবল বিক্ষোভে ১৯৬২ সালের ছাত্র আন্দোলন ও ৬ দফাভিত্তিক স্বাধীকার ও স্বায়ত্তশাসনের আন্দোলন এবং ১৯৬৯ সালের আইউব বিরোধী গণঅভ্যুত্থানের মধ্যদিয়ে আওয়ামী লীগের পুরোধা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে বাঙালির স্বাধীনতার স্বপ্নই যেন প্রবল থেকে প্রবলতর হতে থাকে। অবশেষে ১৯৭১ সালের ২৫ শে মার্চের রাতে গণহত্যা ও আক্রমণের মাধ্যমে পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী পূর্ব পাকিস্তান তথা বাংলার নিরস্ত্র জনসাধারণকে এক অসম যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে বাধ্য করে। ১৯৭১

১। রহিম, ড. মুহাম্মদ আব্দুর, চৌধুরী, ড. আব্দুল মমিন, মাহমুদ, ড. এবিএম, ইসলাম, ড. সিরাজুল, বাংলাদেশের ইতিহাস, নওরোজ কিতাবিস্তান, মে ১৯৯৮ পৃষ্ঠা. ৫১৭

Dhaka University Institutional Repository

সালের ২৫ মার্চের মধ্য রাতের নির্বিচারে গণহত্যা সমগ্র বাংলার মানুষকে ইস্পাত কঠিন ঐক্যে আবদ্ধ করে। সর্বস্তরের মানুষ যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে ঝাপিয়ে পড়ে। শুরু হয় মহান মুক্তিযুদ্ধ। যদিও সময়ের সাহসী সন্তান বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা ঘোষণা (২৫-২৬ মার্চ মধ্যরাত) বা ২৭ মার্চ বঙ্গবন্ধুর পক্ষে তদানীন্তন মেজর জিয়াউর রহমানের স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র পাঠ বিবেচনায় নিলেও, ইতিহাসের বৃহত্তর পরিমণ্ডলে স্বাধীনতার ঘোষক বা ঘোষণার বিষয়টি বিবেচনা করলে স্মরণ করা উচিত ১৯৫৩ সালে শেরেবাংলার ঘোষণা Let East Pakistan work out its own destiny; এবং ১৯৫৭ সালে মাওলানা ভাসানী পশ্চিম পাকিস্তানকে "আসলালামু আলাইকুম" জানানো প্রতীকী অর্থে হলেও স্বাধীনতার ঘোষণার ইতিহাসে এ উচ্চারণগুলো গুরুত্বসহ বিবেচ্য। উপরন্তু ৭ মার্চের ভাষণে যে দিকনির্দেশনা ছিল তা স্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন। উপরন্তু পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর আক্রমণের বিরুদ্ধে স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিরোধ করার সময়ে কোনো বাঙালিই ঘোষণার জন্য অপেক্ষা করেনি। সেই উত্তাল সময়ে কেউ কোনো ঘোষণা না দিলেও মুক্তিযুদ্ধ ঠিকই শুরু হতো এবং হয়েছিল।[২] সমগ্র বাংলার মানুষের ২৪০ দিনের লড়াইয়ে দেশ স্বাধীন হলো।

নব্য স্বাধীনতা প্রাপ্ত প্রতিটি দেশের স্বাধীনতার আন্দোলনের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় এর পেছনে জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক দল ও নেতার অবদান সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। একজন জাতীয়তাবাদী নেতা যতো সহজে জাতীয় স্বার্থ আদায়ের দাবিতে জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করতে সক্ষম হন, অপর কোনো নেতা তা পারেন না। বাংলাদেশের বেশকয়েকটি রাজনৈতিক দলের অস্তিত্ব থাকলেও সবগুলো একাত্তরের স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেনি। পাকিস্তানের কায়েমী স্বার্থ হাসিল ও এলিট শ্রেণীর প্রতিনিধি হিসেবে মুসলিম লীগ সর্বদা বাঙালিদের স্বার্থের বিরুদ্ধে, সংস্কৃতির বিরুদ্ধে ভাষার বিরুদ্ধে, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক স্বার্থের বিরুদ্ধে কাজ করেছে। পশ্চিমা প্রভু তোষণ নীতিতে ব্যস্ত থেকেছে। এসব কারণে বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে কিছু ডানপন্থী, কিছু বামপন্থী বাদে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ শুরু থেকে স্বাধীনতা প্রাপ্তি পর্যন্ত এদেশের গণমানুষের মধ্যে স্বাধীনতার চেতনা ছড়িয়ে দিতে সক্ষম হয়েছিল তেমনি তাদেরকে আন্দোলনমুখী করে তুলতে সমর্থ হয়েছিল। এক কথায় এদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে নেতৃত্বদানকারী সংগঠন এবং স্বাধীনতা আনয়নের ক্ষেত্রে আওয়ামী লীগ নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুরের যোগ্য ও বলিষ্ঠ নেতৃত্ব প্রশংসার দাবি রাখে। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন, ১৯৫৪

২। হোসেন, ড. সৈয়দ আনোয়ার, বাংলাদেশ রাষ্ট্র রাজনীতি গণতন্ত্র ও সুশাসন, একুশে বাংলা প্রকাশন, একুশে বইমেলা, ২০০৬ পৃষ্ঠা. ২০ ।

Dhaka University Institutional Repository

সালের যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন, ১৯৬২ সালের সংবিধান বিরোধী আন্দোলন, ১৯৬৬ সালের ছয়দফা আন্দোলন, ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থান, ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। স্বাধীনতার পূর্ব প্রস্তুতি হিসেবে এটা ছিল আওয়ামী লীগ ও তার নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি সমগ্র জাতির গুরুভার নেতৃত্ব সমর্পণ মূলত ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের চেতনার পথ ধরেই ১৯৭১ সালে বাঙালি জাতীয়তাবাদী দল আওয়ামী লীগ ও তার নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে সমগ্র জাতি ২৬ মার্চ থেকে ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১ দীর্ঘ ১০ মাস সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধে ৩০ লক্ষ শহীদের রক্তের বিনিময়ে ১০ লক্ষ মা বোনের সম্ভ্রমের বিনিময়ে, এক সাগর রক্তের বিনিময়ে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়। পৃথিবীর মানচিত্রে জন্ম হলো একটি রাষ্ট্রের, একটি মানচিত্রের ও একটি জাতির।

বিশ্বের প্রতিটি দেশে লক্ষ্য করা যায়, স্বাধীনতা অর্জনের পর নেতৃত্ব দানকারী জাতীয়তাবাদী দল শাসনকারী দল হিসেবে বিশেষ অবদান রাখতে সক্ষম হয় না। তেমনি বাংলাদেশে আওয়ামী লীগ এবং এর নেতৃত্বের মাঝে তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। স্বাধীনতা অর্জন পর্যন্ত আওয়ামী লীগ একক যোগ্য ও সুষ্ঠু নেতৃত্ব দান করলেও স্বাধীনতা উত্তরকালে দলটি সুশৃঙ্খলভাবে দেশের শাসনব্যবস্থা পরিচালনা করতে ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে। আওয়ামী লীগ নেতারা দেশের জনগণের নিকট শাসনকার্যে নেতৃত্ব প্রদানে অযোগ্য বলে প্রমাণিত হয়েছে।

সাধারণভাবে জাতীয়তাবাদী নেতারা উদার স্বভাবের হয়ে থাকে। যার প্রমাণ পাওয়া যায় আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবুর রহমানের মধ্যে। স্বাধীনতাউত্তরকালে প্রতিটি দেশের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, তাদের নেতারা সফল আন্দোলনের পর সেখানকার স্বাধীনতা বিরোধীচক্র, প্রতিবিপ্লবী গ্রুপসহ সকল বিরোধীদেরকে সমূলে উৎখাত করেছেন। কিন্তু বাংলাদেশের ক্ষেত্রে তা ঘটেনি। ফলে এ সকল গৃহশত্রুরা পুনরায় মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে এবং বিভিন্ন ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপের মাধ্যমে দেশের মধ্যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে। শেখ মুজিব উদার মনোভাব এবং স্বীয় দলের অভ্যন্তরীণ কোন্দলের ফলে স্বজনপ্রীতি বৃদ্ধি পায়। দ্রব্যমুল্যের উর্ধ্বগতি জনমনে আশঙ্কার সৃষ্টি করে এবং ভ্রান্ত পররাষ্ট্র নীতির ফলে আন্তর্জাতিক চক্রান্তের শিকার হন শেখ মুজিবুর রহমান নিজে এবং তার দলীয় সদস্যবর্গ। আর দেশি বিদেশি চক্রান্তের ফল স্বরূপ ১৯৭৪ সালে দেখা দেয় এক ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ। যার গ্লানি থেকে দলটি ও তার নেতারা আজো রেহাই পায়নি।

Dhaka University Institutional Repository

আওয়ামী লীগ স্বাধীনতা আন্দোলনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করলেও এবং একটি সুসংগঠিত দল হলেও ইহা এদেশের মানুষকে যে আশার বাণী শুনিয়েছিল শাসনকারী দল হিসেবে আওয়ামী লীগ তা পূরণ করতে সক্ষম হয়নি। বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন দ্বিতীয় বিপবের কর্মসূচি সফল হয়নি এবং দেশের দুঃখি মানুষের মুখে হাসি ফোটেনি। বিশ্ব ইতিহাস পর্যালোচনা করলে এটা স্পষ্ট করলে হয়ে উঠে যে, প্রতিটি জাতীয়তাবাদী নেতারই শেষ পরিণতি এমন হয়। যেমনটি ঘটেছিল চিলির আলেন্দে, ইন্দোনেশিয়ার সুকার্নো এবং বাংলাদেশের শেখ মুজিবের ক্ষেত্রে। জাতীয়তাবাদী চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে বাঙালি জাতি তাকে যে অবাধ ক্ষমতা ও সম্মানের আসনে বসিয়েছিল পরবর্তীতে তিনি বিশৃঙ্খল শাসন ব্যবস্থার কারণে তাদের সাধ পূরণ করতে পারেনি।[৩]

পরিশেষে জনৈক বিবিসি ভাষ্যকারের সঙ্গে সুর মিলিয়ে বলা যায় যে, "শেখ মুজিব একজন জাতীয়তাবাদী এবং বিপ্লব সংগঠনকারী নেতা হিসেবে প্রথম শ্রেণীর কিন্তু শাসনকারী নেতারূপে তিনি দ্বিতীয় শ্রেণীর নেতার পর্যায়ে পড়েন।"

একটি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক গভীর চক্রান্ত, হত্যাকাণ্ড, ক্যু, পাল্টা ক্যু, অবিশ্বাস, সন্দেহ ও পিচ্ছল পথ ধরে জেনারেল জিয়াউর রহমান ক্ষমতার মসনদে আসীন হয়েছিল। ক্ষমতায় আরোহণের এ প্রক্রিয়া তিনি কখনো খেলিয়েছেন, কখনো নিরবতার অভিনয় করেছেন, কখনো সক্রিয় খেলায় অংশগ্রহণ করেছেন, কখনো করুণা ভিক্ষা নিয়েছেন, কখনো বিশ্বাসঘাতকতার আশ্রয় নিয়েছেন। যখন যেমন প্রয়োজন তেমন খেলা খেলেই তিনি ক্ষমতার মসনদ দখল করেছিলেন। তাঁর খেলার নেপথ্যে ছিল দেশি ও বিদেশি চক্রান্ত। বাংলার আপামর জনসাধারণ ছিল দেশি ও বিদেশি চক্রান্ত। বাংলার আপামর জনসাধারণ ছিল এ খেলার বাইরে। জেনারেল জিয়ার ক্ষমতা দখল পরবর্তী বন্ধুরা ছিল স্বাধীনতা বিরোধী, আওয়ামী বিরোধী শক্তি। তারা বাঙালি জাতীয়তার নিশানা নিশ্চিহ্ন করে ফেলে অতি দ্রুত। অসাম্প্রদায়িক সমাজচিন্তার বিপরীত মেরুতে অবস্থান নিলেন জোরালোভাবে। আন্তর্জঅতিক রাজনীতির পছন্দ অপছন্দ এখানে একটি বিরাট অনুঘটকের ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। অশিক্ষিত, অর্ধশিক্ষিত, কুসংস্কারচ্ছন্ন জনগোষ্ঠীর মনজয়ের তাবৎ ততিভূত কর্মপদ্ধতি গ্রহণে যথেস্ট মুন্সিয়ানার পরিচয় দিয়েছিল জেনারেল জিয়া ও তার পরমর্শদাতা গ্রুপ। এছাড়া তথাকথিত গণতন্ত্র ও বহুদলীয় রাজনীতি, ধর্মকে সস্তা জনপ্রিয়তার জন্য ব্যবহারের যাবতীয় কৌশল যা পূর্বেই পাকিস্তানি শাসকদের কাছ থেকে রপ্ত করা হয়েছিল তার অবিকল প্রয়োগ চলতে লাগল। শেখ মুজিবুর রহমানের একজন

৩। ভূঁইয়া, ড. মোহাম্মদ আবদুল ওদুদ, বাংলাদেশের রাজনৈতিক উন্নয়ন, আজিজিয়া বুক ডিপো, জানুয়ারী ২০০৮।

Dhaka University Institutional Repository

প্রধানমন্ত্রী ও রাষ্ট্রপতি হিসেবে দেশ শাসনের ব্যর্থতার সুযোগ নিয়ে জেনারেল আওয়ামী সমর্থন বিরোধী গ্রুপ ও স্বাধীনতা বিরোধী গ্রুপের সমর্থনে এবং কিছু কিছু নতুন কর্মসূচি, চিন্তাচেতনা ও জনসম্পৃক্ততার বদৌলতে আপামর জনসাধারণের কাছে পরিচিত হয়ে উঠেন। যদিও ২৭ শে মার্চ কালুরঘাটে বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র পাঠের মাধ্যমে জেনারেল জিয়া ইতোমধ্যে উচ্চপর্যায়ের জনসাধারণের কাছে পরিচিত ছিল। এছাড়া বক্তি জীবনে সততা ও নিষ্ঠার মাধ্যমে জেনারেল জিয়া আমজনতার কাছে সমাদৃত হয়ে উঠেছিলেন। কিন্তু অমসৃন পথে ক্ষমতায় আরোহণের কারণে জেনারেল জিয়া বহুবার ক্যু ও পাল্টা ক্যু-এর সম্মুখীন হয়েছেন। যার ফলে বিপুল সংখ্যক সেনা ও বিমান বাহিনীর অফিসার ও জওয়ানদের অকালে হত্যা করা হয়। যারা ছিল মহান মুক্তিযুদ্ধের বীর সেনানী। অবশেষে অপর এক বীর মুক্তিযোদ্ধা জেনারেল এম. এ মঞ্জুরের হাতে চট্টগ্রামে ৩০ মে ১৯৮১ খ্রিষ্টাব্দে জেনারেল জিয়াউর রহমানকে নির্মমভাবে প্রাণ হারাতে হয়। যদিও জেনারেল জিয়অ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আদর্শ বিরোধী এক নতুন আদর্শে দেশ পরিচালনায় ব্রতী হয়েছিলেন। কিন্তু তার সে প্রক্রিয়াও অঙ্কুরে বিনষ্ট হল। তার ষড়যন্ত্রের প্রতিফল তিনি ষড়যন্ত্রের মাধ্যমেই পেলেন।

সামরিক আইন জারি করে জেনারেল জিয়া সামরিক আইনের আওতায় তথাকথিত গণভোট ও নির্বাচনকে উদার গণতান্ত্রিক শাসন বলার কোনো অবকাশ নেই। তার প্রবর্তিত ধারাকে সামরিক গণতন্ত্র (Martial Democracy) বা সাংবিধানিক স্বৈরতন্ত্র (Constitutional Dictatorship) বলে আখ্যায়িত করা যায়। সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে তিনি রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা অস্বাভাবিকভাবে যেমন বৃদ্ধি করেছিলেন তেমনি সংসদের ক্ষমতা মারাত্মকভাবে খর্ব করে সংসদকে রাষ্ট্রপতির আজ্ঞাবহ প্রতিষ্ঠানে পরিণত করে গণতন্ত্রের পথ চলাকে বিপন্ন করে তুলেছিলেন। এছাড়া দেশের সমগ্র নীতি নির্ধারণকারী সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানে সামরিক বাহিনীর কর্মকর্তাদের নিয়োগ করে সমগ্র প্রশাসন ব্যবস্থাকে আধাসামরিকীকরণ করে গণতন্ত্রের প্রাণ শক্তিকে গলাটিপে দিয়েছিলেন। বাংলাদেশ এক পঙ্গু গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে পরিণত হয়। এছাড়া শুধুমাত্রা গণভোটের জোরে তিনি বাংলাদেশের সংবিধানে এতবেশি সংশোধন আনয়ন করেন এবং যার ফলে সংবিধানের মূল চেতনা একেবারে বদলে যায় যা কোনোভাবেই গণতান্ত্রিক বলা চলে না। মূলত. বন্দুকের নলের জোরে জেনারেল জেনারেল জিয়া এক "আধা সামরিক আধা গণতান্ত্রিক" শাসন কায়েম করেছিল। উপরন্তু তার আমলের নির্বাচনকে কোনোভাবেই সুষ্ঠু নির্বাচন বলা চলে না। কাজেই বলা চলে জেনারেল জিয়অর আমলের গণতন্ত্র ছিল "বন্দুকের

Dhaka University Institutional Repository

নলের গণতন্ত্র" দুর্ভাগা জাতি দুঃশাসনের অন্ধকার থেকে সেনাশাসনের মধ্যযুগীয় মহান্ধকারে নিমজ্জিত হলো। রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের মৃত্যুর পর বাংলাদেশের রাজনীতিতে এক ব্যাপক পরিবর্তন সূচিত হয়। জিয়াউর রহমানের নেতৃত্ব, পৃষ্ঠপোষকতা ও পরিকল্পনার মাধ্যমে গড়ে উঠা বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপি তার মৃত্যুর পর চরম অন্তর্দ্বন্দ্ব ও সংকট নিপতিত হয়। জিয়াউর রহমান যতদিন ছিলেন ততদিন দলীয় অন্তর্দ্বন্দ্ব ও কলহ তার ব্যক্তিগত প্রভাবে খুব একটা মাথাচাড়া দিয়ে উঠেনি। কিন্তু তার মৃত্যুর পর এ দ্বন্দ্ব ও ক্ষমতার লড়াই প্রকাশ্যে প্রবল ও তীব্র আকার ধারন করে। জিয়াউর রহমানের মৃত্যুর পর সাংবিধানিক নিয়মানুযায়ী দেশের উপরাষ্ট্রপতি বিচারপতি আব্দুস সাত্তার রাষ্ট্রপতির দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। কিন্তু ক্ষমতাসীন বিএনপি সরকার শাসনকায পরিচালনার ক্ষেত্রে এবং দলীয় অন্তর্দ্বন্দ্বের ফলে রাজনৈতিক পরিবেশ ক্রমশ ঘোলাটে হতে থাকে। দেশ এক সংকটাপন্ন অবস্থার সম্মুখীন হয়। দুর্নীতি ও সন্ত্রাস জীবনের অনুমোদনীয় ধারায় পরিণত হওয়ায় জনগণের জন্য অসহনীয় দুর্দশা সৃষ্টি করেছে, আইন-শৃঙ্খলার ভয়াবহ অবনতি ঘটেছে। সরকারের ছত্রছায়ায় খুনি ও দুস্কৃতকারীরা লাগামহীনভাবে সমাজবিরোধী কাজে লিপ্ত হয়। জনৈক প্রভাবশালী মন্ত্রীর সরকারি বাসভবনে কুনি আসামির আশ্রয়দান সরকারের নিরপেক্ষতা ও গ্রহণযোগ্যতা সম্পর্কে জনমনে প্রশ্ন দেখা দেয়। সবমিলে তখন দেশে এমন এক নৈরাজ্যকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় যে, শান্তি পূর্ণভাবে সৎ নাগরিকদের পক্ষে জীবনযাপন করা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে। এমতাবস্থায় ১৯৮২ সালের ২৪ শে মার্চ সেনাবাহিনী প্রধান লে. জেনারেল হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ এক সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে রাষ্ট্রপতির সাত্তার সরকারকে পদত্যাগ করিয়ে প্রধান সামরিক আইন প্রশাসকের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। দায়িত্ব গ্রহণের পর জে. এরশাদ দীর্ঘ ৯ বছর ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিলেন।

এরশাদ বিরোধী দুর্বার গণআন্দোলনের ফলে ১৯৯০ সালের ৬ই ডিসেম্বর এরশাদ সরকারের পতনের ক্রান্তিলগ্নে প্রধান রাজনৈতিক জোটগুলোর সম্মিলিত অনুরোধের প্রেক্ষিতে ১৯৯০ সালের ডিসেম্বর মাসে বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমেদ অস্থায়ী রাষ্ট্রপতির দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। নির্দলীয় নিরপেক্ষ সরকারের তত্ত্বাবধানে ১৯৯১ সালের ২৭ সলের ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত ৫ম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বাংলাদেশ জাতীয়বাদী দল (বিএনপি) সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। তবে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা না পাওয়ায় সরকার গঠনের ক্ষেত্রে জটিলতারর সৃষ্টি হয়। এ সময় সরকার গঠনের প্রশ্নে বিএনপি ও জামায়াতে ইসলামীর মধ্যে একটি "অপ্রকাশ্য বা গোপন

Dhaka University Institutional Repository

সমঝোতা" হয়। জামায়াতে ইসলামী সরকার গঠনের প্রশ্নে বিএনপিকে সমর্থনদান করায় অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ ১৯৯১ সালের ১৯ মার্চ তারিখে বেগম খালেদা জিয়াকে প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ করেন। আর এখন থেকেই শুরু হয় বেগম খালেদা জিয়ার শাসনামল।

রাজনীতিবিদদের কলঙ্কের তিলক তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা সংবিধানে সন্নিবেতি হয় ১৯৯৬ সালে। ২১ মার্চ ১৯৯৬, তদানীন্তন ভোটভাকাতি আর সন্ত্রাসের মাধ্যমে নির্বাচিত বিএনপি সরকার ২১ মার্চ ১৯৯৬ ষষ্ঠ সংসদে সকল বিরোধী দলের তীব্র আন্দোলনের ফলে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিল সংসদে উত্থাপন করেন। ২৬ মার্চ ১৯৯৬ জাতীয় সংসদে ত্রয়োদশ সংশোধনী বিল উত্থাপনের মাধ্যমে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিল পাস হয়। সর্বদলীয় তীব্র গণআন্দোলনের ফলে ১৯৯৬ সালের ৩০ মার্চ ষষ্ঠ জাতীয় সংসদ ভেঙ্গে দিয়ে প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া পদত্যাগ করতে বাধ্য হন। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে রাষ্ট্রপতি আব্দুর রহমান বিশ্বাস সাবেক বিচারপতি সরকারের প্রধান উপদেষ্টা নিয়োগ করেন। বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমেদের অন্তর্বর্তীকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের পর এবার তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হল। মূলত. রাজনীতিবিদদের অনৈতিক কর্মকাণ্ড, নীতিহীন শাসনকার্য, আকণ্ঠ দুর্নীতিতে নিমজ্জিত হওয়া, সন্ত্রাস ও পেশিশক্তির কাছে আত্মসমর্পণ জাতীয় জীবনে ঘোরতর বিপর্যয় নেমে এসেছে। তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থার মাধ্যমে প্রমাণ হয়েছে জাতীয় নেতাদের নিম্নশ্রেণীর মানুষের উর্ধ্বে নন, জাতির অনাগত ভবিষ্যতের জন্য, গণতন্ত্রের অব্যাহত বিকাশ ও শ্রীবৃদ্ধির জন্য এবং গণতন্ত্রের অব্যাহত বিকাশ ও শ্রীবৃদ্ধির জন্য এবং নতুন প্রজন্মকে সত্য ও সুন্দরের পথে আহবান করার মতো উচ্চমানবতা তারা ধারণ করতে তারা ব্যর্থ। হীনতা, নীচতা, সঙ্কীর্ণতা, স্বার্থপরতা, সন্ত্রাস, দুর্নীতি, নীতিহীনতা ও নৈতিকতার স্খলন, পতন, পচন তাদেরকে গ্রাস করে নিয়েছে। এত বিশাল আত্মত্যাগ, এত বিপুল জীবন উৎসর্গ, এক সমুদ্র রক্তের বিনিময়ে অর্জিত স্বাধীনতা ও মুক্তির স্বপ্ন লালন ও তাকে সফলতার বন্দরে পৌছে দেয়ার মতো নেতার অভাব বড় বেশি নেই বললেই চলে। আলোকিত নেতার অভাব, নীতিবান নেতৃত্ব অনুপস্থিত, দক্ষ জননায়ক নেই বললেই চলে। অন্যায়ের সাথে আপস, নীতিহীনতার সাথে আপস আদর্শ থেকে বিচ্যুতি, ব্যক্তিস্বার্থের কাছে বৃহৎস্বার্থ জলাঞ্জলি দেয়াটা আচারে পরিণত হয়েছে। কেন্দ্র থেকে তৃণমূল পর্যায়ে একই চিত্র। একই দর্শন, একই আদর্শ। মুক্তিযুদ্ধের মহান আদর্শ থেকে যেন সবাই বিচ্যুত বিতাতিড়ত স্বেচ্ছায় নির্বাসিত। এরই বিষময় ফল তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা।

Dhaka University Institutional Repository

৩০ মার্চ ১৯৯৬ সালের আন্দোলনের মুখে খালেদা জিয়া পদত্যাগ করলে বিচারপতি হাবিবুর রহমান তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা নিযুক্ত হন। ১৯৯৬ সালের ৩ এপ্রিল প্রধান উপদেষ্টা এ দেশের ১০জন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা হিসেবে নিয়োগ দান করেন। তত্ত্বাবধায়ক সরকার উচ্চপদস্থ আমলা মোহাম্মদ আবু হেনাকে প্রধান নির্বাচন কমিশনার নিয়োগ করেন। তত্ত্বাবধায়ক সরকার ১২ জুন ১৯৯৬ সালে একটি সফল কারচুপিহীন ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠান করে প্রমাণ করেন যে, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য মহৎ হলে এদেশেও ভালকিছু করা সম্ভব। একটি অবাধ নির্বাচন অনুষ্ঠান কঠিন কিছু নয় যা আমাদের রাজনীতিবিদরা করতে দারুনভাবে ব্যর্থ হয়েছেন। ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ, জনগণের পবিত্র আমানত ভোটাধিকার রক্ষায় দারুণ ব্যর্থতা আমাদের নেতাদের সংকটকে প্রকটতর করে তুলেছে। যাই হোক, এ নির্বাচনের মাধ্যমে সংখ্যাগরিষ্ঠ দল ও দলনেত্রী শেখ হাসিনা ওয়াজেদ জাতীয় পার্টির সমর্থনে ২৩ জুন রাষ্ট্রপতির আহ্বানে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন। আরো ১৯ জন মন্ত্রীর শপথ গ্রহণের মাধ্যমে দীর্ঘ ২১ বছর পর বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে "জাতীয় ঐক্যমতের সরকার" পথ চলা শুরু করে। কিন্তু এ সরকারও জাতির প্রত্যাশা পূরণে ব্যর্থ হয়। জাতীয় জীবনে প্রতিটি ক্ষেত্রে মহাবিপর্যয় নেমে আসে। সন্ত্রাস, দুর্নীতি, কালোবাজারি, রাজনৈতিক অস্থিরতা, দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি, জনজীবনে নিরাপত্তাহীনতা, প্রবল দলীয়করণ, শেয়ার কেলেঙ্কারী, পারিবারিকীকরণ, গুপ্তহত্যা ইত্যাদির কারণে পরবর্তী ২০০১ সালে সাধারণ নির্বাচনে জনগণের দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হয়। নির্বাচনে শোচনীয়ভাবে পরাজয় বরণ করে যার মাধ্যমে নেতৃত্বের সংকট প্রকট আকার ধারণ করে। জাতি পুনর্বার হতাশার অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়। পুরো জাতি যেন নেতৃত্বের সঙ্কটের দুষ্টচক্রে আবদ্ধ হয়ে পড়েছে।

শেখ মুজিবুর রহমানের শাসনামল[৪]

১৯৭১ সালে স্বাধীনতা সংগ্রামের সূচনাকালীন ১০ এপ্রিলের স্বাধীনতা ঘোষণাপত্রের বলে ১৭ এপ্রিল হতে আওয়ামী লীগ শেখ মুজিবুর রহমানকে রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম উপরাষ্ট্রপতি (অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি) তাজউদ্দিন আহমেদ প্রধানমন্ত্রী, এম এ মনসুর আলী, অর্থমন্ত্রী, এম কামরুজ্জামান, স্বরাষ্ট্র, ত্রাণ ও পুনর্বাসনমন্ত্রী এবং খন্দকার মোশতাক আহমদেকে পররাষ্ট্র ও আইনমন্ত্রী করে কুষ্টিয়া জেলায় মুজিব নগরে স্বাধীন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের বিপ্লবী

৪। চৌধুরী, ড. হাসানুজ্জামান, আওয়ামীলীগ ও বাকশাল, ১৯৭২-১৯৭৫, সিলেট: বাংলাদেশ প্রাকাশনী, ১৯৮০ চৌধুরী, ড. হাসানুজ্জামান, ১৫ই আগষ্টের সামরিক অভ্যুত্থান মুজিব হত্যা ও ধারাবহিকতা, ঢাকা; অঙ্কুর প্রকাশনী ১৯৯৪-২০১০

Dhaka University Institutional Repository

সরকার গঠনের মাধ্যমে বাংলাদেশের শাসনভার গ্রহণ করে। মুক্তিযুদ্ধ সমাপ্তির পর ১৯৭১ সালের ২২ ডিসেম্বর প্রবাসী বা বিপ্লবী সরকার ঢাকায় ফিরে আসেন এবং দেশ পরিচালনার উদ্দেশে শাসন ব্যবস্থার মূলনীতি নির্ধারণ করেন। ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তানের কারাগার হতে স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করেন এবং ১১ জানুয়ারি তারিখে অস্থায়ী সংবিধান আদেশ জারি করে বাংলাদেশের সাংবিধানিক যাত্রার শুভ সূচনা করেন। এ সময় দেশে সংসদীয় সরকার পদ্ধতি চালু করে শেখ মুজিবুর রহমান প্রধানমন্ত্রীর পদ অলংকৃত করেন এবং রাষ্ট্রপতি হন বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী। বাংলাদেশের জন্য একটি স্থায়ী সংবিধান রচনার প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে রাষ্ট্রপতি ১৯৭২ সালের ২৩ মার্চ 'বাংলাদেশ গণপরিষদ নামে একটি আদেশ জারি করেন। এ আদেশ অনুসারে ১৯৭০ সালের ৭ ডিসেম্বর হতে ১৯৭১ সালের ১ মার্চ পর্যন্ত সাবেক পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদ ও পূর্ব পাকিস্তানের প্রাদেশিক পরিষদের আসনসমূহে বাংলাদেশ হতে নির্বাচিত সকল সদস্য সমন্বয়ে গণপরিষদ গঠিত হয়। এরপর গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি ১৯৭২ সালের ১০ এপ্রিল গণপরিষদের প্রথম অধিবেশন আহ্বান করে। অধিবেশনের প্রথমদিনে গণপরিষদ সদস্যগণ কর্তৃক স্পিকার নির্বাচিত হন শাহ আব্দুল হামিদ ও ডেপুটি স্পিকার নির্বাচিত হন জনাব মোহাম্মদ উল্লাহ। ১১ এপ্রিল ড. কামাল হোসেনকে সভাপতি করে ৩৪ সদস্যবিশিষ্ট 'খসড়া সংবিধান প্রণয়ন কমিটি' গঠন করা হয়। ১৯৭২ সালের ১২ অক্টোবর বাংলাদেশ গণপরিষদের দ্বিতীয় অধিবেশন বসে। সেদিন আওয়ামী লীগ সাংগঠনিক কমিটি (Awami League Organizing Committee) কর্তৃক উত্থাপিত সংশোধনীর সাথে সঙ্গতি রক্ষা করে খসড়া সংবিধান কমিটির সভাপতি ড. কামাল হোসেন ও সংবিধানটিকে বিল আকারে গণপরিষদে পেশ করেন। ১৩ অক্টোবর গণপরিষদ কতিপয় সংশোধনী সমেত খসড়া সংবিধানের কার্যপ্রণালী সংক্রান্ত বিধিমালা গ্রহণ করে। গণপরিষদে সাংবিধানিক বিলটির ওপর বক্তব্য রাখতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান বলেন, "This Constitution is written in martyr's blood," অর্থাৎ এ সংবিধান শহীদের রক্তে লিখিত। সে সাথে তিনি আশা প্রকাশ করেন যে, এ সংবিধান দেশের সমগ্র জনগণের আশা আকাঙ্খার মূর্ত প্রতীক বলে বিবেচিত।

Dhaka University Institutional Repository

গণপরিষদে বিতর্ক ও খসড়া সংবিধানের অনুমোদন (Debate in the Constituent Assembly and the Final Approval in the Draft Constitution):

বিভিন্ন দল, গোষ্ঠী ও ছাত্র সংগঠন কর্তৃক উত্থাপিত মতামত, আলোচনা, সমালোচনার পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৭২ সালের ১৯ অক্টোবর খসড়া সংবিধান বিলের ওপর সাধারণ আলোচনা আরম্ভ হয়। আলোচনার প্রারম্ভেই বিলটির আলোচনা ৩০ অক্টোবর পর্যন্ত স্থগিত রেখে জনমত যাচাই করার জন্য বিরোধীদলীয় সদস্য সুরঞ্জিত সেন গুপ্ত অনুরোধ জ্ঞাপন করেন। তাকে সমর্থন করেন নির্দলীয় সদস্য মানবেন্দ্র লারমা। তারা এ অভিমত ব্যক্ত করেন, মাত্র ৭ দিনের মধ্যে সংবিধানের খসড়া সম্পর্কে দেশের সকল অঞ্চলের সকল স্তরের জনগণের সঠিক প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে ধারণা পাওয়া সম্ভব নয়। প্রতিটি রাজনৈতিক ও অরাজনৈতিক সংগঠন, বার সমিতিসমূহ, শিক্ষক ছাত্র প্রত্যেককেই এ বিষয়ে তাদের অভিমত প্রকাশের সুযোগ দেয়া উচিত। আইনমন্ত্রী এ প্রস্তাব সমর্থন করেন কিন্তু সাধারণ আলোচনা স্থগিত না রেখে জনগণের নিকট থেকে তাদের মতামত গ্রহণের বিষয়ে অভিমত পেশ করেন।

১৯ অক্টোবর থেকে ৩০ অক্টোবর পর্যন্ত গণপরিষদে সংবিধান বিলের ওপর সাধারণ আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। ৮দিনে মোট ১০টি বৈঠকে প্রায় ৩২ ঘণ্টা ধরে আলোচনা চলে। গণপরিষদের মোট সদস্যসংখ্যা ছিল ৪০৪ জন, কিন্তু খসড়া সংবিধান সংক্রান্ত সাধারণ বিতর্কে অংশগ্রহণ করেন মোট ৪৮ জন। এদের মধ্যে ৪৫ জন ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ দলের সদস্য, ১ জন বিরোধী ন্যাপ দলের এবং ২ জন নির্দলীয় সদস্য। বিতর্কে অংশগ্রহণকারী ৪৮ জন সদস্যের ১৬ জনই ছিলেন খসড়া সংবিধান প্রণয়ন কমিটির সদস্য। সরকারি দলের অনেক সদস্য বিতর্কে অংশগ্রহণের জন্য চীপ হুইপের নিকট আবেদন জানিয়ে নিরাশ হন। তবে গণপরিষদের বাইরে সংসদীয় দলের বৈঠকে এ সদস্যগণ সংবিধানের ওপর বিস্তারিত আলোচনা করার সুযোগ পান। আওয়ামী লীগের সংসদীয় দলের বৈঠকে ৭৭টি সংশোধনী প্রস্তাব উত্থাপন করেন। এ সংশোধনী প্রস্তাবগুলো থেকে ৮০টি সংশোধনী প্রস্তাব চূড়ান্তরূপে গৃহীত হয়।

বিলের ওপর দ্বিতীয় পাঠ আরম্ভ হয় ৩১ অক্টোবর ১৯৯২ এবং ৩ নভেম্বর পর্যন্ত চলে। মোট ১৬৩ টি সংশোধনী প্রস্তাব পরিষদে উত্থাপিত হয় এবং ৮৪টি সংশোধনী গৃহীত হয়। সর্বাপেক্ষা বেশি সংখ্যক সংশোধনী প্রস্তাব আনেন ন্যাপ সদস্য সুরঞ্জিত সেন গুপ্ত। দ্বিতীয় বৃহত্তম সংখ্যার সংশোধনী প্রস্তাব আনেন নির্দলীয় সদস্য মানবেন্দ্র লারমা। বিরোধীদলীয় সুরঞ্জিত সেন গুপ্তের

Dhaka University Institutional Repository

মাত্র একটি সংশোধনী প্রস্তাব গৃহীত হয় এবং সুরঞ্জিতই একমাত্র সদস্য যিনি গণপরিষদে ১৯৭২ সালে খসড়া সংবিধানের তীব্র বিরোধিতা করেন এবং এটা পাকিস্তানের ১৯৫৬ এবং ১৯৬২ সালে অনুরূপ, এটা স্বৈরাচারী ও গণতন্ত্রকে টুটি টিপে হত্যার শামিল বলে আখ্যায়িত করে এতে স্বাক্ষরদানে বিরত থাকেন (দেখুন ২৪/১০/১৯৭২-এ গণপরিষদে সুরঞ্জিত সেনগুপ্তের ভাষণ। প্রকাশিতঃ দৈনিক বাংলা, ২৫-১০-১৯৭২)। বিলের ওপর তৃতীয় ও শেষ পাঠ অনুষ্ঠিত হয় ১৯৭২ সালের ৪ নভেম্বর। প্রধানমন্ত্রী ও বিরোধীদলীয় সদস্যদের বক্তব্যের পর সেই দিন দুপুরে ১.১০ মিনিটে সদস্যদের তুমুল হর্ষধ্বনির মধ্যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান গণপরিষদ কর্তৃক গৃহীত হয়। এ সংবিধান মাতৃভাষা বাংলায় রচিত হয়, কিন্তু একটি ইংরেজি অনুমোদিত পাঠও আছে। ১৫৩টি অনুচ্ছেদ বিশিষ্ট এ সংবিধানের ৫০টি অনুচ্ছেদ সংশোধনীসহ গৃহীত হয়।

১৯৭২ সালের ১৪ ও ১৫ ডিসেম্বর গণপরিষদের একটি আনুষ্ঠানিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। এ অধিবেশনে পরিষদ সদস্যগণ হস্তলিখিত একটি সাংবিধানিক দলিলে স্বাক্ষর দান করেন। ন্যাপ সদস্য সুরঞ্জিত সেন গুপ্ত এতে স্বাক্ষর দানে বিরত থাকেন। বিজয় অর্জনের বছর পূর্তির দিনে ঐতিহাসিক ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭২ থেকে বাংলাদেশের সংবিধান কার্যকরী হয় এবং সেদিন গণপরিষদ ভেঙ্গে দেয়া হয়।

১৯৭৩ সালের প্রথম সাধারণ নির্বাচন (First General Election in Bangladesh of 1973)ঃ

স্বাধীনতাত্তোর বাংলাদেশে ১৯৭২ সালে নতুন সংবিধান অনুসারে সরকার গঠনের জন্য ১৯৭৩ সালের ৭ মার্চ জনগণের সরাসরি ভোটে জাতীয় সংসদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এটা ছিল স্বাধীন বাংলাদেশের মাটিতে প্রথম সাধারণ নির্বাচন। নতুন সংবিধান প্রবর্তনের পর রাষ্ট্র শাসন পরিচালনার উদ্দেশে জনসাধারণের সম্মতি লাভের জন্য আওয়ামী লীগ সরকার এ নির্বাচনকে বাংলাদেশ সংবিধানের চারটি মূলনীতি-জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা-এর ওপর গণভোট বলে অভিহিত করেন।

৭ মার্চের নির্বাচনে মোট ১৪টি রাজনৈতিক দল অংশগ্রহণ করে। এরমধ্যে আওয়ামী লীগ ৩০০, জাসদ ২৩৬, ন্যাপ মোঃ ১৬৯, বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি ৫, বাংলার কমিউনিস্ট পার্টি ৩, বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি (লেনিনবাদ) ২, বাংলা জাতীয় লীগ ১১, বাংলাদেশ জাতীয় লীগ

Dhaka University Institutional Repository

৮, এবং সমাজবাদী দল, বাংলাদেশ শ্রমিক ফেডারেশন, জাতীয় কংগ্রেস, গণতান্ত্রিক দল ও বাংলা ছাত্র ইউনিয়ন- তারা প্রত্যেকেই ১ জন প্রার্থী দিয়েছিলেন। স্বতন্ত্র প্রার্থীর সংখ্যা ছিল ১২০ জন। জাতীয় সংসদের ৩০০টি সাধারণ আসনের ২৮৮টিতে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। বাকি ১২টির মধ্যে ১১টি আসনে আওয়ামী লীগ দলীয় প্রার্থীরা বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হন এবং অপর একটি আসনে আওয়ামী লীগ দলীয় সদস্যের মৃত্যুর কারণে নির্বাচন পরে অনুষ্ঠিত হয়। ২৮৮টি আসনের জন্য ১৪টি রাজনৈতিক দলসহ মোট ১,০৭৫ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। এ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ ২৯১টি আসনে জয়লাভ করেন। জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের ২ জন প্রার্থী এবং বাংলাদেশ জাতীয় লীগের নেতা জনাব আতাউর রহমান খান বিজয়ী হন। স্বতন্ত্র প্রার্থীগণ ৬টি আসন লাভ করেন। নির্বাচনে শতকরা ৫৬ জন ভোটার ভোটদান করেন, প্রদত্ত ভোটের শতকরা ৭৩.১৭ ভাগ লাভ করে আওয়ামী লীগ। নির্বাচনের পরে আওয়ামী লীগ সদস্যগণ সংসদের ১৫টি সংরক্ষিত মহিলা আসনের সবগুলোই লাভ করেন। ফলে ১৯৭৩ সালে ৩১৫ জন সদস্য বিশিষ্ট বাংলাদেশ জাতীয় সংসদে দলগত অবস্থান ছিল ঃ আওয়ামী লীগ ৩০৬টি আসন, জাসদ ২টি, স্বতন্ত্র ৫টি আসন, বাংলাদেশ জাতীয় লীগ ১টি আসন এবং ন্যাপ (ভাসানী) ১টি আসন (নির্দলীয় ৬জন সদস্যের ১ জন ন্যাপে (ভাঃ) যোগদান করেন।)।

৭ মার্চের সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ ৩০৬টি আসন লাভ করে জাতীয় সংসদের একচেটিয়া আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করে এবং জনগণের নিকট হতে দেশ শাসনের ম্যান্ডেট লাভ করে। অতঃপর ১৯৭৩ সালের ১৩ মার্চ শেখ মুজিবুর রহমানের প্রধানমন্ত্রীত্বে ২১ সদস্যের মন্ত্রিসভা গঠন করে আওয়ামী লীগ দেশ পরিচালনা আরম্ভ করে।

১৯৭৩ সালের সাধারণ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের একক বিজয়ের কতগুলো কারণ বর্তমান ছিল। এগুলো নিম্নরূপঃ

প্রথমত-স্বাধীনতা আন্দোলনে আওয়ামী লীগের সক্রিয় ভূমিকা জনগণ এ নির্বাচনে সঠিকভাবে মূল্যায়ন করে।

দ্বিতীয়ত-বাংলাদেশের জনগণের মুক্তির ব্যাপারে শেখ মুজিবুর রহমানের সংগ্রামী ভূমিকা জনসাধারণের ওপর গভীর প্রভাব বিস্তার করে।

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয়ত-স্বাধীনতাত্তোর বাংলাদেশে বিরোধী দলগুলো তখনও সুদৃঢ়ভাবে সংগঠিত হতে পারেনি।

চতুর্থত-মুক্তি সনদ বলে কথিত আওয়ামী লীগের ছয়দফা জনগণকে এ দলের প্রতি আকৃষ্ট হতে প্রচণ্ডভাবে প্রভাবিত করেছিল।

পঞ্চমত- তখন আওয়ামী লীগ ক্ষমতাসীন ছিল বলে নির্বাচনে সরকারি ক্ষমতাকে ব্যবহার করা আওয়ামী লীগের পক্ষে খুবই সহজ ছিল। অবশ্য নির্বাচনোত্তরকালে বিরোধী দলগুলো আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে নির্বাচনে ব্যাপক দুর্নীতি ও কারচুপির অভিযোগ তোলেন।

১৯৭৩ সালের ৪ এপ্রিল প্রথম নির্বাচিত জাতীয় সংসদের অধিবেশন বসে। জনাব মোহাম্মদ উল্লাহ ও জনাব বায়তুল্লাহ যথাক্রমে জাতীয় সংসদের স্পিকার ও ডেপুটি স্পিকার নির্বাচিত হন।

মুজিব শাসনামলে সরকারি এবং বিরোধী দল ও জোটগুলোর ভূমিকা (The Role of Government and Opposition Parties and Alliances During the Mujib Regime)ঃ

মুক্ত স্বাধীন বাংলাদেশে আওয়ামী লীগ স্বাভাবিকভাবেই ক্ষমতায় আসীন হয়। এ সরকারের বৈধতাকে চ্যালেঞ্জ করার মত বা তার বিরোধিতা করার মত কোনো রাজনৈতিক শক্তি তখন বাংলাদেশে ছিল না। বস্তুত ন্যাপ (মোঃ), ন্যাপ (ভাঃ) ও বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি (মনি সিং)সহ সকল দল, গোষ্ঠী ও রাজনৈতিক নেতাই শেখ মুজিবুর রহমানকে বৈধ রাষ্ট্রনায়ক হিসেবে গ্রহণ করেন। কিন্তু মুজিব ক্ষমতাসীন হওয়ার তিন মাসের মধ্যেই তার সরকারের বিরুদ্ধে (ন্যাপ ভাঃ) ও অন্যান্য কয়েকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বামপন্থী গোষ্ঠী প্রচারণা শুরু করে। অবশ্য, বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে বিরোধিতা করার অভিযোগে দক্ষিণপন্থী দল, যথাঃ মুসলিম লীগ, জামায়াতে ইসলাম, নেজামে ইসলাম, পিডিপি ইত্যাদি দল সরকার কর্তৃক নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়েছিল। ফলে তারা প্রকাশ্যভাবে সরকারের সমালোচনায় অবতীর্ণ হতে পারেননি। অন্যান্য কয়েকটি দল সরকারের বিরোধিতা করে। নিচে মুজিব শাসনামলে সরকারি এবং বিভিন্ন বিরোধী দল ও জোটের ভূমিকা বর্ণনা করা হলো।

Dhaka University Institutional Repository

ক) জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ)ঃ ক্ষমতাসীন হওয়ার পর আওয়ামী লীগের নেতাগণের ব্যাপক দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি ও প্রিয়তোষণের কারণে বিশেষত তরুণ সমাজের মধ্যে আওয়ামী লীগের জনপ্রিয়তা দ্রুত হ্রাস পেতে থাকে। তাছাড়া দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি, নিত্যব্যবহার্য দ্রব্যাদির অভাব, সরকার কর্তৃক ভারত-তোষণ নীতি গ্রহণের অভিযোগ সম্পর্কে প্রচারণা ইত্যাদি কারণেও আওয়ামী লীগ সরকারের বিরুদ্ধে জনগণের মনে অসন্তোষের সঞ্চার হতে থাকে। স্বাধীনতা সংগ্রামের বিরোধিতা ও পাকবাহিনীর সাথে সহযোগিতার অভিযোগেও লীগ কর্তৃক প্রায় ৪০,০০০ ব্যক্তিকে আটক করা হয়। ফলে এ সকল পরিবারের বিপুলসংখ্যক সদস্যগণ স্বভাবত আওয়ামী লীগের ওপর বিক্ষুব্ধ ছিল।

বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পূর্বেই আওয়ামী লীগের সমর্থক ছাত্রফ্রন্টের (ছাত্রলীগ) মধ্যে একটি গোষ্ঠী বিদ্যমান ছিল যা সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য বৈপ্লবিক পন্থা অবলম্বনেরর পক্ষপাতি ছিল। ডাকসুর সহসভাপতি সর্বজনাব আ.স.ম. আব্দুর রব এবং শাহজাহান সিরাজের নেতৃত্বাধীন এ গোষ্ঠী ১৯৭২ সালের মে মাসে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সংসদীয় শাসন পদ্ধতি পরিহার করে শেখ মুজিবের নেতৃত্বে একটি বিপ্লবী সরকার গঠনের দাবি উত্থাপন করেন। কিন্তু আওয়ামী লীগের নেতাগণ সংসদীয় শাসনকেই দৃঢ়ভাবে সমর্থন এবং বিপ্লবী সরকার গঠনের ধারণা অগ্রাহ্য করেন। শেখ মুজিব নিজেও সংসদীয় শাসনব্যবস্থার অনুকূলেই মত ব্যক্ত করেন।

অবশেষে সর্বজনাব আ.স.ম. আব্দুর রব ও শাহজাহান সিরাজ ১৯৭২ সালের অক্টোবর মাসের শেষদিকে 'জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল' (জাসদ) নামে একটি নতুন দল গঠনের কথা ঘোষণা করেন। দলের সাত সদস্য বিশিষ্ট একটি আহ্বায়ক কমিটি গঠন করা হয় এবং জনাব রব ও মেজর (অবসরপ্রাপ্ত) জলিলকে যৌথ আহ্বায়ক করা হয়। তবে জনাব সিরাজুল আলম খানই এ নতুন দলের মূল তত্ত্ববিদ ও সংগঠক ছিলেন বলে ধারণা করা হয়।

জাসদের আদর্শ ও লক্ষ্য হিসেবে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র কায়েমের উদ্দেশে 'কৃষক-শ্রমিক রাজ' প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার কথা বলা হয়। এ দল দেশের বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠাকল্পে সামাজিক বিপ্লবের জন্যও সংগ্রাম করবে বলে ঘোষণা করা হয়। সত্যিকারের 'গণতন্ত্র' প্রতিষ্ঠার জন্য সমাজতান্ত্রিক নীতিসমূহ অপরিহার্য পূর্বশর্ত বলে জাসদ মনে করে।

(খ) সাত দলীয় সংগ্রাম কমিটিঃ বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পর প্রথমদিকে মওলানা ভাসানী শেখ মুজিব সরকারের প্রতি সমর্থন জানালেও সে সমর্থন ক্ষণস্থায়ী হয়েছিল। বিভিন্ন কারণে শেখ

Dhaka University Institutional Repository

মুজিব সরকারের জনপ্রিয়তা হ্রাস শুরু হওয়ার সাথে সাথে মওলানা ভাসানীও সরকার বিরোধী ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। ১৯৭২ সালের ডিসেম্বর মাসে মাওলানা ভাসানীকে সভাপতি করে দেশে গণতান্ত্রিক পরিবেশ প্রতিষ্ঠাকল্পে একটি 'সাত দলীয় সংগ্রাম কমিটি' গঠন করা হয়। এ কমিটির শরীক দলগুলো ছিল- ন্যাপ (ভাঃ) জনাব আতাউর রহামন খানের নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ জাতীয় লীগ, জনাব অলি আহাদের নেতৃত্বাধীন বাংলা জাতীয় লীগ, শ্রমিক কৃষক সাম্রাজ্যবাদী দল, বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি (লেনিনবাদী), বাংলার কমিউনিস্ট পার্টি ও বাংলাদেশ স্যোশালিস্ট পার্টি।

সাতদলীয় সংগ্রাম কমিটি জানায়, আওয়ামী লীগ সরকার দেশব্যাপী দুর্ভিক্ষ সৃষ্টি করে বিশ্ববাসীর নিকট সাহায্যের জন্য দৌড়াদৌড়ি করছে কিন্তু দুর্নীতিপরায়ণ সরকারের আবেদনে প্রয়োজনীয় সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না। সরকার দুর্নীতি ও অযোগ্যতাকে ধামাচাপা দেয়ার জন্য গণআন্দোলনকে দমন করার উদ্দেশে জনগণের মৌলিক অধিকার হরণ করে মজলুম জননেতা মওলানা ভাসানী, মশিউর রহমান, নুরুর রহমান, অলি আহাদসহ বিরোধীদলীয় নেতৃবৃন্দকে আটক করে রেখেছে, ১৪৪ ধারা জারি করে মাইক ব্যবহার বন্ধ করেছে, নিউজপ্রিন্ট নিয়ন্ত্রণাদেশ জারি করে জনগণ ও সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ করার অপচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

সরকার-সৃষ্ট দুর্ভিক্ষ মোকাবেলা করে লাখ লাখ লোককে মৃত্যুর কবল থেকে বাঁচতে হলে বিদেশ হতে ব্যাপকভাবে খাদ্য আমদানির ব্যবস্থা করতে হবে এবং পাচার, কালোবাজারি, মজুদদারি বন্ধ করে উৎপাদন বৃদ্ধিকল্পে জনগণকে উৎসাহিত করে সমবন্টনের মাধ্যমে দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে সাতদলীয় সংগ্রাম কমিটি আরও ঘোষণা করে যে, বর্তমানে জাতীয় সংকট একমাত্র সর্বদলীয় জাতীয় সরকারই মোকাবেলা করতে সক্ষম। তাই সর্বদলীয় ঐক্যজোটের এ সভায় দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ ও জাতীয় সকল সংকট মোকাবেলাকল্পে এ মুহূর্তে বর্তমান সরকারের পদত্যাগ এবং সর্বদলীয় সরকার গঠনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করছে বলে ঘোষণা দেয়া হয়।

১৯৭৪ সালে ২৭, ২৮, ২৯ অক্টোবর বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সভায় পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ ফরহাদ কর্তৃক উত্থাপিত এবং বৈঠক কর্তৃক অনুমোদিত রাজনৈতিক সাংগঠনিক রিপোর্টে জোর দিয়ে বলা হয় যে, "দেশে গভীর সংকট বিরাজ করছে। সরকারের কেবল শাসক দল আওয়ামী লীগ ও প্রশাসনযন্ত্রের ওপর নির্ভরশীল থেকে বর্তমানে প্রচলিত বুর্জোয়া গণতন্ত্রের মাধ্যমে সংকট মোকাবিলা করে দেশকে

Dhaka University Institutional Repository

অগ্রগতির পথে অগ্রসর করে দিতে পারছে না।" তাই অনতিবিলম্বে দেশে রাজনৈতিক প্রশাসনিক ব্যবস্থার মৌলিক পরিবর্তন সাধন করা একান্ত জরুরি বলে বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি ঘোষণা করে।

"সাত দলীয় সংগ্রাম কমিটির" রাজনৈতিক বক্তব্য জনগণের মধ্যে খুব বেশি আবেদন সৃষ্টি করতে পারেনি। মওলানা ভাসানীর রুশ-ভারত বিরোধী রাজনৈতিক বক্তব্যই দেশবাসীর মনে দারুণভাবে আবেদন সৃষ্টি করে এবং তা আওয়ামী লীগ বিরোধী মনোভাব গড়ে তুলতে সক্ষম হয়।

(গ) গণঐক্যজোট ঃ ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা যুদ্ধে আওয়ামী লীগ, ন্যাপ (মোঃ) ও বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি (মনি সিং) গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এ সময়ে তিনটি দলের মধ্যে সুসম্পর্ক গড়ে উঠে। স্বাধীনতা লাভের পর ন্যাপ (মোঃ) ও কমিউনিস্ট পার্টি কিছু কিছু বিষয়ে আওয়ামী লীগের সাথে দ্বিমত পোষণ করলেও রাষ্ট্রীয় নীতির মৌলিক বিষয়গুলোর ক্ষেত্রে অভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ করে। সমাজতন্ত্রের প্রশ্নে আরো বলিষ্ঠ ও স্পষ্ট বক্তব্যের দাবি জানালেও ন্যাপ এবং কমিউনিস্ট দল উপদলগুলোর সমালোচনা, জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের উদ্ভব ও দ্রুত জনপ্রিয়তা অর্জন, রুশ-ভারত বিরোধী প্রচারণা প্রভৃতি মোকাবেলা, অরাজকতা সৃষ্টিকারী শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম এবং দেশ থেকে মুনাফাখোরি, মজুদদারি, কালোবাজারি, দুর্নীতি ও সমাজবিরোধী কার্যকলাপ রোধ করার জন্য এ দল তিনটি একযোগে কাজ করে যাওয়ার সংকল্প গ্রহণ করে। এ পটভূমিতেই ১৯৭৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে আওয়ামী লীগ, ন্যাপ মোঃ ও বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি (মনি সিং) 'ত্রি দলীয় ঐক্যজোট' গঠন করে। গণঐক্যজোট কমিটির ১৯ জন সদস্যের মধ্যে ছিল ১১ জন আওয়ামী লীগ, ৫ জন ন্যাপ ও ৩জন কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য। তবে যেসব লক্ষ্য কে সামনে রেখে এ ঐক্যজোট গঠিত হয় ত্রিদলীয় জোট তা পূরণ করতে আশানুরূপ সফলতা লাভে ব্যর্থ হয়।

(ঘ) জাতীয় গণমুক্তি ইউনিয়ন (জাগমুই)ঃ স্বাধীনতা লাভের পর চীনাপন্থী বামপন্থী সংগঠনগুলো মুজিব সরকার বিরোধী এবং রুশ-ভারত বিরোধী বক্তব্যকে সামনে রেখে একটি অভিন্ন রাজনৈতিক সংগঠন গড়ে তোলার লক্ষ্যে ১৯৭৩ সালের ৩ ডিসেম্বর ঢাকায় একটি সম্মেলন অনুষ্ঠান করে। এ সম্মেলনেই জন্মগ্রহণ করে 'জাতীয় গণমুক্তি ইউনিয়ন' বা 'জাগমুই' নামক একটি নতুন বামপন্থী রাজনৈতিক সংগঠন। প্রবীণ বামপন্থী নেতা হাজী মোহাম্মদ দানেশ

Dhaka University Institutional Repository

এবং শ্রমিক নেতা সিরাজুল হোসেন খান যথাক্রমে 'জাগমুই-এর সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। 'জাগমুই-এর অধিকাংশ নেতাকর্মি ছিলেন ন্যাপ (ভাসানী)-এর নেতাকর্মি।

(ঙ) ইউনাইটেড পিপলস পার্টি (ইউ.পি.পি.) ঃ 'জাগমুই' নেতৃত্ব সকল বামপন্থী দল উপদলকে একত্রিত করতে পারেনি। তাদের নেতৃত্ব ও কার্যক্রমে সকল বামপন্থী দল উপদলগুলো একীভূত হওয়ার প্রয়াস চালায়। এ প্রচেষ্টার ফলেই ন্যাপ (সুধারামী), বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি (লেনিনবাদী) এবং ক্যাপ্টেন (অব.) আব্দুল হালিম চৌধুরীর নেতৃত্বাধীন ন্যাপের (মোঃ) একটি ক্ষুদ্র অংশ ১৯৭৪ সালের ১৭ নভেম্বর 'ইউনাইটেড পিপলস পার্টি' (ইউ.পি.পি.) নামে ১টি নতুন বামপন্থী রাজনৈতিক দল গঠন করে। এ মূল নেতা ছিলেন প্রখ্যাত শ্রমিক নেতা কাজী জাফর আহমদ। রুশ-ভারত বিরোধিতা ও বঙ্গবন্ধু মুজিব সরকারের বিরোধিতাই ছিল ইউ.পি.পি'র অন্যতম মূল রাজনৈতিক লক্ষ্য।

বাংলাদেশ সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনী, ১৯৭৫ (The Fourth Amendment of Bangladesh Constitution, 1975) ঃ

বাংলাদেশের শাসনতান্ত্রিক ইতিহাসে সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনী এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ের সূচনা করে। ১৯৭৫ সালের ২৫ জানুয়ারি বাংলাদেশের জাতীয় সংসদে বাংলাদেশের সংবিধান সংক্রান্ত যে সংশোধনী প্রস্তাবটি পাস হয়, তাই 'চতুর্থ সংশোধনী' নামে পরিচিত। এ সংশোধনীতে ৩৫টি ধারা ও বহু উপধারা ছিল। প্রস্তাবটি পাস হয়েছিল জাতীয় সংসদ সদস্যদের ২৯৪টি ভোটের মাধ্যমে। এ সংশোধনীতে মূল সংবিধানের আমুল পরিবর্তন সাধিত হয়। প্রস্তাবের বিপক্ষে কোন ভোট পড়েনি। অবশ্য এ প্রস্তাবকে কেন্দ্র করে বিরোধী দলের মুষ্টিমেয় যে কয়েকজন সদস্য ছিলেন তারা প্রতিবাদ করেন এবং ভোট গ্রহণকালে সংসদ কক্ষ ত্যাগ করেন। কিন্তু তাতে কোন ফল হয়নি। বিলটি যথারীতি পাস হয়ে যায়। রাষ্ট্রপতি এ সংশোধন আইনকে 'দ্বিতীয় বিপ্লব' নামে অভিহিত করেন।

চতুর্থ সংশোধনীর বৈশিষ্ট্য (Features of the Fourth Amendment)ঃ

বাংলাদেশ সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনীর প্রধান প্রধান ধারা বা বৈশিষ্ট্যসমূহ নিম্নরূপঃ

১। রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার ব্যবস্থার প্রবর্তন ঃ বাংলাদেশ সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনীর সর্বপ্রথম ও প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, এ সংশোধনীর মাধ্যমে বাংলাদেশে রাষ্ট্রপতি শাসিত

Dhaka University Institutional Repository

শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়। এতে দেশের প্রকৃত শাসন ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির হাতে ন্যস্ত করা হয়। তিনি শুধু রাষ্ট্রপ্রধানই নন, সরকার প্রধানও বটে। তিনি সরকার ও রাষ্ট্রের কর্ণধার। তিনি নামসর্বস্ব রাষ্ট্রপ্রধান নন বরং প্রকৃত ক্ষমতাসম্পন্ন রাষ্ট্রপ্রধান।

২। **জবাবদিহিতাহীন ও আজ্ঞাবহ মন্ত্রিপরিষদ ঃ** চতুর্থ সংশোধনী আইনে মন্ত্রিপরিষদের রাষ্ট্রপতির আজ্ঞাবহ করা হয়। রাষ্ট্রপতি যেকোন ব্যক্তিকে মন্ত্রী হিসেবে নিয়োগ করতে ও বরখাস্ত করতে পারবেন বলে উল্লেখ করা হয়। সংশোধনী আইনে বিধান করা হয় যে, রাষ্ট্রপতি সংসদের মধ্য হতে অথবা সংসদ বহির্ভূত কোন ব্যক্তিকে মন্ত্রী হিসেবে নিয়োগ করতে পারবেন। এতে সংসদের নিকট মন্ত্রীদের জবাবদিহিতা থাকে না। মন্ত্রীগণ রাষ্ট্রপতির নিকট তাদের কাজের জন্য জবাবদিহি হয়ে পড়েন।

৩। **ক্ষমতাহীন আইন পরিষদ ঃ** সংশোধনী আইনে রাষ্ট্রপতির হাতে চূড়ান্ত ক্ষমতার সমাবেশ ঘটানো হয়। সংসদ নির্বাহী বিভাগের ওপর হতে নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা হারায়। তাছাড়া একদলীয় ব্যবস্থার ফলে জাতীয় সংসদ দুর্বল সংস্থায় পরিণত হয়।

৪। **উপরাষ্ট্রপতির পদ সৃষ্টি ঃ** সংশোধনী আইনে রাষ্ট্রপতিকে সহায়তা করার জন্য একজন উপরাষ্ট্রপতির পদ সৃষ্টি করা হয়। রাষ্ট্রপতির ইচ্ছা ও পরামর্শ অনুযায়ী তিনি কার্য পরিচালনা করেন।

৫। **মৌলিক অধিকার বলবৎকরণ বাতিল ঃ** মূল সংবিধানের ৪৪ ধারায় উল্লেখ ছিল যে, জনসাধারণ মৌলিক অধিকার সংরক্ষণের জন্য সুপ্রিমকোর্টের নিকট মামলা রুজু করতে পারবেন। কিন্তু চতুর্থ সংশোধনীর ৩ নং ধারা অনুযায়ী সেই অধিকার বাতিল করা হয় এবং সুপ্রিমকোর্টের রিট জারি করার ক্ষমতা হরণ করা হয়।

৬। **বিচার বিভাগের স্বাধীনতা খর্ব ঃ** সংবিধানের যে সমস্ত ধারায় বিচারকের নিয়োগ, অপসারণ ও স্বাধীনতা সংক্রান্ত বিধান ছিল, যেমন ঃ ৯৬, ৯৭, ১০২, ১১৫ ও ১১৬ ধারার ব্যাপক রদবদল করে আদালতের ক্ষমতা ও বিচারকদের স্বাধীনতা খর্ব করা হয়। সংশোধনী আইন অনুসারে অভিশংসন (Impeachment) ছাড়াই সুপ্রিমকোর্টের বিচারপতিদের অপসারণ করার ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির হাতে দেয়া হয়। তাছাড়া রাষ্ট্রপতি প্রধান বিচারপতির সাথে পরামর্শ না করে অন্যান্য বিচারপতি নিয়োগের ক্ষমতা লাভ করেন। ফলে বিচার বিভাগের সাথে পরামর্শ না করে

Dhaka University Institutional Repository

অন্যান্য বিচারপতি নিয়োগের ক্ষমতা লাভ করেন। ফলে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা প্রহসনে পরিণত হয়।

৭। **একদলীয় ব্যবস্থা** ঃ সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনী অনুযায়ী বাংলাদেশে একটি জাতীয় দল গঠনের ব্যবস্থা করা হয়। সংশোধনীতে উল্লেখ করা হয় যে, রাষ্ট্রপতি রাষ্ট্রীয় মূলনীতি কার্যকর করার জন্য একটিমাত্র রাজনৈতিক দল গঠন করতে পারবেন। দলটি হবে জাতীয় দল। জাতীয় দল গঠিত হলে অন্যান্য দলগুলো বাতিল বলে গণ্য হবে। সংশোধনীতে জাতীয় দলের সংগঠন, নামকরণ ও নিয়ম-শৃঙ্খলা স্থির করার কর্তৃত্ব রাষ্ট্রপতির ওপর ন্যস্ত করা হয়। এ সংশোধনী অনুযায়ী পরে 'বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ' সংক্ষেপে 'বাকশাল' নামে একটিমাত্র দল গঠন করা হয়।

৮। **রাষ্ট্রপতি ও সংসদের আয়ু বর্ধন** ঃ সংশোধনী মোতাবেক রাষ্ট্রপতিকে জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হওয়ার বিধান দেয়া হয়। তবে ১৯৭৫ সালের ২৫ জানুয়ারি হতে বিনা নির্বাচনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে পরবর্তী পাঁচ বছরের জন্য রাষ্ট্রপতি নিযুক্ত করা হয়। সে সাথে জাতীয় সংসদের মেয়াদও একই সময়কাল পর্যন্ত বর্ধিত করা হয়।

৯। **জাতীয় সংসদ সদস্যদের জাতীয় দলের সদস্যপদ গ্রহণ** ঃ চতুর্থ সংশোধনীতে বলা হয় যে, জাতীয় দল গঠিত হবার পর রাষ্ট্রপতি প্রদত্ত নির্ধারিত সময়ের মধ্যে জাতীয় সংসদ সদস্যদেরকে জাতীয় দলের সদস্য হতে হবে। অন্যথায় তাদের সদস্যপদ বাতিল হয়ে যাবে এবং তারা ভবিষ্যতে বা জাতীয় সংসদ সদস্য নির্বাচিত হবার যোগ্য হবেন না।

১০। **স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা** ঃ চতুর্থ সংশোধনীর মাধ্যমে স্থানীয় সরকারের গঠন ব্যবস্থা রাষ্ট্রপতির ওপর ছেড়ে দেয়া হয়। এক্ষেত্রে বাংলাদেশে জেলার সংখ্যা বৃদ্ধি করে ৬০ জন 'জেলা গভর্নর' নিয়োগের ব্যবস্থা করা হয়।

১১। **রাষ্ট্রপতির অপসারণ** ঃ চতুর্থ শ্রেণীর পূর্বে রাষ্ট্রপতিকে অপসারণ করতে হলে সংবিধান লঙ্ঘন গুরুতর অসদাচরণ, শারীরিক ও মানসিক অসামর্থ্য ইত্যাদি কারণে দু'তৃতীয়াংশ সংসদ সদস্যদের সম্মতিতে অপসারণ করা যেত, কিন্তু চতুর্থ সংশোধনীর পর রাষ্ট্রপতিকে অপসারণ করতে হলে শতকরা ভাগ সমর্থনের প্রয়োজন হয়।

Dhaka University Institutional Repository

১২। সরকারি কর্মচারীদের রাজনীতি করার সুযোগ ঃ চতুর্থ সংশোধনীর দ্বারা সরকারি চাকরিজীবীদের রাজনীতি করার সুযোগ দেয়া হয়। রাষ্ট্রপতি কর্তৃক জাতীয় রাজনৈতিক দলে সরকারি কর্মচারীগণ যোগদান করতে পারতেন।

১৩। নির্বাচন কমিশন ও কর্ম কমিশনের ক্ষমতা সংকোচন ঃ চতুর্থ সংশোধনী দ্বারা সংবিধানের ৯৬ নং অনুচ্ছেদ সংশোধনের ফলে নির্বাচন ও সরকারি কর্ম কমিশনের ক্ষমতা ও স্বাধীনতা ক্ষুণ্ন হয়। কেননা এ দুটি কমিশনের সদস্যবৃন্দকেও সুপ্রিমকোর্টের বিচারপতিদের ন্যায় একই পদ্ধতি অপসারণের বিধান প্রণীত হয়।

সবশেষে বলা যায়, বাংলাদেশ সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনী এদেশের শাসনতান্ত্রিক অগ্রগতির ইতিহাসে এক যুগান্তকারী ঘটনা। এ সংশোধনী গৃহীত হবার ফলে বাংলাদেশের সামগ্রিক রাজনৈতিক ব্যবস্থাই পরিবর্তিত হয়ে যায়। শুধু তাই নয়, চতুর্থ সংশোধনী গৃহীত হবার ফলে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিক কাঠামোতেও আমুল পরিবর্তন সূচিত হয়। চতুর্থ সংশোধনী আনীত হয়েছিল এক জাতীয় সংকটময় মুহূর্তে। কিন্তু এ সঙ্কটের সমাধান না হওয়ায় চতুর্থ সংশোধনীও জনগণের মনে কোন আবেদন সৃষ্টি করতে পারেনি।

বাকশালের সংগঠন (Organization of BKSAL): বাকশালের গঠনতন্ত্রের চতুর্থ ধারায় এর সংগঠন সম্পর্কে বর্ণনা দেয়া হয়েছে। এতে বলা হয়েছে, নিম্নলিখিত সংগঠনিক কমিটি বা সংস্থাগুলোর সমন্বয়ে বাকশাল (জাতীয় দল) গঠিত হবে।

ক) জাতীয় দলের কার্য নির্বাহী কমিটি।

খ) জাতীয় দলের কেন্দ্রীয় কমিটি।

গ) দলীয় কাউন্সিল ।

ঘ) জেলা কমিটি।

ঙ) জেলা কাউন্সিল।

চ) থানা / আঞ্চলিক কমিটি এবং

ছ) ইউনিয়ন / প্রাথমিক কমিটি।

Dhaka University Institutional Repository

১২। সরকারি কর্মচারীদের রাজনীতি করার সুযোগ ঃ চতুর্থ সংশোধনীর দ্বারা সরকারি চাকরিজীবীদের রাজনীতি করার সুযোগ দেয়া হয়। রাষ্ট্রপতি কর্তৃক জাতীয় রাজনৈতিক দলে সরকারি কর্মচারীগণ যোগদান করতে পারতেন।

১৩। নির্বাচন কমিশন ও কর্ম কমিশনের ক্ষমতা সংকোচন ঃ চতুর্থ সংশোধনী দ্বারা সংবিধানের ৯৬ নং অনুচ্ছেদ সংশোধনের ফলে নির্বাচন ও সরকারি কর্ম কমিশনের ক্ষমতা ও স্বাধীনতা ক্ষুণ্ন হয়। কেননা এ দুটি কমিশনের সদস্যবৃন্দকেও সুপ্রিমকোর্টের বিচারপতিদের ন্যায় একই পদ্ধতি অপসারণের বিধান প্রণীত হয়।

সবশেষে বলা যায়, বাংলাদেশ সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনী এদেশের শাসনতান্ত্রিক অগ্রগতির ইতিহাসে এক যুগান্তকারী ঘটনা। এ সংশোধনী গৃহীত হবার ফলে বাংলাদেশের সামগ্রিক রাজনৈতিক ব্যবস্থাই পরিবর্তিত হয়ে যায়। শুধু তাই নয়, চতুর্থ সংশোধনী গৃহীত হবার ফলে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিক কাঠামোতেও আমুল পরিবর্তন সূচিত হয়। চতুর্থ সংশোধনী আনীত হয়েছিল এক জাতীয় সংকটময় মুহূর্তে। কিন্তু এ সঙ্কটের সমাধান না হওয়ায় চতুর্থ সংশোধনীও জনগণের মনে কোন আবেদন সৃষ্টি করতে পারেনি।

বাকশালের সংগঠন (Organization of BKSAL): বাকশালের গঠনতন্ত্রের চতুর্থ ধারায় এর সংগঠন সম্পর্কে বর্ণনা দেয়া হয়েছে। এতে বলা হয়েছে, নিম্নলিখিত সংগঠনিক কমিটি বা সংস্থাগুলোর সমন্বয়ে বাকশাল (জাতীয় দল) গঠিত হবে।

ক) জাতীয় দলের কার্য নির্বাহী কমিটি।

খ) জাতীয় দলের কেন্দ্রীয় কমিটি।

গ) দলীয় কাউন্সিল ।

ঘ) জেলা কমিটি।

ঙ) জেলা কাউন্সিল।

চ) থানা / আঞ্চলিক কমিটি এবং

ছ) ইউনিয়ন / প্রাথমিক কমিটি।

Dhaka University Institutional Repository

দলের শক্তি, সংহতি, ঐক্য ও সুষ্ঠু, বিকাশ এবং সচেতন নিয়মানুবর্তিতা অব্যাহত রাখার ও নিশ্চিত করার জন্য সাংগঠনিক কার্যধারায় গণতান্ত্রিক প্রণালী অবলম্বন করা হবে। যেমন ঃ

ক) দলের নিম্নতম স্তর থেকে উচ্চতম স্তর পর্যন্ত প্রতিটি কমিটি নির্বাচনের মাধ্যমে গঠিত হবে।

খ) কমিটিগুলোর সব সিদ্ধান্ত সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের মতানুসারেই গৃহীত হবে এবং তা সব সদস্যদেরই অবশ্য পালনীয় বলে বিবেচিত হবে।

গ) নিম্নতম কমিটিগুলো উচ্চতর কমিটিগুলোর কাছে নিয়মিত রিপোর্ট প্রদান করবে এবং তাদের পরামর্শ গ্রহণ ও নির্দেশ পালন করবে।

ঘ) উচ্চতর কমিটিগুলো নিম্নতম কমিটিগুলোর এবং সাধারণ সদস্যদের মতামত ও আলোচনার ওপর গুরুত্ব আরোপ করবে।

ঙ। দলীয় সিদ্ধান্তসমূহ সাধারণত আলাপ আলোচনার মাধ্যমেই গৃহীত হবে। অন্যথায় সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটে সংশিষ্ট বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়া হবে।

চ) সব সিদ্ধান্তকে অবশ্যই দলের উদ্দেশ্য ও কর্মসূচির সঙ্গে হতে হবে।

ছ) সর্বোপরি, নিয়মিত প্রশিক্ষণদানের মাধ্যমে আদর্শ, সচেতন ও একনিষ্ঠ কর্মী গড়ে তুলতে হবে।

বাকশালের গঠনতন্ত্রের ষষ্ঠ ধারায় বর্ণিত আছে যে, ১৮ বছর বা তদূর্ধ্ব বয়স্ক বাংলাদেশের যেকোনো নাগরিক এ জাতীয় দলের লক্ষ্য উদ্দেশ্য ও কর্মসূচি মেনে চলবে বলে নির্ধারিত ফরমে লিখিত ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষরদান করে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হলে, দলের যেকোনো নির্দেশ পালনে বাধ্য থাকলে, দলের যেকোনো সংগঠনে কাজ করতে প্রস্তুত থাকলে, নিয়মিত দলের নির্দিষ্ট চাঁদা পরিশোধ করতে সম্মত হলে এবং দলের সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নের দায়িত্বভার গ্রহণে ইচ্ছুক থাকলে, তিনি দলের সদস্যপদ লাভ করার যোগ্য হবেন। তবে শর্ত থাকে, কোনো নাগরিক সদস্যপদের অধিকারী হবেন না বা থাকবে না যদিঃ-

Dhaka University Institutional Repository

ক) তিনি কোনো বিদেশি রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব গ্রহণ করেন কিংবা বিদেশি রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য ঘোষণা বা স্বীকার করেন।

খ) তিনি দুর্নীতি বা নৈতিক স্খলনজনিত ফৌজদারি অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হয়ে দণ্ডিত হন এবং তাঁর মুক্তি লাভের পর ৫ বছর কাল অতিবাহিত না হয়ে থাকে।

গ) তিনি গত ১৯৭২ সালের বাংলাদেশ যোগসাজসকারী (বিশেষ ট্রাইব্যুনাল) আদেশের অধীনে যেকোনো অপরাধের জন্য দণ্ডিত হয়ে থাকেন। এবং তিনি ওইরূপ কোনো অপরাধের জন্য বিচারাধীন থাকা অবস্থায় বিচারের নিষ্পত্তি না হয়ে থাকে কিংবা তাঁর বিরুদ্ধে উপরোক্ত ধরনের কোনো অপরাধ সম্পর্কিত অভিযোগ কোনো সরকারি কর্তৃপক্ষের নিকট রুজু হয়ে থাকে।

ঘ) তিনি রাষ্ট্রের আদর্শ বিরোধী, সমাজবিরোধী, জননিরাপত্তা বিরোধী ও হিংসাত্মক কার্যকলাপে লিপ্ত রয়েছেন প্রতীয়মান হয়।

তাছাড়া দলের সদস্য পদ প্রার্থীদের দলের প্রাথমিক বা শাখা কমিটির নিকট দরখাস্ত করতে হয়ে এবং বার্ষিক চাঁদা বাবদ দু'টাকা দরখাস্তের সঙ্গে প্রদান করতে হবে। দলের চেয়ারম্যান বিশেষ বিবেচনায় যেকোনো প্রার্থীকে সরাসরি পূর্ণ সদস্যপদ দিতে পারবেন।

গঠনতন্ত্রের অষ্টম ধারায় দলীয় সদস্যদের কর্তব্য বর্ণিত হয়েছে। একজন দলীয় সদস্য দলের নীতি, সিদ্ধান্ত ও নির্দেশ কার্যকর করবেন। ব্যক্তি স্বার্থের উর্ধ্বে থেকে তিনি জনগণ ও দলের স্বার্থের অনুকূলে কাজ করবেন। তিনি দলের অভ্যন্তরীণ ঐক্য ও সংহতি শক্তিশালী ও সুদৃঢ় করতে সদা তৎপর থাকবেন, রাজনৈতিক ও সমাজতন্ত্র সম্পর্কিত জ্ঞান ও সচেতনতার মনোনয়নে সদা সচেষ্ট থাকবেন। তিনি গঠনমূলক আলোচনা ও আত্মসমালোচনার মাধ্যমে ঐক্যবদ্ধভাবে কর্ম পরিচালনা পদ্ধতির উৎকর্ষ সাধনে করবেন। এসব কর্তব্যের পাশাপাশি আবার একজন সদস্যের কতগুলো অধিকার থাকবে, যথা ঃ-

ক) তিনি দলীয় সংগঠনের নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে ও নির্বাচিত হতে পারবেন।

খ) দলের সভায় যেকোনো সংগঠন বা সংস্থা এবং সদস্য ও নেতৃস্থানীয় কর্মিদের কার্যকলাপ সম্পর্কে তিনি আলোচনা করতে পারবেন।

Dhaka University Institutional Repository

গ) তিনি দলের কর্মনীতি ও সিদ্ধান্ত ও সিদ্ধান্ত সম্পর্কিত আলোচনায় স্বাধীনভাবে অংশগ্রহণ করতে পারবেন।

ঘ) দলের সম্মেলনে এবং দলের যেকোনো উর্ধ্বতন সংগঠনের নিকট তিনি তাঁর বিবৃতি, নিবন্ধ, প্রস্তাব ও আবেদন পেশ করতে পারবেন।

ঙ) কোনো সদস্যের দল থেকে পদত্যাগ করার অধিকার থাকবে। তবে এক্ষেত্রে দলের কার্যনির্বাহী কমিটির অনুমোদন প্রয়োজন হবে।

বাকশালের গঠনতন্ত্রের দশ ধারায় দলের কার্যনির্বাহী কমিটির বর্ণনা রয়েছে। এতে বলা হয়েছে, দলের সর্বোচ্চ নির্বাহী ক্ষমতা কার্যনির্বাহী কমিটির ওপর ন্যস্ত থাকবে। এ কমিটির সদস্য সংখ্যা চেয়ারম্যান ও সেক্রেটারি জেনারেলসহ কমপক্ষে ১৫ জন হবে। কমিটির সব সদস্য কেন্দ্রীয় কমিটি থেকে চেয়ারম্যান কর্তৃক মনোনীত হবেন। বাকশালের সংসদীয় দল এ কার্যনির্বাহী কমিটির কাছে দায়ী থাকবে।

গঠনতন্ত্রের একাদশ ধারায় বলা হয়েছে, কাউন্সিলের দুটো অধিবেশনের অন্তর্বর্তীকালীন দলের কেন্দ্রীয় কমিটি হবে দলের প্রধান সংস্থা। দলের কাউন্সিলে যেসব সাধারণ নীতিমালা গৃহীত হবে তার প্রয়োগ ও বাস্তবায়ন করা কেন্দ্রীয় কমিটির প্রধান কাজ। কাউন্সিলের দু অধিবেশনের অন্তর্বর্তীকালীন রাজনৈতিক নেতৃত্ব দান এবং দলের নীতি ও গঠনতন্ত্র সংরক্ষণ করাও কেন্দ্রীয় কমিটির দায়িত্ব। এটা যাবতীয় কাজের জন্য একদিকে দলের চেয়ারম্যানের নিকট এবং অপরদিকে দলের কাউন্সিলের নিকট দায়ী থাকবে। তাছাড়া সরকারি, আধা-সরকারি সব প্রতিষ্ঠানের ক্রিয়া কলাপ সম্পর্কেই কেন্দ্রীয় কমিটি তদারকি করবে। বৎসরে অন্তত ঃ দুবার কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হবে এবং উক্ত সভায় কার্যনির্বাহী কমিটির কাজের রিপোর্ট এবং আয়-ব্যয়ের হিসেব উপস্থাপিত করতে হবে।

দলীয় কাউন্সিলের গঠন, দায়িত্ব ও অধিকার সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। বাকশালের গঠনতন্ত্রের ১২ নং ধারায়। দলীয় কাউন্সিল কার্যনির্বাহী কমিটির সকল সদস্য, কেন্দ্রীয় কমিটির সকল সদস্য, কার্যনির্বাহী কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত কোটা অনুসারে জেলা কমিটির প্রতিনিধিবৃন্দ, অঙ্গসংগঠনগুলোর প্রতিনিধিবৃন্দ এবং চেয়ারম্যান কর্তৃক মনোনীত অনূর্ধ্ব ৫০ জন দলীয় পূর্ণ সদস্যের সমবায়ে গঠিত হবে। কাউন্সিলের সদস্যগণ কাউন্সিলর বলে অভিহিত হবেন। এবং

Dhaka University Institutional Repository

তারা ৫ বছরের জন্য বহাল থাকবেন। দলের মূলনীতি, কার্যক্রম, কর্মপন্থা ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে আলোচনা ও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা দলীয় কাউন্সিলের ওপর ন্যস্ত থাকবে। এটা কার্যনির্বাহী কমিটি কর্তৃক উপস্থাপিত রাজনৈতিক, সাংগঠনিক এবং অন্যান্য রিপোর্ট, প্রস্তাব প্রভৃতির ওপর আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে। কার্যনির্বাহী কমিটি এর কার্যাবলীর একটি রিপোর্ট কাউন্সিল অধিবেশনে উপস্থাপন করবে।

গঠনতন্ত্রের ১৩ নং ধারায় বাকশালের জেলা কমিটির গঠন ও কার্যাবলীর বর্ণনা দেয়া হয়েছে। একজন সম্পাদক, প্রয়োজনবোধ অনূর্ধ্ব ৫ জন যুগ্ম সম্পাদক এবং কার্যনির্বাহী কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত সংখ্যক সদস্য সমবায়ে জেলা কমিটি গঠিত হবে। সম্পাদক জেলা কমিটির প্রধান হিসেবে কাজ করবেন। জেলা কমিটি কার্যনির্বাহী কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত সময়সূচি অনুযায়ী কার্যনির্বাহীর কাজের অগ্রগতির রিপোর্ট পেশ করবে।

তারপর হচ্ছে জেলা কাউন্সিল। জেলা কাউন্সিল জেলায় দলের সর্বোচ্চ সংস্থা (১৪ নং ধারা)। জেলা কমিটি প্রতি ৫ বছর অন্তর জেলা কাউন্সিল অধিবেশনের ব্যবস্থা করবে। এ কাউন্সিলের প্রতিনিধিত্ব ও অন্যান্য বিষয়ের নিয়মাবলী কার্যনির্বাহী কমিটি দ্বারা স্থিরিকৃত হবে। দলীয় সদস্য সংখ্যার অনুপাতে জেলা কাউন্সিলের সদস্য সংখ্যা কার্যনির্বাহী কমিটি নির্ধারণ করবে। জেলা কমিটির রাজনৈতিক ও সংগঠনের রিপোর্ট আলোচনা ও সে সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা জেলা কাউন্সিলের বিশেষ দায়িত্ব ও কর্তব্য।

বাকশালের থানা বা আঞ্চলিক কমিটি থানায় দলের সর্বোচ্চ সংস্থা (১৫ নং ধারা) প্রতিমাসে অন্যূন একবার থানা কমিটির বৈঠক বসবে। এ কমিটি জেলা কাউন্সিলের প্রতিনিধি নির্বাচন করবে। এর সদস্য সংখ্যা কার্যনির্বাহী কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত হবে। একজন সম্পাদক অনূর্ধ্ব তিনজন যুগ্মসম্পাদক এবং কার্যনির্বাহী কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত সংখ্যক সদস্য নিয়ে থানা কমিটি গঠিত হবে। দেশের কলকারখানা, শিল্প সংস্থা, কৃষি প্রতিষ্ঠান, ও খামার, সমবায় সমিতি, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান এবং শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানভুক্ত দলীয় সকল সদস্য নিয়ে সমবেতভাবে বা পৃথকভাবেও প্রাথমিক কমিটি গঠিত হতে পারে। চেয়ারম্যানের অনুমোদনসাপেক্ষে বিভিন্ন সরকারি ও আধা সরকারি দফতর বা প্রতিষ্ঠান, কর্পোরেশন, স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা এবং সামরিক ও বেসামরিক বাহিনীসমূহের দলের প্রাথমিক কমিটি গঠিত হতে পারে। কার্যনির্বাহী কমিটি এসব প্রাথমিক কমিটির সর্বোচ্চ সদস্য সংখ্যা নির্ধারণ করে দেবে। প্রাথমিক কমিটির দায়িত্ব

Dhaka University Institutional Repository

হবে এলাকার জনগণের সার্বিক মঙ্গল ও কল্যাণ সাধনে সদা তৎপর থাকা, এলাকার রাজনৈতিক কার্যকলাপ সংগঠিত করা, দলের গণভিত্তি সুদৃঢ় করা এবং দলের নীতিমালা কার্যকর করা। কমিটি শাখার সদস্যদের মধ্যে কাজ বন্টন করবে। এবং কাজের তদারক করা হবে।

উল্লেখ্য, জরুরি ও গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় কোনো সমস্য আলোচনাকল্পে কোনো সময় দলের চেয়ারম্যান দলের বিশেষ সম্মেলন আহ্বান করতে পারবেন। প্রয়োজনবোধে দলের সর্বতোমুখী কার্যধারা সুনিয়ন্ত্রিত করার জন্য বাকশালের এ গঠনতন্ত্রের কাঠামোর মধ্যে কার্যনির্বাহী কমিটি প্রয়োজনীয় নিয়মাবলী ও বিধি বিধান প্রণয়ন করতে পারবে।

বাকশালের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য (Aims and objectives of BKSAL) ঃ

বাকশালের গঠনতন্ত্রের ১ম ধারায় এক লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। নিম্নে উক্ত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহ উল্লেখ করা হলো ঃ

১। বাংলাদেশ সংবিধানের দ্বিতীয় ভাগে বর্ণিত জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা ও গণতন্ত্র এ চারটি মৌলনীতি বাস্তবায়ন করা।

২। বাঙালি জাতির ঐক্য ও সংহতি বিধান নিশ্চিত করা।

৩। নর-নারী ও ধর্ম-বর্ণ সম্প্রদায় নির্বিশেষে মৌলিক মানবাধিকার ও স্বাধীনতার নিশ্চয়তা বিধান করা।

৪। মানবসত্তার মর্যাদা ও মূল্যবোধের স্বীকৃতি দান করা।

৫। মানুষের স্বাভাবিক জীবন বিকাশের পুরিপূর্ণ সুযোগ সৃষ্টি করা।

৬। ধর্মীয় স্বাধীনতা নিশ্চিত করা এবং সর্বপ্রকার সাম্প্রদায়িকতার বিলাপ সাধন করা।

৭। কৃষক ও শ্রমিকসহ মেহনতি ও অনগ্রসর জনগণের ওপর শোষণ অবসানের জন্য পূর্ণ অর্থনৈতিক মুক্তি ও সামাজিক স্বাধীনতা এবং ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠান মাধ্যমে শোষণমুক্ত ও সুষম সাম্যভিত্তিক এক সমাজ প্রতিষ্ঠা করা।

Dhaka University Institutional Repository

৮। সর্বাঙ্গীণ গ্রামীণ উন্নয়ন ও কৃষি ব্যবস্থার আমুল সংস্কার ও পর্যায়ক্রমিক যান্ত্রিকীকরণ এবং সমবায় ভিত্তিতে চাষাবাদ পদ্ধতি প্রচলন করা।

৯। কৃষি ও শিল্পের প্রসার, উৎপাদন বৃদ্ধি, উৎপাদন ও বন্টন নিয়ন্ত্রণে কৃষক শ্রমিকের অংশগ্রহণের সুযোগ প্রদান করা।

১০। মানুষের সাধারণ জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন, বেকারত্ব দূরীকরণ ও অধিকতর কর্মসংস্থান, বিপবোত্তর সমাজের প্রয়োজনের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ গণমুখী সার্বজনীন সুলভ গঠনতান্ত্রিক শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তন।

১১। অন্নবস্ত্র, আশ্রয় ও স্বাস্থ্যরক্ষাসহ মানুষের দৈনন্দিন জীবন ধারণের মৌলিক সমস্যাবলীর সুসমাধান, স্বয়ংসম্পূর্ণ ও স্বয়ংসম্পূর্ণ অর্থনীতির সুদৃঢ় ভিত্তি রচনা করা।

১২। ব্যক্তিগত সম্পত্তির সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারণ করা।

১৩। বিচার ব্যবস্থার কালোপযোগী জনকল্যাণকর পরিবর্তন সাধন এবং গণজীবনের সর্বস্তর থেকে দুর্নীতির মূলোৎপাটন করা।

১৪। বিশ্বভ্রাতৃত্ব ও বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার সকল প্রচেষ্টায় সাহায্য ও সহযোগিতা করা এবং সাম্রাজ্যবাদ উপনিবেশবাদ বা বর্ণ বৈষম্যবাদের বিরুদ্ধে বিশ্বের সর্বত্র নিপীড়িত জনগণের ন্যায়সঙ্গত মুক্তির সংগ্রামকে সমর্থন দান করা।

বাকশালের উপরোক্ত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহ বাস্তবায়নের জন্য প্রাথমিক পর্যায়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নিম্নোক্ত পদক্ষেপসমূহ উল্লেখ করেন।

ক) দেশের প্রচলিত প্রশাসন ব্যবস্থার আমুল পরিবর্তন।

খ) বিচার ব্যবস্থার পরিবর্তন।

গ) বাধ্যতামূলক বহুমুখী গ্রাম সমবায় এবং

ঘ) শোষিত গণতন্ত্রের রূপরেখা ঘোষণা।

Dhaka University Institutional Repository

বাকশালের কর্মসূচি (Programmes of BKSAL) :

বাকশালের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নির্ধারণের পর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর বিভিন্নমুখী কর্মসূচির ওপর আলোকপাত করেন। নিম্নে বাকশালের কর্মসূচি বর্ণনা করা হলো ঃ

১। প্রশাসনিক কর্মসূচি (Administrative programme):

বাংলাদেশে উত্তরাধিকারসূত্রে আমরা ব্রিটিশদের কাছ থেকে আমলতান্ত্রিক প্রশাসন ব্যবস্থা লাভ করেছি। উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত এ প্রশাসন ব্যবস্থায় আমলাতান্ত্রিক মানসিকতা ও মনোভাব পুরোমাত্রায় বিদ্যমান। স্থবিরতা, শঠতা, অকারণ টেকনিক্যালিটি আর ফর্মালিটির বৃত্তায়নে আকীর্ণ প্রশাসনের সমগ্র শরীর উঁচু থেকে নিচু তলা পর্যন্ত দীর্ঘসূত্রতা ও দুর্নীতির ভরপুর। উপরে রাষ্ট্রপতি, মন্ত্রী, সচিব থেকে শুরু করে বিভাগ রয়েছে বিভাগীয় কমিশনার, জেলায় ডেপুটি কমিশনার ও থানায় সার্কের অফিসার। তাদের থেকে অনেক দুরে অবস্থান করেন জনগণ। এটা এমন একটি মাথাভারী প্রশাসন যা দিয়ে

শত চেষ্টা সত্ত্বেও করেও জনগণের সার্বিক কল্যাণসাধন ও মুক্তি অর্জন করা প্রায় অসম্ভব। শেখ মুজিবুর রহমান এ আমলাতান্ত্রিক প্রশাসনের মুলোৎপাটন করে দুঃখী ও গ্রামীণ মানুষের সার্বিক মুক্তির স্বার্থে এক নতুন প্রশাসনিক কাঠামো গড়ে তুলতে প্রয়াসী হন। এ প্রসঙ্গে শেখ মুজিব বলেন ঃ "কলোনীয়াল পাওয়ার ও রুল দিয়ে দেশ চলতে পারে না। এ এডিমিনিস্ট্রেশন, তারপর আমাদের এ সেক্রেটারিয়েট এসব ভাঙতে হবে। এসব চলতে পারে না- I am going for that ....সেকশন অফিসার তারপর ডেপুটি সেক্রেটারি, সেক্রেটারি তারপর আসে আমার কাছে। এসবের প্রয়োজন নেই। সোজাসুজি কাম চালান।" পরিবর্তিত প্রশাসন ব্যবস্থার উদ্দেশ্যে সম্পর্কে তিনি বলেন, : "ইডেন বিল্ডিং বা গণভবনের মধ্যে আমি শাসনতান্ত্রিক ক্ষমতা রাখতে চাইনে। আমি আস্তে আস্তে গ্রামে, ইউনিয়নে, থানা ও জেলা পর্যায়ে এটা পৌছে দিতে চাই। যাতে জনগণ সরাসরি তাদের সুযোগ সুবিধা পায় ... সোজাসুজি কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে জেলায় আমরা কানেকশান রাখতে চাই। তেমনি সরাসরি জেলার সঙ্গে থানার, থানার সঙ্গে ইউনিয়নের কানেকশান রাখতে হবে" (দেখুন, বাকশাল কি এবং কেন, সম্পাদনায় দিলরুবা সাইয়িদ, প্রকাশিত হয়েছে সাপ্তাহিক মুক্তিবাণীর সম্পাদক কর্তৃক, ঢাকা ৭ জুন, ১৯৭৯, পৃ-২০)। মোটকথা, পরিকল্পিত এ ব্যবস্থা হবে উন্নয়ন ও উৎপাদনমুখী, গণতান্ত্রিক, আমলাতান্ত্রিক

Dhaka University Institutional Repository

মুক্ত, গ্রামমুখী, কর্মক্ষম, দায়িত্বশীল ও বিকেন্দ্রিকৃত যৌথ প্রশাসন যা বাংলার দুঃখী মানুষের মুক্তির প্রাথমিক সোপান। নতুন এ প্রশাসন ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যগুলো ছিল নিম্নরূপ:

ক) পরিকল্পিত প্রশাসন ব্যবস্থা হবে ঋণু, সরাসরি, আমলতন্ত্রমুক্ত সচল এক বিকেন্দ্রীয়কৃত ব্যবস্থা।

খ) প্রশাসন হবে উৎপাদনের সঙ্গে সম্পৃক্ত। জনগণের ওপর খবরদারি করার জন্য।

গ) পরিকল্পিত প্রশাসন ব্যবস্থায় জনগণ হবে মূলশক্তি। জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত প্রতিনিধিরা শাসনকার্য পরিচালনা করবেন।

ঘ) পরিকল্পিত প্রশাসন ব্যবস্থায় জেলা প্রশাসনকে জনগণের নিকট দায়ী করা হয়।

ঙ) পরিকল্পিত প্রশাসন ব্যবস্থায় জেলা প্রশাসনিক কাউন্সিল ও জেলা গভর্নরকে নিয়ে এক যৌথ নেতৃত্বের উদ্ভব ঘটে।

চ) পরিকল্পিত প্রশাসন ব্যবস্থায় নির্বাহিক ও বিধানিক এ দুটো পরস্পর বিরোধী ও বিচ্ছিন্ন শক্তিকে একত্রিতকরণ করার ব্যবস্থা গৃহীত হয়।

ছ) পরিকল্পিত প্রশাসন ব্যবস্থায় প্রশাসনের প্রতিটি স্তরে স্থানীয় ভিত্তিতে পরিকল্পিত উদ্যোগ গ্রহণ ও বাস্তবায়নের অবাধ অধিকার, দায়িত্ব ও ক্ষমতা ন্যস্ত করা হয় এবং ব্যাপক জনগোষ্ঠীকে প্রশাসনের সঙ্গে সম্পৃক্ত করার ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

২. বিচার ব্যবস্থা সংক্রান্ত কর্মসূচি (Programme Relating to Judiciary):

দেশে এক যুগান্তকারী বৈপ্লবিক প্রশাসনিক পদক্ষেপ প্রবর্তনার সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পুরাতন বিচার ব্যবস্থার ক্ষেত্রে আমুল পরিবর্তন সাধন করতে সচেষ্ট হন। তিনি বিচার ব্যবস্থার স্থবিরত্বকে ভেঙ্গে দিয়ে একে গণমুখী করার এক জরুরি কার্যক্রম গ্রহণ করেন। জনগণ যাতে হাতের কাছে ন্যায় বিচার লাভ করতে পারে এবং তা সহজলভ্য হয় সেজন্য বিচার ব্যবস্থাকে নতুন করে ঢেলে সাজাবার উদ্যোগ গৃহীত হয়। কারণ হিসেবে বলা হয়, বর্তমান বিচার ব্যবস্থা দীর্ঘসূত্রতায় আকীর্ণ এবং হয়রানিমূলক। আদালতের লাল ইটের চারপাশে যেন বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কাঁদে। এর স্বরূপ বিশেষণ করতে গিয়ে বঙ্গবন্ধু বলেন, বর্তমান

Dhaka University Institutional Repository

বিচার ব্যবস্থায় মানুষ সুষ্ঠু বিচার পায় না। দারিদ্র ও অন্যান্য পরিস্থিতির কারণে গ্রামের দরিদ্র মানুষকে বিচারের নামে দিনের পর দিন হয়রানি হতে হয়। এতে অর্থই বিচারের প্রকৃত মানদণ্ড হয়ে দাঁড়ায়। আর সে জন্যে বঙ্গবন্ধু ঘোষণা করেন, গ্রাম বাংলার মানুষ যাতে সুবিচার পায় তার জন্য বিচার ব্যবস্থাকে তাদের নাগালের মধ্যে নিয়ে যেতে হবে। এক্ষেত্রে ঘোষিত সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ হলো: ক) বিচার বিভাগকে সম্পূর্ণ স্বাধীন ও নিরপেক্ষ করতে হবে এবং সেজন্যে সংবিধানের রাষ্ট্রপরিচালনার মূলনীতিতে ২২ নং ধারায় বলা হয় 'রাষ্ট্রে নির্বাহী অঙ্গসমূহ হতে বিচার বিভাগের পৃথকীকরণ রাষ্ট্র নিশ্চিত করবে।' খ) বিচার বিভাগকে স্বাধীন ও নিরপেক্ষ করার স্বার্থে বাকশালের গঠনতন্ত্রের ষষ্ঠ ধারায় ১০ নং উপধারায় বলা হয়েছে, "কোনো সরকারি, আধাসরকারি, স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান, আইন বলে গঠিত সংস্থা ও করপোরেশন প্রভৃতির কোনো কর্মচারী সদস্য পদে প্রার্থী হলে তাঁকে পূর্ণ সদস্যপদ কিংবা প্রার্থী সদস্যপদ দানের ক্ষমতা জাতীয় দলের চেয়ারম্যানের ওপর ন্যস্ত থাকবে। তবে দেওয়ানী আদালতে বিচারকার্যে নিযুক্ত কোনো কর্মচারী বা বিচারক আদৌ জাতীয় দলের সদস্যপদ প্রার্থী হতে পারবেন না। গ) প্রয়োজনবোধে গ্রামের বিচার ঘটনাস্থলেই সম্পন্ন হবে। থানায় থাকবে ট্রাইব্যুনাল। ফলে দুঃখী মানুষ ন্যায্য বিচার পাবে, বিচারের নামে অবিচার ও কালহরণ বন্ধ হবে। নিশ্চিত হবে দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন।

৩। বাধ্যতামূলক বহুমুখী গ্রাম সমবায় অর্থনীতি (Compulsory Multipurpose Village Level Cooperative Economy):

বাধ্যতামূলক বহুমুখী গ্রাম সমবায় বাকশালের মূল অর্থনৈতিক কর্মসূচি। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান অনুধাবন করলেন, শুধুমাত্র প্রশাসন ব্যবস্থার পরিবর্তন করে কিছু হবে না যদি না সেই প্রশাসনকে গ্রামীণ উৎপাদন ও উন্নয়নের সঙ্গে সংযুক্ত করে দেশ গড়ার কাজে তাকে নিয়োজিত করা না যায়। তিনি আরো উপলব্ধি করেন, দেশে প্রচলিত সমবায় ও বহুল প্রচারিত কুমিল্লা সমবায়ে মাঝারি ও ধনী কৃষকরাই উপকৃত হচ্ছে। এর মাধ্যমে প্রধানত: তাদের স্বার্থ রক্ষিত হচ্ছে। এর ফলে ভূমিহীন ও গরিব চাষীদের কোনো উপকার হচ্ছে না। এটা গরিব চাষী ও ক্ষেত মজুরদের শোষণের নতুন কৌশল উপকার হচ্ছে না। এটা গরিব চাষী ও ক্ষেতমজুরদের শোষণের নতুন কৌশল বৈ আর কিছুই নয়। এ পরিপ্রেক্ষিতে বঙ্গবন্ধু ঘোষণা দিলেন: "জমির মালিকের জমি থাকবে– কিন্তু তার ফসলের অংশ সবাই পাবে– যে মানুষ কাজ করতে পারে তাকে এ কো-অপারেটিভের সদস্য হতে হবে। এগুলো বহুমুখী কোঅপারেটিভ হবে। পয়সা

Dhaka University Institutional Repository

যাবে তাদের কাছে, টেস্ট রিলিফের টাকা যাবে তাদের কাছে, ওয়ার্কার্স প্রোগ্রাম যাবে তাদের কাছে। আমি ঘোষণা করছি, আজকে যে পাঁচ বছরের পানে প্রত্যেকটি গ্রামে পাঁচশত থেকে এক হাজার ফ্যামিলি পর্যন্ত নিয়ে কল্লালসারী কো-অপারেটিভ হবে। আপনার জমির ফসল আপনি নেবেন অংশ যাবে কো-অপারেটিভের হাতে, অংশ যাবে গভর্নমেন্টের হাতে।'

বঙ্গবন্ধুর উপরোক্ত ঘোষণা থেকে বাধ্যতামূলক বহুমুখী গ্রাম সমবায় অর্থনীতির কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য প্রতিভাত হয়ে উঠে।

ক) উৎপাদিত ফসলে গরিব ও ভূমিহীন ক্ষেতমজুরদের অংশীদারিত্ব।

খ) ব্যক্তিগত মালিকানায় স্থিত ভূমিকে বাধ্যতামূলকভাবে সমবায় তথ্য সামাজিক মালিকানায় আনয়ন।

গ) গ্রাম সমবায়কে উৎপাদন ও প্রশাসনিক ইউনিটরূপে গড়ে তোলা।

ঘ) ভূমি হতে যৌথ প্রয়াসে উদ্ভুদ্ধ উৎপাদনের মাধ্যমে ক্ষুদ্র শিল্প ও কুটির শিল্পের জন্য আবশ্যকীয় মূলধন সংগ্রহকরণ।

ঙ) বিচ্ছিন্ন অপরিকল্পিত ক্ষুদে মালিকানা জোতকে সমাজীকৃত ব্যাপক ও আধুনিক চাষ পরিকল্পনায় আনয়নকরণ।

চ) শোষণহীন সমাজ ব্যবস্থার স্বার্থে সামাজিক রূপান্তর অনিবার্যকরণ।

উপরোক্ত বৈজ্ঞানিক পরিকল্পনায় উৎপাদন বৃদ্ধি ও তা থেকে পাওয়া বাড়তি ফসলের ন্যায্য অর্থপ্রাপ্তির ফলে গ্রামীণ সংখ্যাগরিষ্ঠ দরিদ্র ব্যক্তি, ভূমিহীন চাষী ও ক্ষেতমজুরের অর্থনৈতিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটবে বলে আশা করা হয়। আরো আশা করা হয়, এর ফলে সেখানে পুরনো সমাজ কাঠামো ধ্বসে যাবে এবং সামাজিক রূপান্তরকে অনিবার্য করে তুলবে। সে সঙ্গে উৎপাদনের সঙ্গে জড়িত ও সংশিষ্ট ব্যক্তিরাই নতুন নেতৃত্বে জাতীয় অগ্রগতিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে।

Dhaka University Institutional Repository

শোষিতের গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা সংক্রান্ত কর্মসূচি (Programme Relating to the Establishment of Democracy of the Exploited): শোষণের গণতন্ত্র নয় বরং শোষিতের গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা বাকশালের প্রধান রাজনৈতিক কর্মসূচি। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দেশের আপামর জনসাধারণের জন্য একদিকে যেমন বাধ্যতামূলক গ্রাম সমবায়ের মাধ্যমে অর্থনৈতিক মুক্তির সনদ প্রদান করেন। অপরদিকে তেমনি তাদেরকে রাজনৈতিকভাবে সংগঠিত করার লক্ষ্যে প্রকৃত তথা শোষিতের গণতন্ত্রের রূপরেখা ঘোষণা করেন। প্রচলিত গণতন্ত্রের ধারণা শুধুমাত্র রাজনৈতিক কিন্তু প্রকৃত গণতন্ত্রের ধারণা সামাজিক ও অর্থনৈতিক। প্রচলিত গণতন্ত্রের তথাকথিত স্বাধীনতা শেষ পর্যন্ত হয়ে দাঁড়ায় গুটিকয়েক লোকের স্বাধীনতা শোষকের স্বাধীনতা।

এ প্রচলিত গণতন্ত্র যেহেতু সর্বদাই তলার প্রাসাদ ষড়যন্ত্রে নিয়ন্ত্রিত, সাম্রাজ্যবাদী প্রভুদের ইঙ্গিতে পরিচালিত, শোষণের কৌশলী গণ্ডিতে আবদ্ধ, চতুর আমলা, বুদ্ধিজীবী ও ধনিক শ্রেণীর স্বার্থে ব্যবহৃত কাজেই এ গণতন্ত্র সমাজের অল্পাংশের জন্য, অধিকাংশের জন্য নয়। এ অবস্থার পরিবর্তন একান্ত প্রয়োজনীয় মনে করে বঙ্গবন্ধু প্রতিষ্ঠা করতে চাইলেন এমন এক গণতন্ত্র যা হবে ব্যাপক অংশের গণতন্ত্র, শোষিতের গণতন্ত্রঃ এমন এক গণতন্ত্র যার মূল প্রতিটি গ্রাম বাংলায় ছড়িয়ে থাকবে সুদৃঢ়ভাবে। এ শোষিতের গণতন্ত্রের বৈশিষ্ট্যগুলো হবে নিম্নরূপঃ

ক) এ গণতন্ত্র সমাজের সর্বস্তরের মেহনতি মানুষের তথা অধিকাংশের গণতন্ত্র।

খ) এ গণতন্ত্রে কোনোরূপ মধ্যস্বত্বভোগী, মুনাফাখোর ও পরগাছা শ্রেণীর স্থান থাকবে না, এটা হবে উৎপাদনের সঙ্গে সম্পৃক্ত।

গ) এ গণতন্ত্র তথাকথিত মৌলিক অধিকারের চেয়ে মৌলিক চাহিদার ওপর অত্যধিক গুরুত্বারোপ করবে।

ঘ) এ গণতন্ত্র হবে শোষকদের শুকিয়ে মারার রাজনৈতিক হাতিয়ার।

ঙ) এ গণতন্ত্রের মূল থাকবে প্রাসাদ ষড়যন্ত্রে নয়, বাংলার মাটিতে।

Dhaka University Institutional Repository

উপরে বর্ণিত শোষিতের গণতন্ত্রের ধারণা ও রূপরেখাকে বাস্তবায়িত করার লক্ষ্যেই শেখ মুজিবুর রহমান ক্যাডারভিত্তিক রাজনৈতিক সংগঠন গড়ে তুলতে সচেষ্ট হয়েছিলেন- যার নামকরণ করা হয়েছিল বাংলাদেশের কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ (বাকশাল)।

মুজিব শাসনামলের মূল্যায়ন :

বাঙালি জাতির জীবনে যে অল্প কয়েকজন মানুষ ইতিহাস সৃষ্টি করতে পেরেছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তাঁর উদাত্ত আহ্বানে একদিন জেগে উঠেছিল সমগ্র বাঙালি জাতি। তিরিশ লাখ বাঙালির রক্তে রঞ্জিত এ বাংলাদেশে তিনি হয়ে উঠেছিলেন মুক্তির প্রতীক, হয়ে উঠেছিলেন সকল প্রেরণার উৎস। পৃথিবীর খুব কম রাজনৈতিক নেতা তাঁর মত ঈর্ষণীয় জনপ্রিয়তা লাভ করেছেন। যোজন যোজন দূরের স্বাধীনতার স্বপ্নকে তিনি বাস্তবে রূপ দিয়েছিলেন। অথচ স্বাধীনতাত্তোর বাংলাদেশে ১৯৭২-৭৫ এর আগস্ট পর্যন্ত শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগের শাসনামলে দেশের আর্থ-সামাজিক রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সীমাহীন অরাজকতা এবং সর্বোপরি সরকারের ভারত সোভিয়েত নীতির নির্ভরশীল প্রেক্ষিতে মুজিব সরকারের বৈধতা বিরাট চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয় এবং জনপ্রিয়তা ভয়ঙ্করভাবে হ্রাস পেতে থাকে। এ সময় সেনাবাহিনীর কতিপয় অফিসারের সাথে সরকারের অপ্রত্যাশিত আচরণ সামরিক অভ্যুত্থান ঘটিয়ে শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবারে নিহত করে আওয়ামী লীগ নেতৃত্বের অবসান করা হয়। ১৯৭৪ সালের বন্যার প্রেক্ষিতে দেশে দুর্ভিক্ষবস্থা দেখা দিলে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা ও চোরাচালানির দমন করার উদ্দেশে সেনাবাহিনীকে তলব করা হয়। সামরিক বাহিনীর গ্রেফতারকৃত চোরাচালানীদের অধিকাংশই ছিল ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ দলের। ফলে সামরিক তৎপরতা বন্ধ করে দেয়া হয় এবং কয়েকজন যুবক সামরিক অফিসার চাকরিচ্যুত হন।

মেজর নূর ও মেজর শাহরিয়ার খুলনায় শেখ মুজিবের ছোট ভাই শেখ নাসেরের অবৈধ চোরাচালানি ব্যবসায় উদ্ধারের জন্য শেষ নাগাদ চাকরি হারান। এ সময় ঢাকার একটি হোটেলে বিবাহের অনুষ্ঠানে মেজর ডালিমের স্ত্রীর প্রতি আওয়ামী লীগ নেতা গাজী গোলাম মোস্তফার অশালীন ব্যবহার এবং এ ব্যাপারে শেখ মুজিবের নিকট বিচার চাইলে ডালিমকে অপমানিত করা এবং চোরাচালান বিরোধী অপারেশনের সময় আওয়ামী লীগের কিছুসংখ্যক চোরাচালানিকে আটক করার কারণে তাকে বরখাস্ত করা হয়।

Dhaka University Institutional Repository

আওয়ামী লীগ সরকার দেশে বিদ্যমান এসব অসন্তুষ্টির কারণসমূহ অপনোদন করতে ব্যর্থ হন। যদিও বাকশাল গঠনের মাধ্যমে আওয়ামী লীগ অনুসৃত নীতির প্রকাশ্য বিরোধিতা দমনে চেষ্টা করা হয় তথাপি এ সময় উদার গণতন্ত্রীমনা বিমুক্ত অর্থনীতির সমর্থকগণ বিক্ষুব্ধ বিদ্যমান থাকায় এবং দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি, আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি, রক্ষীবাহিনীর চরম অত্যাচার প্রভৃতির কারণে জনগণ বাকশালের সফলতার সময় পর্যন্ত অপেক্ষা করতে প্রস্তুত ছিল না। ফলে আওয়ামী লীগ সরকার তথা শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে প্রতি দেশের জনগণের একটি বিরাট অংশ বীতশ্রদ্ধ হয়ে উঠে। কিছুসংখ্যক ডানপন্থী ও বামপন্থী রাজনীতিক এ সুযোগ পূর্ণমাত্রায় গ্রহণ করেন। তারা উপলব্ধি করেন, রাজনৈতিকভাবে আওয়ামী লীগ তথা শেখ মুজিবের গ্রহণ করেন। তারা উপলব্ধি করেন, রাজনৈতিকভাবে আওয়ামী লীগ শেখ মুজিবের নেতৃত্বকে বাধা দেয়া সম্ভব হবে না। তাই তারা সেনাবাহিনীর বিক্ষুব্ধ অংশের সাথে গোপন আঁতাত শুরু করেন এবং পরিশেষে ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট এক সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে শেখ মুজিব তথা আওয়ামী সরকারের পতন ঘটায়।

এ অধ্যায়ে আওয়ামী লীগ নেতৃত্বের সাফল্য ও ব্যর্থতার বিভিন্ন দিক নিয়ে এতক্ষণ আলোচনা করেছি। কিন্তু সাফল্য ও ব্যর্থতার কথা বাদ দিলেও যে বিষয়টি আমাদের সামনে স্পষ্ট হয়ে উঠে তা অতি সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে মওদুদ আহমেদের লেখায় যখন তিনি বলেন ঃ

"Mujib is the greatest phenomenon of our history. His death was not his end. He will continue to remain as a legend in the political life of Bangladesh. Bengalis might have had leaders in their history more intelligent, more capable and more dynamic than Sheikh Mujib but none gave so much to the Bengalis political independence and national identiy. It is Mujib who in the end was able to identify himself not only with the cause of the Benglais but with their dreams. He became the symbol of Bengali nationalism which gave birth to a movement leading to an independent and sovereign identity. In whatever form Bangladesh exists or whatever reversal it takes is its domestic political content or in its foreign relations, Mujib's position as a leader of the nationalist movement will not alter. Whether or not socialism or capitalism or neo-traditionalism takes its roots in the

Dhaka University Institutional Repository

socio-economic structure of the country or whether there is a reactionary or revolutionary government, the fact that there is a country called Bangladesh is a sufficeint testimony of Mujib's status as a legend of our age." দ্রষ্টব্য ঃ (Bangladesh: Era of Sheikh Mujibur Rahman, UPL, October 1983, ch, 12, p-263.)

জিয়াউর রহমানের শাসনামল[৫]

১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর। নয় মাসব্যাপী রক্তক্ষয়ী মুক্তি সংগ্রামের পর পৃথিবীর মানচিত্রে বাংলাদেশ নামে একটি নতুন রাষ্ট্রের জন্ম হলো। ওই সংগ্রামে তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানের দশ লক্ষাধিক বাঙালি পাকিস্তানের বর্বর সেনাবাহিনীর হাতে নৃশংসভাবে নিহত হয়। বিংশ শতাব্দির বিরাট এক মানবসৃষ্ট দুর্যোগ হলেও, এরই মাধ্যমে জাতীয় স্বাধীকারের পথে মানবতার জন্য এক সর্বোত্তম বিজয় অর্জিত হয়েছিল। চরম বিপর্যস্তকারী বৈষম্যের বিরুদ্ধে নিজেদের ভাগ্যকে গড়ার প্রচেষ্টায় বাঙালি জাতির সম্মিলিত আত্মদান বিশ্ববাসীর কল্পনাকে নাড়া দিতে পেরেছিল। সুদীর্ঘ দিনের লালিত সোনার বাংলা গড়ার স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দিতে এ উৎসর্গ সেদিন করতে হয়েছিল তাদেরকে। প্রতিটি বাঙালির হৃদয়ের প্রিয় অনুভূতিতে অনুরঞ্জিত মমতা, ন্যায়বিচার, সামাজিক ঐক্য আর সাংস্কৃতিক দীপ্তির ওপর ভিত্তি করে এক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার স্বপ্নসাধ হয়েছিল তাদের মনে। কিন্তু তা আর হলো না। সব উৎসর্গই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হলো। স্বপ্ন পরিণত হলো দুঃস্বপ্নে। বাংলাদেশ আবদ্ধ হলো রক্তের ঋণে।

শেখ মুজিবুর রহমান, খন্দকার মোশতাক আহমেদ আর জেনারেল জিয়াউর রহমান এর মতো বাংলাদেশের গোড়ারদিকের নেতারা যে হারে তাদের জাতির প্রত্যাশায় কুঠারাঘাত করেছিলেন, পৃথিবীর ইতিহাসে তার নজির বিরল। তারা একের পর এক দেশটির ক্ষতিপূরণের চাইতে অধিকতর বিনাশের দিকে ঠেলে দিতে লাগলেন। স্বাধীনতা আন্দোলনের অতি প্রিয় এক নাম শেখ মুজিব যে নামের যাদুর স্পর্শে অনেক অসম্ভবও সম্ভব হয়ে যেতো সেই শেখ মুজিব বাংলাদেশ মাত্র তিন বছরের মধ্যেই সব চাইতে করুণ পরিণতি বরণ করলেন। তৎপরবর্তী জেনারেল জিয়া প্রথমদিকে সেনাবাহিনীর ক্রীড়নক হিসেবে কাজ করলেও পরে তার নিজরূপে আত্মপ্রকাশ করেন যার জন্য পাঁচ বছরের মধ্যে তিনি ২০টি বিদ্রোহ এর সামরিক অভ্যুত্থানের

৫। চৌধুরী, হাসানুজ্জামান, ১৯৮৫, ১৯৮৬, ১৯৮৭, ১৯৯১, ১৯৯৩, ১৯৯৪, ২০১০ (দ্রষ্টব্য গ্রন্থপঞ্জি)

Dhaka University Institutional Repository

লক্ষ্যবস্তুতে হন। একুশতম সামরিক অভ্যুত্থানে তিনি নিহত হন।[২] অতঃপর ১৯৭৫ সনের ১৫ আগস্টের রক্তাক্ত পরিসমাপ্তি এবং শেখ মুজিবুর রহমানের লাশের ওপর দিয়েই দেখা গেল তারই মন্ত্রিসভার অন্যতম সদস্য খন্দকার মোস্তাক আহমদ ২০ আগস্ট বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতির দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। অতঃপর জাতির উদ্দেশে এক বেতার ও টেলিভিশন ভাষণে অভ্যুত্থানকারী সেনাবাহিনীর বিপথগামী সদস্যদের "সূর্যসৈনিক" হিসাবে অভিহিত করেন। পূর্বতন মন্ত্রিসভার ১৮জন মন্ত্রীর মধ্যে ১০ জন এবং ৯ জন প্রতিমন্ত্রীদের মধ্যে ৮ জন মোস্তাক কেবিনেটে স্থান পায়।

উপরিউক্ত তালিকা আস্থাহীন, ভঙ্গুর নেতৃত্বের প্রতি যেমন ইঙ্গিত তেমনি প্রতারণা, কপটতা, বিশ্বাস ঘাতকতাই যে, নেতৃত্বের ঘরে বাসা বেধেছে তার প্রমাণকেই প্রতিষ্ঠিত করে। কেবিনেটের যে সদস্যরা দুই এক দিন আগেও নেতার প্রশংসায় পঞ্চমুখ ছিলেন, তারাই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৩২ নম্বরের বাড়িতে সিঁড়িতে পড়ে থাকা লাশের সৎকার না করেই নতুন কেবিনেটের স্থান পেতে দৌড়ঝাঁপ শুরু করে দেয়। নিয়তির কি নির্মম পরিহাস এমন কপট, প্রতারক, মির্জাফর তুল্য চরিত্রের অধিকারী মানুষগুলোই পরবর্তীতে আমাদের রাষ্ট্রযন্ত্র ও জাতিকে কোননা কোনোভাবে নেতৃত্ব দিয়েছেন বা দেয়ার চেষ্টা করেছেন। এদিকে ২ নভেম্বর রাতে ১৫ আগস্টের ঘটনা পরিক্রমায় কারাগারে অন্তরীণ সাবেক উপরাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম, সাবেক প্রধানমন্ত্রী জনাব এম মনসুর আলী, সাবেক অর্থমন্ত্রী এম তাজউদ্দিন আহম্মদ ও সাবেক শিল্পমন্ত্রী এ এইচ এম কামরুজ্জামানকে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে হত্যা করা হয়। এভাবেই পূর্ববর্তী সরকারের নেতৃত্বে শেষ নিশানাটুকুতে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। বাংলাদেশ প্রবেশ করে অভ্যুত্থান ও পাল্টা অভ্যুত্থানের এক অরাজকতার ঘূর্ণাবর্তে। একপর্যায়ে মোস্তফাকেও চলে যেতে হয়। ৫ নভেম্বর রাষ্ট্রপতি খন্দকার মোস্তাক আহমদ পদত্যাগ করেন এবং সুপ্রিমকোর্টের প্রধান বিচারপতি জনাব এমএ সায়েমের নিকট দায়িত্বভার অর্পণ করেছেন বলে ঘোষণা করা হয়। ৬ নভেম্বর বিচারপতি জনাব এ এম সায়েম বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন। এখানে লক্ষ্যণীয় সাধারণ নিমম হলো নতুন রাষ্ট্রপতি শপথ গ্রহণ করবেন তাকে দায়িত্ব বুঝিয়ে দিয়ে পূর্ববর্তী রাষ্ট্রপতি বিদায় নেবেন। এ স্বাভাবিক বিধিও এখানে ছিল অনুপস্থিত। অরাজতা ক্ষমতার দ্বন্ধ, অভ্যুত্থান ও পাল্টা অভ্যুত্থানই ছিল এর নিয়ামক শক্তি। ধ্বসে পড়া নেতৃত্বেই এমন হতাশাব্যঞ্জক দৃশ্য চোখে পড়ে।

Dhaka University Institutional Repository

৮ নভেম্বর ১৯৭৫ এক ঘোষণাবলে রাষ্ট্রপতি বিচারপতি জনাব এ এম সায়েম ১৫ আগস্ট জারিকৃত সামরিক আইন পূর্ববৎ রাখেন এবং তিনি নিজেই প্রধান সামরিক আইন প্রশাসকের দায়িত্বগ্রহণ করেন বা তাকে এমন কর্মুলার মধ্যদিয়েই হটানো হয়। তিনি সেনাবাহিনীর তিনটি শাখার প্রধান যথা মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান, নৌ-বাহিনীর প্রধান কমোডার মোশাররফ হোসেন খান, বিমান বাহিনীর প্রধান এয়ার ভাইস মার্শাল খান, এম,জি তাওয়াবকে উপপ্রধান সামরিক আইন প্রশাসক হিসেবে নিযুক্ত করেন। তিনি তাঁদের প্রত্যেকের কর্তৃত্বাধীন কয়েকটি মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব ন্যস্ত করেন। রাষ্ট্রপতি জনাব এম এম সায়েম ১৯৭৬ সালের ২৯ নভেম্বর মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমানকে প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক নিয়োগ করেন, ১৯৭৭ সালের ২৯ এপ্রিল রাষ্ট্রপতি এ.এম. সায়েম পদত্যাগ করেন এবং রাষ্ট্রপতি হিসেবে তার সকল ক্ষমতা মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমানের নিকট হস্তান্তর করেন। বেসামরিক সামরিক শাসনের অধ্যায় অতিক্রম করে বাংলাদেশও পূর্ণাঙ্গ সামরিক শাসনের অধ্যায়ে প্রবেশ করে। বেসামরিক নেতৃত্বের চরম ব্যর্থতার মধ্যদিয়ে রাষ্ট্র অনাকাঙ্খিত সামরিক শাসনের সূত্রপাত হয়।

উন্নয়নশীল দেশসমূহে সামরিক শাসন জারির কারণ, বাংলাদেশ প্রসঙ্গে আলোচনা করা হলো:

উন্নয়নশীল দেশসমূহে সামরিক শাসন জারির কারণ (The causes of proclamation of martial law in developing countries) : গোড়াতেই অধ্যাপক এস.ই. ফাইনারের (S.E. Finer) একটি উক্তি স্মর্তব্য। তিনি বলেছেন যে, "The most notable feature of the modern politics of the developing nations is the question of military intervention in politics." অর্থাৎ উন্নয়নশীল দেশেগুলোর রাজনীতিতে সামরিক বাহিনীর হস্তক্ষেপ আধুনিককালের রাজনীতির একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য পরিণত হয়েছে। অন্যভাবে বলা যায় যে, এসব দেশে বেসামরিক সরকারেরর পতন ও সামরিক বাহিনী কর্তৃক রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করে নেয়া নিত্যনিমিত্তিক বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। বর্তমানে এশিয়া, আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকার উন্নয়নশীল দেশসমূহের রাজনীতি মুলতঃ সামরিক বাহিনীর নিয়ন্ত্রণ করছে। বস্তুতঃ রাজনীতিতে সামরিক বাহিনী হস্তক্ষেপ করেনি। এমন উন্নয়নশীল দেশের সংখ্যা আজকের বিশ্বে নেহায়েত অল্প।

অধ্যাপক মায়রন উইনার (Myron Weiner) এর মতে, উন্নয়নশীল দেশগুলোতে প্রধানত : তিনটি কারণে সেনাবাহিনী রাজনীতিতে হস্তক্ষেপ করে থাকে। এগুলো হচ্ছে-

Dhaka University Institutional Repository

অ) সেনাবাহিনীর সদস্যদের মনে প্রাদেশিক আনুগত্য নয় বরং জাতীয় আনুগত্যবোধই বিদ্যমান।

আ) সেনাবাহিনী দেশের আইন-শৃঙ্খলা বজায় রাখার সঙ্গে সংশিষ্ট।

ই) সেনাবাহিনী আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি সম্পন্ন বিধায় জনগণ তাদের প্রতি আস্থা রাখে। সেনাবাহিনী আধুনিককরণে উৎসাহী কিন্তু প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক দলগুলোর কর্মকাণ্ডে সন্তুষ্ট নয়।

অধ্যাপক জনসন আরব উন্নয়নশীল দেশের রাজনীতিতে সামরিক বাহিনীর হস্তক্ষেপের জন্য চারটি কারণ নির্দেশ করেছেন, যথা-

অ) হিংসাত্মক কার্যকলাপের ওপর সেনাবাহিনীর নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা বিদ্যমান থাকে।

আ) সামরিক বাহিনী অন্যান্য যেকোনো বাহিনীর চেয়ে অধিক পরিমাণে সুসংগঠিত।

ই) সামরিক বাহিনীর অধ্যাধুনিক যন্ত্রপাতি এবং বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক উন্নতির সঙ্গে পরিচিত থাকেন বলে তারা মনে করেন যে, তার দেশের অপরাপর জনগোষ্ঠী বা সংস্কার উর্ধ্বে অবস্থান করেন।

ঈ) ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সামরিক বাহিনীর মনে করেন যে, দেশ পরিচালনার ক্ষেত্রে তাদের প্রাধান্য রয়েছে। দেশের মধ্যে তাদের অবস্থানকে তারা খুব গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেন।

মাইরন ওয়েনার এবং জনসন নির্দেশিত উপরোক্ত কারণগুলো ছাড়াও উন্নয়নশীল দেশসমূহের রাজনীতিতে আরো কতিপয় কারণে সেনাবাহিনী রাজনীতির ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ করে থাকে। এগুলোর মধ্যে স্বল্পমেয়াদি সংকট, দীর্ঘমেয়াদি সংকট, রাজনৈতিক শূন্যতা, রাজনৈতিক স্থিতিহীনতা ক্ষমতাসীন সরকারের বৈধতার অভাব, সরকারের অসহিষ্ণু মনোভাব, শ্রেণীস্বার্থ, ব্যক্তিগত স্বার্থ, ক্ষমতার মোহ, অর্থনৈতিক সংকট, রাজনৈতিক সচেতনতা প্রভৃতি প্রধান। তাছাড়া সামরিক বাহিনীর রাজনৈতিক ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ করার প্রবৃত্তি ও সুযোগ উভয়ই থাকতে পারে।

Dhaka University Institutional Repository

একটি রাজনৈতিক ব্যবস্থায় সামরিক বাহিনীর কতগুলো বৈশিষ্ট্য থাকে যা অন্যান্য সামাজিক গোষ্ঠী থেকে স্বতন্ত্র। সামরিক বাহিনী অত্যাধিক সুসংগঠিত এবং তা পদসোপানের ওপর ভিত্তিশীল এবং এবং কেন্দ্রীভূত আদেশের অধীন। কিন্তু তাই বলে রাজনীতিতে সামরিক বাহিনীর হস্তক্ষেপ শুধু যে, তাদের সাংগঠনিক বৈশিষ্ট্যের কারণে হয়ে থাকে তা নয়। এ হস্ত ক্ষেপ বরং সামাজিক, রাজনৈতিক কারণেই হয়ে থাকে। আসলে রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় সামরিক বাহিনীর হস্তক্ষেপ সুনির্দিষ্ট বাস্তব পরিস্থিতি এবং সামগ্রিক রাজনৈতিক সংস্কৃতির কারণেই ঘটে তাকে। সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সংকটাপন্ন অবস্থা এবং নিম্নমানের রাজনৈতিক সংস্কৃতির (Low political culture) ফলেই মূলত উন্নয়নশীল দেশে সামরিক বাহিনীর রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করে নেয়।

১৯৭৫ সালের বাংলাদেশের রাজনীতিতে সামরিক বাহিনীর হস্তক্ষেপের কারণ (Causes of military invention in Bangladesh politics in 1975) :

বাংলাদেশ দক্ষিণ ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার একটি উন্নয়নশীল দেশ। এখানেও বেশ কয়েকবার অভ্যুত্থান ঘটেছে। সামরিক বাহিনীর হস্তক্ষেপের উপরোক্ত সাধারণ কারণগুলো বাংলাদেশেও সমভাবে প্রযোজ্য। স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার অজুহাতে বিশেষ শ্রেণীর স্বার্থ, ক্ষমতার অপব্যবহার, রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা, আইন-শৃঙ্খলার অবনতি, দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি, দলীয় কোন্দল, প্রশাসনিক, অচলাবস্থা প্রভৃতি কারণও বাংলাদেশে সামরিক বাহিনীর হস্তক্ষেপের অনুসঙ্গী কারণ। এসব কারণে বাংলাদেশে এ পর্যন্ত বেশ কয়েকবার সফল ও বর্থ অভ্যুত্থান সংঘটিত হয়েছ। প্রথমত: ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট ঢাকায় এক সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ১৯৭৫ সালের ৩রা নভেম্বর বাংলাদেশে দ্বিতীয়বারের মতো এক সামরিক অভ্যুত্থান ঘটে। এ অভ্যুত্থানের নায়ক ছিলেন, ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফ। তৃতীয়ত: ১৯৭৫ সালের ৭ নভেম্বর ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফের বিরুদ্ধে এক সিপাহী বিপাব সংঘটিত হয়। এতে খালেদ মোশাররফ তাঁর অনেক অনেক সমর্থকসহ নিহত হন। মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান কার্যত বাংলাদেশের শাসন ক্ষমতা গ্রহণ করেন। নিম্নে এ তিনটি ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ দেয়া হলো।

১. ১৫ আগস্টের অভ্যুত্থান (The 15th August Coup) : বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ও স্মরণীয় দিন। সেদিন দেশের বিরাজমান হতাশাপূর্ণ অবস্থার সুযোগ নিয়ে সেনাবাহিনীর ২০-৩০ জন তরুণ অফিসারের

Dhaka University Institutional Repository

নেতৃত্বে গোলন্দাজ ও ট্যাঙ্ক বাহিনীর ১৪০০ সৈন্যের সমর্থনে এক সামরিক অভ্যুত্থান ঘটে। লে. কর্নেল ফারুকুর রহমান, লে. কর্নেল খন্দকার আব্দুর রশীদ, মেজর ডালিম, মেজর নূর ও মেজর শাহরিয়ার এ অভ্যুত্থানের প্রধান নেতৃত্ব প্রদান করেন। তারা শেখ মুজিবুর রহমানের বাসভবন আক্রমণ করে তাঁকে সপরিবারে হত্যা করেন। বিডিআর ও রক্ষিবাহিনী নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করে। রক্ষীবাহিনী আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়।

১৫ আগস্টের অভ্যুত্থানের মাধ্যমে আওয়ামী লীগ নেতা ও শেখ মুজিব কেবিনেটের অন্যতম সদস্য খন্দকার মোশতাক আহমদ বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতির দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। অতঃপর জাতির উদ্দেশে এক বেতার ও টেলিভিশন ভাষণে অভ্যুত্থানকারী সেনাবাহিনীর সদস্যদের 'সূর্য সৈনিক' হিসেবে অভিহিত করেন। পূর্বতন মন্ত্রিসভার ১৮জন মন্ত্রীর মধ্যে ১০জন এবং ৯ জন প্রতিমন্ত্রীর মধ্যে ৮ জন মোশতাক কেবিনেট স্থান পায়। এ অভ্যুত্থান তেমন কোনো বিরোধিতার সম্মুখীন হয়নি। প্রথমদিকে অভ্যুত্থানের সঙ্গে জড়িত মেজরগণ সাজোয়া গাড়ি পরিবেষ্টিত অবস্থায় রাষ্ট্রপতি মোশতাকের সঙ্গে অবস্থান করতে থাকেন। প্রথমত: সবাই ভারতীয় আক্রমণের আশঙ্কা করেছিল। কিন্তু ভারত সরকার প্রকাশ্যভাবে বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে কোনো মন্তব্য প্রকাশ করতে বিরত থাকে। ঢাকার দূতাবাসের বরাত দিয়ে আমেরিকার স্বরাষ্ট্র দপ্তর সর্বপ্রথম এ খবর বহির্বিশ্বে প্রচার করে। পাকিস্তান সর্বপ্রথম মোশতাক সরকারকে স্বীকৃতি প্রদান করে এবং সাহায্য হিসেবে খাদ্যশস্য প্রেরণের কথা ঘোষণা করে। সৌদি আরব ও চীন মোশতাক সরকারকে স্বীকৃতি প্রদান করেন।

অভ্যুত্থানের দ্বিতীয় সপ্তাহে সেনাবাহিনীর মধ্যে কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঘটানো হয়। সেনাবাহিনীর স্টাফ প্রধান কে এম শফিউল্লাহকে চাকরি থেকে অবসর প্রদান করা হয়। উপ-স্টাফ প্রধান মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমানকে সেনাবাহিনীর স্টাফ প্রধান করা হয়। পাঁচ সদস্যবিশিষ্ট সামরিক অফিসারদের সমবায়ে একটি বিপ্লবী কাউন্সিল গঠন করা হয়। মোশতাক সরকার ইতিমধ্যে কতিপয় প্রশাসনিক রাজনৈতিক পদক্ষেপ গ্রহণ করেন যদিও সেগুলো ছিল ক্ষণস্থায়ী। বিপ্লবী

২. ৩রা নভেম্বরের অভ্যুত্থান (The 3rd November Coup) : ১৫ আগস্টের অভ্যুত্থানের মাধ্যমে শেখ মুজিবুর রহমানকে হত্যা এবং ৩১ অক্টোবর ১৯৭৫ চীনের স্বীকৃতিদানের প্রেক্ষিতে বামপন্থী রাজনীতিকগণ খুশি হয়েছিলেন। এ ভেবে যে, মোশতাক সরকার তাদের বামপন্থী

Dhaka University Institutional Repository

আদর্শ অনুসরণ করবে। কিন্তু বাস্তবে দেখা গেল তার বিপরীত অবস্থা। মোশতাক কেবিনেটে পুরাতন মন্ত্রিসভার কিছু কিছু সদস্যের অবস্থান বামপন্থীদের বিশেষ করে জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের (জাসদ) মনপীড়ার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এমনি এক অবস্থায় ৩রা নভেম্বর (১৯৭৫) সেনাবাহিনীর ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফ আরেকটি অভ্যুত্থান ঘটান। এ অভ্যুত্থান মুজিববাদী ও মস্কোপন্থীদের দ্বারা ব্যাপকভাবে সমর্থিত হয়। তারা ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফের বৃদ্ধা মাতার নেতৃত্বে ৪ঠা নভেম্বর মুজিব স্মৃতি দিবস পালনের উদ্দেশে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় চত্বর থেকে মিছিল বের করে শেখ মুজিবুর রহমানের বাসভবনে গমন করেন।

ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফ মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমানকে ক্ষমতা থেকে অপসারণ করেন। তিনি ১৫ আগস্টের অভ্যুত্থানের নায়কদের বিদেশে প্রেরণের ব্যবস্থা করেন। এদিকে তারা খালেদ মোশাররফের অজান্তে বিদেশে প্রেরণের ব্যবস্থা করেন। এদিকে তারা খালেদ মোশাররফের অজান্তে আওয়ামী লীগের চার নেতা সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দীন আহমদ, এম মনুসর আলী, এবং এ. এম.এইচ. কামরুজ্জামানকে ঢাকার কেন্দ্রীয় কারাগারে হত্যা করে। সুচিত হলো জাতির ইতিহাসে অপর এক কলঙ্কজনক অধ্যায়। ৫ নভেম্বর মোশাররফ খন্দকার মোশতাক আহমেদকে বিচারপতি সায়েমের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে বাধ্য করেন। যতদূর জানা যায়, এক্ষেত্রে খালেদ মোশাররফ সেনাবাহিনীর কতিপয় উর্ধ্বতন অফিসারদের সমর্থন লাভ করেছিলেন; কিন্তু সাধারণ সৈন্যদের সমর্থন এতে ছিল না। এ কারণেই শব পর্যন্ত অপর এক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে খালেদ মোশাররফ নিহত হন।

৩. ৭ নভেম্বর অভ্যুত্থান (The 7th November Coup) : ৩রা নভেম্বরের অভ্যুত্থানের সঙ্গে সঙ্গে জাসদ ও সাম্যবাদী দল সেনাবাহিনীর ওপর তাদের প্রভাব বিস্তার করতে সচেষ্ট হয় এবং সেনাবাহিনীর সদস্যদের মাঝে প্রচারপত্র বিলি আরেকটি পাল্টা বিপব ঘটাবার চেষ্টা করে। অবসরপ্রাপ্ত কর্নেল তাদের এবং হাসানুল হক ইনু এ বিপবের মূল পরিকল্পনায় ছিলেন বলে জানা যায়। এ পরিকল্পনা অনুসারে ৭ নভেম্বর (১৯৭৫) সামরিক অভ্যুত্থান ঘটে।

এ অভ্যুত্থানে খালেদ মোশাররফসহ আরো কতিপয় উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের হত্যা করা হয়। এর নায়ক ছিলেন সেনাবাহিনীর সিপাইবৃন্দ। সিপাইরা জিয়াউর রহমানকে বন্দিদশা থেকে মুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

করেন এবং তাঁকে পুনরায় সেনাবাহিনীর প্রধান রূপে নিযুক্ত করেন। বিচারপতি সায়েম রাষ্ট্রপতি হিসেবে অবস্থান করতে থাকেন। জিয়াউর রহমান রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রধান সামরিক আইন প্রশাসকরূপে নিয়োগ লাভ করেন এবং নৌ ও বিমান বাহিনীর প্রধানগণ উপ-সামরিক আইন প্রশাসক নিযুক্ত হন।

জাসদ যেহেতু এ অভ্যুত্থানে ইন্ধন যুগেছিলেন সেহেতু সায়েম সরকার রব-জলিলসহ অন্য নেতারা মুক্তি দেযার মাধ্যমে জাসদের প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শন করেন। কিন্তু জাসদের নেতারা সেনাবাহিনীর মধ্যে তাদের সমর্থক শ্রেণী গড়ে তোলার অপচেষ্টায় লিপ্ত হয়। তাঁরা জিয়াউর রহমানকে মার্কিন ঘেঁষা প্রতিক্রিয়াশীল বলেও আখ্যায়িত করেন। সে সঙ্গে তাঁরা সৈনিক, শ্রমিক, কৃষক বুদ্ধিজীবীর সমবায়ে একটা বিপ্লবী পরিষদ (Revolutionary Council) গঠনেরও আহ্বান জানান। জাসদের এ ধরনের কর্মতৎপরতা মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমানকে কঠোর হাতে বাধ্য করে। তিনি বিপবী গণবাহিনী প্রধান কর্নেল (অব.) তাহেরসহ রব-জলিলকে আটক করার নির্দেশ দেন। ২৫ নভেম্বর (১৯৭৫) জাতির উদ্দেশে বেতার ভাষণে তিনি দেশবাসীকে যেকোনো প্রকার ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে সতর্ক থাকার আহ্বান জানান। দেশের অন্যান্য বামপন্থী দলগুলোও জাসদের এ ধরনের কর্মকাণ্ডের সমালোচনা করতে থাকেন।

জেনারেল জিয়াউর রহমানের শাসনের বেসামরিকীকরণ বা বৈধকরণ প্রক্রিয়া (Civilianization or legitimization process of General Ziaur Rahman's Rule) : উন্নয়নশীল দেশসমূহের রাজনীতিতে দলসমূহের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে রাজনৈতিক স্থিতাবস্থা প্রতিষ্ঠাকল্পে সামরিক বাহিনী হস্তক্ষেপ করে। প্রায় সব সামরিক শাসকই ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে ঘোষণা করেন, তাদের ক্ষমতা নিতান্তই একটা অস্থায়ী ব্যাপক এবং অতিশিগগিরই তারা ব্যারাকে ফিরে যাবেন। কিন্তু বাস্তবে ঘটে তার বিপরীত। খুব কম সামরিক শাসকই তাদের ক্ষমতা রাজনৈতিক এলিটদের হাতে ফিরিয়ে দিয়ে থাকেন। এর নজির অত্যন্ত বিরল বললেই চলে। ক্ষমতা লাভের পরই তারা উক্ত ক্ষমতাকে কিভাবে পাকাপোক্ত করে নেয়া যায় সে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে ওঠেন। সামরিক শাসনকে বেসামরিকীকরণ বা বৈধকরণ কিভাবে তারা মনোনিবেশ করেন। বাংলাদেশে ১৯৭৫ সালের সামরিক শাসন জারির পর

Dhaka University Institutional Repository

সামরিক শাসনকর্তাগণ তাদের শাসনকে বৈধকরণের দিকে অগ্রসর হন এবং ক্ষমতায় টিকে থাকার উপায় উদ্ভাবন করেন।

দুটো প্রধান উপায়ে রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান তাঁর সামরিক শাসনকে বৈধকরণ বা বেসামরিকীকরণ করতে সচেষ্ট হন। একটি হলো নির্বাচন পদ্ধতির মাধ্যমে (Through Election) এবং অপরটি হলো দল গঠনের মাধ্যমে (Through Party Building)। উল্লেখ্য যে, এ বৈধকরণ প্রক্রিয়া মোটামুটিভাবে পর্যায়ক্রমে অগ্রসর হয় যার বিবরণ নিম্নে প্রদান করা হলো ঃ

১। নির্বাচন অনুষ্ঠান (Holding Election): আমরা নিম্নোক্ত নির্বাচনগুলোর কথা উল্লেখ করতে পারি, যথা ঃ (ক) ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন, ১৩ জানুয়ারি ১৯৭৭ এবং পৌরসভা নির্বাচন আগস্ট-সেপ্টেম্বর, ১৯৭৭ (The Union Parishad Election, 13th January, 1977 and the Municipal Election, August-September, 1977):

ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন ও পৌরসভা নির্বাচনকে সামরিক শাসনকে বৈধ করার প্রথম পর্যায় বলে আখ্যায়িত করা যায় সামরিক সরকারের পূর্ব প্রতিশ্রুতি অনুসারে ১৯৭৭ সালের ১৩ জানুয়ারি থেকে ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচন শুরু হয়। জিয়া সরকার এ নির্বাচনকে দেশে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া শুরু করার পরিবেশ রয়েছে কিনা, তার নিরূপক হিসেবে অভিহিত করেন। যদিও দল নিরপেক্ষভাবে এ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় তবুও জাতীয় জীবনে এর রাজনৈতিক গুরুত্ব ছিল অপরিসীম।

১৯৭৭ সালের ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনের পূর্বেও এতদাঞ্চলে আরো দুটো স্থানীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছিল– এটা একট ১৯৬৪-৬৫ সালের আইয়ুব খানের মৌলিক গণতন্ত্রের অধীনে ইউনিয়ন কাউন্সিল নির্বাচন এবং অপরটি বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত হবার পর ১৯৭৩ সালের ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন। কিন্তু সে দুটো নির্বাচনের তুলনায় ১৯৭৭ সালের ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন ছিল অধিক তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ ১৯৭৫ সালের সামরিক শাসন জারির ফলে দেশের রাজনৈতিক অঙ্গনে যে থমথমে ভাব বিরাজ করছিল তা এ নির্বাচনের ফলে চাঙ্গা হয়ে ওঠে।

Dhaka University Institutional Repository

যদিও ইউনিয়ন পরিষদের সদস্যগণ দল-নিরপেক্ষভাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন তবুও নির্বাচনী ফলাফলে দেখা যায়, অনেক পুরাতন স্থানীয় রাজনীতিবিদ নির্বাচনে সাফল্য অর্জন করেন। অথচ তারা মুজিব আমলে জনগণ কর্তৃক পরিত্যক্ত হয়েছিলেন। এক পরিসংখ্যানে দেখা গিয়েছে, এ নির্বাচনে নির্বাচিত ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান ও সদস্যদের মধ্যে শতকরা ৭৭ ভাগ ছিলেন ডানপন্থী, শতকরা ২১ ভাগ মোটামুটি বামপন্থী এবং শতকরা ১ ভাগ ছিলেন চরম বামপন্থী। এদের মধ্যে শতকরা ৪৭ ভাগ সাম্প্রতিক বছরগুলোতে আওয়ামী লীগের সাথে সংযোগ রক্ষা করে চলেছিলেন। অথচ এঁরা মুসলিম লীগ ও ষাটের দশকে আইয়ুব খানের মৌলিক গণতন্ত্রের সমর্থক ছিলেন। তাছাড়া এঁদের অনেকেই স্বাধীনতা সংগ্রাম চলাকালে শান্তিবাহিনীর সাথে সহযোগিতা করেন। এঁদের মধ্যে শতকরা ২৩ ভাগ নির্বাচিত গ্রামীণ নেতারা মুসলিম লীগ ও অন্য ডানপন্থী দলের সমর্থক ছিলেন। (দেখুন- : M Rashiduzazzaman, "Bangladesh in 1977: Dilemmas of the Military Rulers" Asian Survey, February 1978, Vol. XVIII, No, 2)

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য, ১৯৭৫ সালের রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের পর দেশে পুনরায় রাজনৈতিক অধিকার ফিরে পাবার ক্ষেত্রে ১৯৭৭ সালের ইউনিয়ন নির্বাচনের গুরুত্ব ছিল অত্যাধিক।

অতঃপর ১৯৭৭ সালের আগস্ট-সেপ্টেম্বর মাসে দেশের পৌরসভাগুলোর নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ৭৮টি চেয়ারম্যান ও ৮৬৭টি কমিশনার পদের জন্য যথাক্রমে সর্বমোট ৪২১ জন এবং ৩৩৩৯ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। এ নির্বাচন মোটামুটি শান্তিপূর্ণভাবে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। নির্বাচনের ফলাফল থেকে স্পষ্টতই প্রতীয়মান হয়, এতে ডানপন্থীদের প্রভাব প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পায়।

(খ) গণভোট, ৩০ মে ১৯৭৭ : (Referendum, 30th May. 1977) : জিয়া সরকার তার শাসনকে বৈধ করার লক্ষ্যে দেশে একটি গণভোট অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। ১৯৭৭ সালের ৩০ মে গণভোট অনুষ্ঠানের দিনধার্য করা হয়। ইতিপূর্বে ২২ এপ্রিল (১৯৭৭) রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান ১৯ দফা কর্মসূচি ঘোষণা করেন। দফাগুলো ছিল নিম্নরূপ ঃ

Dhaka University Institutional Repository

১. সর্বতোভাবে দেশের স্বাধীনতা, অখণ্ডতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষা করা।

২. সংবিধানের চারটি মূলনীতি অর্থাৎ সর্বশক্তিমান আলাহর প্রতি সর্বাত্মক বিশ্বাস ও আস্থা, গণতন্ত্র, জাতীয়তাবাদ এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক ন্যায় বিচারের সমাজতন্ত্র জাতীয় জীবনে সর্বস্তরের প্রতিফলন করা।

৩. সর্ব উপায়ে নিজেদের একটি আত্মনির্ভরশীল জাতি হিসেবে গড়ে তোলা।

৪. প্রশাসনের সর্বস্তরের উন্নয়ন কার্যক্রমে এবং আইন-শৃঙ্খলার ব্যাপারে জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।

৫. সর্বোচ্চ অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে কৃষি উন্নয়নের মাধ্যমে গ্রামীণ তথা জাতীয় অর্থনীতিকে জোরদার করা।

৬. দেশকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করা এবং কেউ যেন ভুখা না থাকে তার ব্যবস্থা করা।

৭. দেশে কাপড়ের উৎপাদন বৃদ্ধি করে সকলের জন্য অন্তত : মোটা কাপড় সরবরাহ নিশ্চিত করা।

৮. কোনো নাগরিক যেন গৃহহীন না থাকে তার যথাসম্ভব ব্যবস্থা করা।

৯. দেশকে নিরক্ষরতার অভিশাপ থেকে মুক্ত করা।

১০. সকল দেশবাসীর জন্য ন্যূনতম চিকিৎসার বন্দোবস্ত করা।

১১. সমাজে নারীর যথাযোগ্য মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করা এবং যুব সমাজকে সুসংহত করে জাতি গঠনে উদ্বুদ্ধ করা।

১২. দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে বেসরকারি খাতে প্রয়োজনীয় উৎসাহ দান।

১৩. শ্রমিকদের অবস্থার উন্নতি সাধন এবং উৎপাদন বৃদ্ধির স্বার্থে সুস্থ শ্রমিক মালিক সম্পর্ক গড়ে তোলা।

১৪. সরকারি চাকরিজীবীদের মধ্যে জনসেবা ও দেশ গঠনের মনোবৃত্তি উৎসাহিত করা এবং তাদের আর্থিক অবস্থার উন্নয়ন করা।

১৫. জনসংখ্যা বিস্ফোরণ রোধ করা।

১৬. সকল বিদেশি রাষ্ট্রের সহিত সমতার ভিত্তিতে বন্ধুত্ব গড়ে তোলা এবং মুসলিম দেশগুলোর সহিত সম্পর্ক বিশেষ জোরদার করা।

১৭. প্রশাসন ও উন্নয়ন ব্যবস্থা বিকেন্দ্রিকরণ এবং স্থানীয় সরকারকে শক্তিশালী করা।

১৮. দুর্নীতিমুক্ত ও ন্যায়ভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থা কায়েম করা।

১৯. ধর্ম, বর্ণ, গোত্র নির্বিশেষে সকল নাগরিক অধিকার পূর্ণ সংরক্ষণ করা এবং জাতীয় ঐক্য ও সংহতি সুদৃঢ় করা।

Dhaka University Institutional Repository

উল্লিখিত কর্মসূচি ঘোষণার মাধ্যমে রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান তাঁর অনুসৃত নীতি, কর্মপন্থা এবং তাঁর নিজের প্রতি দেশবাসীর আস্থা যাচাইয়ের জন্য ১৯৭৭ সালের ৩০ মে গণভোট অনুষ্ঠানের দিন নির্ধারণ করেন।

নির্ধারিত তারিখে শান্তিপূর্ণভাবে দেশে গণভোট অনুষ্ঠিত হয়। সারাদেশের ২৯,৬৯৪ ভোটকেন্দ্রের নির্বাচন অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন ৬৫ রিটার্নিং অফিসার, ২১,৬৯৪ প্রিজাইডিং অফিসার এবং ৫৮ হাজারের অধিক সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার। নির্বাচনে রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের বিরাট সাফল্য অর্জিত হয়। তিনি শতকরা ৯৯ ভাগ ভোট লাভ করেন।

গণভোটে জিয়াউর রহমানের এ বিজয় দেশে মোটামুটিভাবে এক আনন্দ স্রোত বয়ে যায়। এতে সন্তোষ প্রকাশ করে ২৪ মে প্রবীন রাজনীতিবিদ আতাউর রহমান খান, ইউ.পি.পির সভাপতি ক্যাপ্টেন আবদুল হালিম চৌধুরী, জাতীয় গণমুক্তি ইউনিয়নের গাজী মোহাম্মদ দানেশ এক বিবৃতিতে বলেন, "গণভোট দিয়ে রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠার পদক্ষেপ নিয়েছেন।" সিপিবিও এ গণভোট সমর্থন করে। উল্লেখ্য, আতাউর রহমান খানের জাতীয় লীগ এবং সিপিবি উভয়দলই বাকশালের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ১৬ জুন (১৯৭৭) মস্কোপন্থী কমিউনিস্ট পার্টির সভাপতি এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন, "আমরা জিয়ার ১৯ দফা বাস্তবায়ন চাই, বাংলাদেশ বহুলাংশে স্থিতিশীল হয়েছে, আলাহর নাম করে সমস্যার সমাধান করতে পারলে ক্ষতি কি।" জাসদ ও আওয়ামী লীগ অবশ্য গণভোটের ব্যাপারে নিশ্চুপ থাকে।

এদতসত্ত্বেও জাতীয় জীবনে এ গণভোটের গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। এর মাধ্যমেই প্রথমত: সামরিক সরকার বৈধরূপ লাভ করে। তাছাড়া দেশে একটি গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া শুরু হবার কার্যক্রম অগ্রসর হতে থাকে। উপরন্তু এর ফলে সামরিক সরকারের প্রতি সামরিক সমর্থন ছাড়াও গণসমর্থন অর্জিত হয়।

(গ) রাষ্ট্রপতি নির্বাচন ৩ জুন, ১৯৭৮ : (Presidential Election, 3rd June, 1978): সামরিক শাসনকে বেসামরিকীকরণ বা বৈধ করার অপর একটি পদক্ষেপ ছিল রাষ্ট্রপতি নির্বাচন অনুষ্ঠান করা। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট থেকে বাংলাদেশের রাজনীতিতে যে বন্ধ্যাত্ব শুরু হয় ১৯৭৮ সালের ৩ জুন অনুষ্ঠিত রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের মধ্যদিয়ে তাতে প্রাণচাঞ্চল্য দেখা দেয়। দীর্ঘদিন পর দেশে পুনরায় প্রকাশ্য রাজনীতি করার সুযোগ জনগণ লাভ করে। অবশ্য সরকার সভা সমিতি করার সুযোগ প্রদান করেন। কিন্তু মিছিল করার অধিকার রহিত

Dhaka University Institutional Repository

করেন। কিন্তু দীর্ঘদিন যাবত বিভিন্ন রাজনৈতিক দল দেশে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের দাবি করে আসছিল তথাপি স্বল্প সময়ের ব্যবধানে নির্বাচনের তারিখ ঘোষণার সকলেই ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়ে। তাছাড়া দীর্ঘদিন যাবত প্রকাশ্য রাজনীতির ওপর বাধা নিষেধ থাকার ফলে অন্যান্য দলের পক্ষে এ স্বল্প সময়ের মধ্যে জনমত সৃষ্টি করা এক দুঃসাধ্য ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু রাষ্ট্রপতি ও প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক ব্যাপক সফরের মাধ্যমে তাঁর স্বপক্ষে জনমত গড়ে তোলেন। কোনো কোনো রাজনৈতিক দল আবার সামরিক আইনের অধীনে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন অনুষ্ঠান করাকে প্রহসন বলে চিহ্নিত করে।

যাহোক অধিকাংশ রাজনৈতিক দলই শেখ পর্যন্ত নির্বাচনের অংশগ্রহণে আগ্রহ প্রকাশ করে। যেহেতু এত অল্প সময়ের মধ্যে এককভাবে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার মতো অবস্থা কোনো রাজনৈতিক দলের ছিল না কাজেই তারা রাজনৈতিক মোর্চা (Political Alliance) গঠনে তৎপর হন। এ উদ্দেশে সংসদীয় পদ্ধতির সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তন এবং নির্বাচনে প্রার্থী নির্বাচনে প্রার্থী মনোনয়ন দানের ব্যাপারে ঐকমত্যের পৌছার পর ৫টি রাজনৈতিক দল ও কতিপয় রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের সমন্বয়ে 'গণতান্ত্রিক ঐক্য জোট'– গজ (GOJ) গঠিত হয়। দলগুলো ছিল আওয়ামী লীগ, জাতীয় জনতা পার্টি, গণ আজাদী লীগ, ন্যাপ (মোজাফফর), পিপলস লীগ এবং বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি মনি সিং, ন্যাপ (স্বতন্ত্র) এর সৈয়দ আলতাফ হোসেন, সুরঞ্জিত সেন গুপ্ত, জাকির আহমদ প্রমুখ। অপরদিকে গঠিত ৬টি রাজনৈতিক দলের সমন্বয়ে জাতীয়বাদী ফ্রন্ট (JF)। দলগুলো ছিল জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক দল (জাগদল), ন্যাপ (ভাসানী), ইউনাইটেড পিপলস পার্টি (ইউপিপি), বাংলাদেশ মুসলিম লীগ, বাংলাদেশ লেবার পার্টি এবং বাংলাদেশ তফসিলি ফেডারেশন। রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানকে এ ফ্রন্টের সভাপতি নিযুক্ত করা হয়।

জাতীয়তাবাদী ফ্রন্ট রাষ্ট্রপতি পদে জিয়াউর রহমানকে তাদের প্রার্থী হিসেবে মনোনীত করেন। তাঁর পক্ষে সাতটি মনোনয়নপত্র দাখিল করা হয়। প্রস্তাবগণ ছিলেন, সর্বজনাব শামছুল হুদা চৌধুরী, মওদুদ আহমদ, আবুল হাসনাত, মশিউর রহমান, মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ, আব্দুল মতিন এবং শ্রী রসরাজ মণ্ডল। অপরদিকে গণতান্ত্রিক ঐক্যজোট জাতীয় জনতা পার্টি প্রধান ও মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক জেনারেল (অব.) এমএজি ওসমানীকে তাদের প্রার্থী হিসেবে মনোনীত করেন। এ মনোনয়নপত্র পেশ করেন সর্বজনাব মহিউদ্দীন আহমদ, আবদুল আহমেদ, আবদুল রাজ্জাক, তোফায়েল আহমদ, বেগম সাজেদা চৌধুরী, বেগম মতিয়া চৌধুরী, ফেরদৌস

Dhaka University Institutional Repository

আহমেদ কোরেসি, মাযহারুল হক বাকি, ইউসুফ আলী, সৈয়দ আলতাফ হোসেন, জাকির আহমদ, শ্রী সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত ও শ্রী মনোরঞ্জন ধর। সর্বমোট দশজন প্রার্থী এ নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। তাঁরা হলেন- আজিজুল (লাঙ্গল মার্কা), আবুল বাশার (ছাতা মার্কা), অধ্যক্ষ আব্দুল হামিদ (সাইকেল মার্কা), হাকিম মৌলানা খবিরউদ্দিন (মশাল মার্কা), মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান (ধানের শীষ মার্কা), মোহাম্মদ আবদুস সামাদ (দাঁড়িপাল্লা মার্কা), মোহাম্মদ গোলাম মোরশেদ (গরুর গাড়ি), শেখ মোহাম্মদ আবু বক্কর সিদ্দিক (হারিকেন মার্কা) এবং সৈয়দ সিরাজুল হুদা (খেজুর গাছ মার্কা) (দেখুন, দৈনিক বাংলা, ৯ মে ১৯৭৮)।

অতঃপর শুরু হয় নির্বাচনী প্রচারাভিযান। গণতান্ত্রিক ঐক্যজোট সংসদীয় গণতন্ত্র পুনঃপ্রবর্তনের ওপর সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে। জোটের আহবায়ক আবদুল মালেক উকিল ২ মে এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন, "নীতিগতভাবে আমরা রাষ্ট্রপতি পদ্ধতির সরকারে বিশ্বাসী নই। তবুও কোনো অপবাদ যাতে না আসে সেজন্য আমরা প্রার্থী মনোনয়ন করেছি। ঐক্যজোট নির্বাচনে অংশ নিলে এবং তার প্রার্থী মনোনয়ন করেছি। ঐক্যজোটের নির্বাচনে অংশ নিলে এবং তার প্রার্থী জয়ী হলে দেশে সংসদীয় পদ্ধতির সরকার অর্থাৎ প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত সংসদ সদস্যগণ সরকার গঠন করেন" (দেখুন মুক্তিবাণী, ৭ মে ১৯৭৮)। উক্ত সাংবাদিক সম্মেলনে জেনারেল (অব.) ওসমানী বলেন, "জনগণের সার্বভৌমত্ব ও গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের জন্যই নির্বাচনকে চ্যালেঞ্জ হিসেবে নিয়েছি। আমরা চাই আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করতে। রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হলে আমার কর্তব্য হবে সংসদকে ক্ষমতা হস্তান্তর করা।" (দেখুন, মুক্তিবাণী ৭ মে ১৯৭৮)।

অপরদিকে জাতীয়তাবাদী ফ্রন্টের নেতারা নির্বাচনী প্রচারাভিযানকালে একচেটিয়াভাবে গণতান্ত্রিক ঐক্যজোটকে বাকশালের প্রতিমূর্তি বলে ঢালাও ব্যর্থতাকে জনসমক্ষে তুলে ধরেন। রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান তাঁর বিভিন্ন সভা-সমিতিতে গণতান্ত্রিক ঐক্যজোটকে গণতন্ত্রের হত্যাকারী বলে চিত্রিত করতে থাকেন। তিনি এক জনসভায় বলেন, "দেশে গণতন্ত্র ফিরে আনতে হলে এবং অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতা আনয়ন করতে হলে আওয়ামী বাকশালীদের চিরতরে নির্মূল করতে হবে" (দেখুন, দৈনিক বাংলা, ৯ মে ১৯৭৮।) ফ্রন্টভুক্ত মুসলিম লীগ এবং এর সাধারণ সম্পাদক শাহ আজিজুর রহমান ঘোষণা করেন, কেবল রাষ্ট্রপতি নির্বাচন করার জন্য নয়, জাতীয় স্বাধীনতার, সার্বভৌমত্ব, বিরোধী শক্তি ও বিভেদ সৃষ্টিকারীদের বিরুদ্ধে বৃহত্তর জনগণের ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ হিসেবে জাতীয়তাবাদী ফ্রন্ট গঠিত। তিনি আরো বলেন, দেশ

Dhaka University Institutional Repository

যখন সামরিক শাসন থেকে গণতান্ত্রিক ও বেসামরিক প্রশাসনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে সে মুহূর্তে তার দল বাকশালী ধ্যান-ধারণায় একদলীয় সরকারের পুনঃঅভ্যুত্থান প্রতিরোধ করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। (দেখুন, দৈনিক বাংলা, ৯ মে ১৯৭৮)

এ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে অপর একটি তৃতীয় ফ্রন্ট গঠিত হয়। এ ফ্রন্টের নেতৃত্ব দান করেন আতাউর রহমান খান। ফ্রন্টের অঙ্গদলগুলো ছিল জাতীয় লীগ, জাতীয় দল, ডেমক্রেটিক লীগ ও কৃষক-শ্রমিক পার্টি। আতাউর রহমান খান রাষ্ট্রপতি নির্বাচনকে একটি অর্থহীন ব্যাপার এবং ভোট প্রদান করাকে মূল্যহীন বলে মন্তব্য করেন' (দেখুন, সাপ্তাহিক খবর, ২৮ মে ১৯৭৮)। অবশ্য এ ফ্রন্ট ভাঙ্গন ধরে। মওলানা সিদ্দিক আহমদ দলগতভাবে রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানকে সমর্থন জ্ঞাপন করেন।

নির্বাচনকে দেশের সর্বমোট ৩ কোটি ৮৪ লক্ষ ৮৬ হাজার ২ শত ৮৪ ভোটারের মধ্যে ২ কোটি ৫ লক্ষ ৪৮ হাজার ৯ শত ৩০ ভোটার প্রদান করেন। চূড়ান্ত ফলাফল অনুযায়ী মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান ১ কোটি ৫৭ লক্ষ ৩৩ হাজার ৬ শত ৭টি ভোট লাভ করে। অপরপক্ষে ৫৫ হাজার ২ শত ভোটলাভ করেন। ১ কোটি ১২ লক্ষ ৭৮ হাজার ৪ শত অন্য প্রার্থী নিম্নবর্ণিত ভোট লাভ করেন।

প্রার্থীর নাম	প্রাপ্ত ভোট সংখ্যা
সৈয়দ সিরাজুল হুদা	৩৪ হাজার ৯৫ ভোট
অধ্যক্ষ আবদুল হামিদ	২৪ হাজার ২ শত ৩২ ভোট
মোঃ আবুল বাসার	৫১ হাজার ২৩ ভোট
মোঃ আবদুস সামাদ	৩৬ হাজার ৬ শত ৮০ ভোট
হাকিম মওলানা খবিরউদ্দিন আহমদ	৭৮ হাজার ৮ শত ৯০ ভোট
মোঃ আজিজুল ইসলাম	৪৬ হাজার ৬ শত ৫৮ ভোট
শেখ মোঃ আবু বকর সিদ্দিক	২৫ হাজার ৪ শত ৯১ ভোট
মোঃ গোলাম মোরশেদ	৩৬ হাজার ৮ শত ৫৪ ভোট

জিয়াউর রহমান ব্যাপক ভোটের ব্যবধানে জয়লাভ করেন। ১২ জুন (১৯৭৮) তিনি দেশের সর্বপ্রথম সাধারণ ভোটে নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন। এর ফলে নিয়মতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার সূচনা ঘটে এবং স্থিতিশীল রাজনীতি ও শাসন ব্যবস্থার উন্মোচন হয়। অতঃপর

Dhaka University Institutional Repository

নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি হিসেবে তিনি মন্ত্রিসভা গঠনে ব্রতী হন। তিনি উপদেষ্টা পরিষদ ভেঙ্গে দিয়ে ২৮ সদস্যবিশিষ্ট মন্ত্রিপরিষদ গঠন করেন। মন্ত্রিদের প্রায় সকলেই ছিলেন জাতীয়তাবাদী ফ্রন্টভুক্ত; কাজেই জাতীয়তাবাদী দলেরই প্রাধান্যসূচিত হয়। তবে ফ্রন্টের অন্যতম শরিক দল লেবার পার্টি থেকে ১৮, ন্যাপ (ভাসানী- ৩ ইউপিপি-২ মুসলিম লীগ (শাহ আজিজ)-২ রাষ্ট্রপতি জিয়া জাতি গঠন কাজে অগ্রসর হতে থাকেন।

(ঘ) জাতীয় সংসদ নির্বাচন, ১৮ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭৯ (Parliamentary Election, 18th February, 1979) : জিয়া সরকারকে বৈধকরণের চতুর্থ গুরুত্বপূর্ণ সংসদ নির্বাচন। এ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে দেশের রাজনৈতিক আবহাওয়া পুনরায় উত্তপ্ত হয়ে উঠে। ঘরোয়া রাজনীতি তথা রাজনৈতিক দলবিধি বিদ্যমান থাকায় দেশের রাজনৈতিক দলগুলো ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হতে থাকে। রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল গড়ে তোলেন। হঠাৎ করে সংসদ নির্বাচনের দিনধার্য করার ফলে নির্বাচনকে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল প্রহসন হিসেবে গণ্য করে। তারা নির্বাচন বর্জনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এবং এ উদ্দেশে ১০টি রাজনৈতিক দল ঐক্যবদ্ধ হয়। দলগুলোর মধ্যে ছিল বাংলাদেশ জাতীয় লীগ, জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল, ইউপিপি, ন্যাশনাল পার্টি ফর ডেমক্রেসি, গণতান্ত্রিক আন্দোলন, ন্যাপ (নাসের) এবং শ্রমিক-কৃষক সমাজবাদী দল। অপরদিকে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ (উভয় গ্রুপ), ন্যাপ (মোজাফফর), জাতীয় একতা পার্টি, বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টি, পিপলস লীগ প্রভৃতি দলগুলি উপরোক্ত দশ দলের মধ্যে স্বাধীনতা বিরোধী শক্তি ও ১৫ আগস্টের ঘটনাকে সমর্থনকারী রাজনৈতিক দল থাকায় দশ দলীয় ঐক্য যোগদান করা থেকে বিরত থাকেন। এবং তারা আলাদাভাবে নির্বাচন বর্জন আন্দোলন শুরু করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। ঢাকার বায়তুল মোকাররম প্রাঙ্গণে এক জনসভায় বক্তারা সামরিক শাসনের অধীনে নির্বাচনের তীব্র সমালোচনা করেন এবং প্রায় সবগুলো দলই নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে যখন সরকার জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশনে এক সপ্তাহের মধ্যে সামরিক আইন প্রত্যাহারের প্রতিশ্রুতি দান করেন। এছাড়াও রাষ্ট্রপতি আরো কতিপয় প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যেমন : (অ) সংসদ সদস্যদের মধ্য থেকে প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ করা এবং তাঁকে অবশ্যই সংসদের অধিকাংশ সদস্যের আস্থাভাজন হতে হবে (আ) জাতীয় সংসদের সদস্য নয় এমন ব্যক্তিকেও কেবিনেট অন্তর্ভুক্ত করা। তবে তাদের সংখ্যা মোট কেবিনেট সদস্যদের এক পঞ্চমাংশের অধিক হবে না। (ই) জাতীয় সংসদ প্রেরিত কোনো বিলে রাষ্ট্রপতির ভেটো প্রয়োগ করতে পারবেন না (ঈ) সংবিধানে কোনো ব্যাপক পরিবর্তন আনয়ন করতে হলে কিংবা রাষ্ট্রপতির নির্বাচন পদ্ধতির ক্ষেত্রে কোনোরূপ পরিবর্তন আনয়ন করতে হলে গণভোট (Referendum) অনুষ্ঠানের প্রয়োজন হবে (দেখুন, দি

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশ টাইমস, ১৬ ডিসেম্বর, ১৯৭৮) যাহোক এসব দাবি দাওয়া মেনে নেয়ার ফলে অবশেষে ২৯টি রাজনৈতিক দল ও উপদল নির্বাচনে অংশ নেয়।

১৯৭৯ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সংসদের মোট ৩০০ সাধারণ নির্বাচিত আসনের জন্য ২,১২৫ প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। তন্মধ্যে ১৭০৩ প্রার্থী মোট ২৯টি দল কর্তৃক মনোনীত প্রার্থী ছিলেন, অবশিষ্ট ৪২২ জন নির্দলীয় বা স্বতন্ত্র প্রার্থী ছিলেন। এতো অধিকসংখ্যক রাজনৈতিক দল নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করলেও মনোনীত প্রার্থীর সংখ্যার দিক দিয়ে দলগুলোর মধ্যে যথেষ্ট তারতম্য পরিলক্ষিত হয়। নিম্নোক্ত টেবিলে দলীয় মনোনয়ন দেখানো হলো ঃ

দলের নাম	আসন
বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী (বিএনপি)	২৯৮
আওয়ামী লীগ (মালেক উকিল)	২৯৫
বাংলাদেশ মুসলিম লীগ (ইসলামিক)	
ডেমক্রেটিক লীগ (রহিম)	২৬৫
জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ)	২১০
আওয়ামী লীগ (মিজান)	১৮৩
ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (মোজাফফর)	৮৯
ইউনাইটেড পিপলস পার্টি (ইউপিপি)	৭০
গণফ্রন্ট (জি.এফ)	৪৬
ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (নুরুল-জাহেদ)	৩৭
জাতীয়বাদী গণতন্ত্রী দল (জগদল)	৩০
ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (নাসের)	২৮
বাংলাদেশ সাম্যবাদী দল (তোয়াব)	১৯
বাংলাদেশ জাতীয় লীগ (বিজেএল)	১৪
বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টি (সিপিবি)	১৪
অন্যান্য দল	৮১

উৎস ঃ নির্বাচন কমিশন, বাংলাদেশ সরকার

উপরোক্ত টেবিল থেকে এটা স্পষ্ট যে, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলই (বিএনপি) জাতীয় সংসদের সর্বাধিক সংখ্যক আসনে প্রার্থী মনোনীত করে। দ্বিতীয় স্থানে ছিল আওয়ামী লীগ

Dhaka University Institutional Repository

(মালেক) নির্বাচনী ম্যানিফেস্টোর দিকে তাকালে দেখা যায়, নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী কোনো দলই তেমন কোনো ইস্যু প্রদান করেনি। কোনো কোনো দল অবশ্য নির্বাচনের দু'এক সপ্তাহ পূর্বে ম্যানিফেস্টো ঘোষণা করেছিল কিন্তু তা নির্বাচকমন্ডলীর ওপর তেমন কোনো প্রভাব রাখতে সক্ষম হয়নি। কারণ এগুলোর অধিকাংশই ছিল দলীয় আদর্শের সঙ্গে অসামঞ্জস্যপূর্ণ এবং অস্পষ্ট। অবশ্য বিএনপির নির্বাচনী ম্যানিফেস্টোতে গণঐক্য প্রতিষ্ঠা এবং জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে জনগণের গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য সুদৃঢ় আশাবাদ ব্যক্ত করা হয়েছিল। এছাড়া এ দলটি দেশকে সাম্রাজ্যবাদ, নব্য সাম্রাজ্যবাদ, সম্প্রসারণবাদ ও বর্ণবাদের বিরুদ্ধে সোচ্চার থাকার কথা বলে এবং সেজন্য অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে আত্মনির্ভরশীল হবার ওপর গুরুত্বারোপ করে। এছাড়া বিএনপি সার্বভৌম পার্লামেন্টের ভিত্তিতে রাষ্ট্রপতি শাসিত ব্যবস্থার প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করে। আওয়ামী লীগ (মালেক), অপরদিকে চতুর্থ সংশোধনীর পূর্বেকার ১৯৭২ সালের সংবিধানের পুনরুত্থান, দ্বিতীয় বিপবের কর্মসূচির বাস্তবায়ন, জাতীয়করণএবং অন্যান্য কালোআইন বতিলের দাবি জানায়। নির্বাচনী ম্যানিফেস্টোর মাধ্যমে (দেখুন, ইত্তেফাক, ৫ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭৯) জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল ৩৩ দফা বিশিষ্ট নির্বাচনী ম্যানিফেস্টো ঘোষণা করে যার মূল দফাগুলো ছিল- সার্বভৌম পার্লামেন্ট প্রতিষ্ঠা, জনগণের পূর্ণ মৌলিক অধিকার প্রতিষ্ঠা, ভূমি সংস্কার, গরিব কৃষকদের জন্য সমবায় প্রতিষ্ঠা এবং সর্বোপরি একটা শোষণমুক্ত ও প্রগতিশীল অর্থনৈতিক ব্যবস্থা কায়েম করা। এদিকে বাংলাদেশ মুসলিম লীগ এমন একটি সংবিধান তৈরি করতে আগ্রহ প্রকাশ করে যাতে সংসদীয় ও রাষ্ট্রপতি শাসিত ব্যবস্থার যথাযথ সমন্বয় ঘটবে। আইডিএল (রহিম) কোরআন ও সুন্নাহর ভিত্তিতে আইন তৈরির মাধ্যমে দেশে 'ইসলামিক কল্যাণমূলক রাষ্ট্র' (Islamic Welfare State) প্রতিষ্ঠা করবে বলে নির্বাচনী ম্যানিফেস্টোতে উল্লেখ করে।

এখন আসা যাক নির্বাচনী ফলাফলে দিকে। আসলে এ নির্বাচনে প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয় জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) জাতীয় সংসদের ৩০০টি সাধারণ আসনের মধ্যে দুই তৃতীয়াংশ অর্থাৎ ২০৭টি আসন লাভ করে। পক্ষান্তরে আওয়ামী লীগ লাভ করে মাত্র ৩৯টি আসন। উল্লেখ্য, ১৮টি রাজনৈতিক দল কোনো আসন লাভ করতে পারেনি। নিম্নের টেবিলে নির্বাচনী ফলাফল বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হলো ঃ-

Dhaka University Institutional Repository

১৯৭৯ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ফলাফল

দলের নাম	প্রার্থী সংখ্যা	প্রাপ্ত আসন সংখ্যা
বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)	২৯৮	২০৭
আওয়ামী লীগ (মালেক)	২৯৫	৩৯
মুসলিম লীগ +আইডিএল	২৬৫	২০
জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল জাসদ	২৪০	০৮
আওয়ামী লীগ (মিজান)	১৮৩	০২
ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (মোজাফফর)	০৮১	০১
ইউনাইটেড পিপলস পার্টি (ইউপিপি	০৭০	০২
গণফ্রন্ট (জিএফ)	০৪৬	--
ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (নুরু)	০৩৮	--
ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (নাসের)	০২৮	--
জাতীয় একতা পার্টি	--	০১
জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক দল (জাগদল)	২৯	--
সাম্যবাদী দল (তোয়াহা)	২০	০১
গণতান্ত্রিক আন্দোলন	১৮	০১
লেবার পার্টি	১৬	--
জাতীয় লীগ	১৪	০১
বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টি	১১	--
জাতীয় জনতা পার্টি	০৯	--
জাতীয় দল	০৬	--
বাংলাদেশ ডেমক্রেটিক পার্টি	০৫	
স্বতন্ত্র প্রার্থী	৪২৫	১৭
মোট		৩০০

উৎস ঃ দৈনিক বাংলা, ৮ মার্চ ১৯৭৯ এবং দৈনিক সংবাদ, ৯ মার্চ ১৯৭৯

Dhaka University Institutional Repository

উল্লেখযোগ্য যে, জাতীয় সংসদের সর্বমোট আসন ছিল ৩০০। বিএনপি ২০৭টি আসনসহ, ৩০টি মহিলা আসনের সবকটিই বিএনপি জয়লাভ করে। ৪টি উপনির্বাচনের মধ্যে ৩টিতে বিএনপি জয়ী হয় এবং একটিতে মুসলিম লীগ মনোনীত প্রার্থী মিসেস রাজিয়া বিজয়ী হন।

নির্বাচন শেষে বিরোধী দলগুলো থেকে ব্যাপক কারচুপির অভিযোগ উত্থাপিত হয়। তবুও একথা স্বীকার করতেই হয়, নির্বাচনে বিএনপির ব্যাপক বিজয় সূচিত হয়। বলা বাহুল্য সংসদীয় নির্বাচনের মধ্যদিয়ে সামরিক শাসনকে বৈধকরণ প্রক্রিয়ার নির্বাচনী অংশটির সমাপ্তি ঘটে। এ প্রক্রিয়ার দ্বিতীয় অংশটি হলো দল গঠন প্রক্রিয়া (Party Building Process) যা আমরা নিম্নে আলোচনা করলাম।

(ঙ) দল গঠন প্রক্রিয়া (Party Building Process) : সামরিক শাসনকে বৈধ করার জন্য জিয়াউর রহমান নির্বাচন প্রক্রিয়ার পাশাপাশি দল গঠন প্রক্রিয়ার দিকে অগ্রসর হন। পাকিস্তানি শাসনামলে ষাটের দশকের প্রথমার্ধে দল গঠন না করে আইয়ুব খান যে ভুল করেছিলেন রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান সে ভুল করেননি। গোড়া থেকেই তাই তিনি রাজনৈতিকদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা শুরু করেন এবং এর ফলশ্রুতিতে হলো জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক দল (জাগদল)। রাষ্ট্রপতি জিয়া জাগদলের সদস্য না হলেও তাঁর অনুপ্রেরণাতেই মূলতঃ এর সৃষ্টি হয়েছিল। ১৯৭৮ সালের ২১ জুন জাগদল নেতা বিচারপতি আবদুস সাত্তার বলেন, যেকোনো বাস্তব অবস্থাতেই রাষ্ট্রপতি জিয়া জাগদলের নেতা, কেননা তাঁর অনুপ্রেরণাতেই জাগদল সৃষ্টি হয়েছিল। তিনি দাবি করেন, ইতিমধ্যেই জাগদল দেশের বৃহত্তম রাজনৈতিক দলরূপে আত্মপ্রকাশ করছে। ২৯ জুন (১৯৭৮) রাষ্ট্রপতি তাঁর উপদেষ্টা পরিষদ ভেঙ্গে দিয়ে ২৮ সদস্যের এক মন্ত্রিসভা গঠন করেন। এদিকে জাতীয়তাবাদী ফ্রন্টের শরিকগুলোর সমন্বয়ে 'জাতীয়তাবাদী দল' নামে একটি রাজনৈতিক দল গঠনের প্রশ্নে মন্ত্রিসভার সদস্য, ফ্রন্টভুক্ত বিভিন্ন নেতা এবং খোদ জাগদলের অভ্যন্তরে প্রবল মতপার্থক্য দেখা দেয়।

জাগদলের মধ্য থেকে একটি স্বতন্ত্র রাজনৈতিক দল গঠনের পক্ষ সমর্থন করেন, এ.জেড.এম. এনায়েত উল্লাহ খান। কিন্তু ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদ, আবুল হাসনাত, মির্জা গোলাম হাফিজ, কেএম ওবায়েদুর রহমানসহ বেশ কয়েকজন মন্ত্রী এর তীব্র বিরোধিতা করেন। একপর্যায়ে রাষ্ট্রপতি জিয়া তাদের সঙ্গে গোপনে আলাপ করেন এবং রাষ্ট্রপতির নেতৃত্বে প্রস্তাবিত নতুন রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যোগদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণের ভার দলের আহ্বায়ক বিচারপতি আব্দুস

Dhaka University Institutional Repository

সাত্তারের ওপর অর্পণ করা হয়। ২৮ আগস্ট (১৯৭৮) বিচারপতি সাত্তার এক নির্দেশ জারি করে সকল অঙ্গদলসহ জাগদলকে বাতিল বলে ঘোষণা করেন। এভাবে অত্যন্ত সুপরিকল্পিতভাবে রাষ্ট্রপতি জিয়া ১৯৭৮ সালের ১লা সেপ্টেম্বর ঢাকার রমনা গ্রীনে এক জনাকীর্ণ সাংবাদিক সম্মেলনে বৃহত্তর জাতীয় ঐক্যভিত্তিক একটি নতুন রাজনৈতিক দল গঠনের কথা আনুষ্ঠানিক ঘোষণা করেন। যার নামকরণ করা হয় বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)। দল গঠনের ফলে রাষ্ট্রপতি জিয়ার পক্ষে সমগ্র দেশব্যাপী সমর্থন পাওয়া অনেক সহজ হয়। তাঁর শাসনকে বৈধ তথা বেসামরিকীকরণ করা সহজ হয়।

সংবিধানের পঞ্চম সংশোধনী (Fifth Amendment to the Constitution) : ১৯৭৮ সালের ১৫ ডিসেম্বর বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি ও প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক এক ঘোষণার মাধ্যমে ১৯৭৫ সালের চতুর্থ সংশোধনীতে পরিবর্তন সাধন করেন। তাঁর এ ঘোষণা সংবিধানের পঞ্চম সংশোধনী আদেশ, ১৯৭৮ নামে অভিহিত হয়। এ আদেশবলে সংবিধানে নিম্নোক্ত বিষয়াদী সংযোজিত হয়।

১. এ আদেশ অনুসারে প্রধানমন্ত্রীকে অবশ্যই সংসদের সদস্য হতে হবে এবং রাষ্ট্রপতি সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের আস্থাভাজন ব্যক্তিকেই প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ করবেন।

২. সংসদ সদস্যদের মন্ত্রী নিয়োগের ব্যাপারে এ আদেশ ঘোষণা করে যে, সংসদের সদস্য নন এমন ব্যক্তিরা যদি মন্ত্রিসভার সদস্য হন তবে তাদের সংখ্যা পরিষদের মোট সদস্য সংখ্যার এক পঞ্চমাংশের বেশি হতে পারবে না।

৩. গণভোটের (Referendum) মাধ্যমেই কেবল সংবিধানের মুখবন্ধ, চার রাষ্ট্রীয় মূলনীতি এবং রাষ্ট্রপতি নির্বাচন পদ্ধতি সংশোধন করা যাবে।

৪. কোনো সরকারি কর্মচারী সংসদের সদস্য নির্বাচিত হতে পারবেন না।

৫. এ আদেশ রাষ্ট্রপতির 'ভেটো ক্ষমতা (Veto Power) রহিত করে।

৬. কেবলমাত্র সুপ্রিমকোর্টের সঙ্গে আলোচনা করেই রাষ্ট্রপতি দেশের অধঃস্তন আদালতগুলো পরিচালনা করতে পারবেন।

Dhaka University Institutional Repository

৭. সুপ্রিমকোর্টের বিচারকদের চাকরির নিরাপত্তা নিশ্চয়তাকল্পে একটি সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিল (Supreme Judicial Council) গঠনের বিধান করা হয়।

৮. কতিপয় ক্ষেত্রে সরকারি অর্থ ব্যয়ের কর্তৃত্ব রাষ্ট্রপতির হাতে অর্পণ করা হয়।

৯. সকল আন্তর্জাতিক চুক্তি রাষ্ট্রপতির নিকট উপস্থাপন করতে হবে। তিনি সেগুলো জাতীয় সংসদে পেশ করবেন তবে অনুরূপ চুক্তি সংসদে পেশ না করার ক্ষমতাও রাষ্ট্রপতির থাকবে। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট থেকে ১৯৭৯ সালের ৯ এপ্রিল তারিখের মধ্যে প্রণীত সকল ফরমান ও আদেশ, সামরিক আইন প্রবিধান, সামরিক আইন আদেশ ও অন্যান্য আদেশ এবং উক্ত মেয়াদের মধ্যে অনুরূপ কোনো ফরমান দ্বারা এ সংবিধানের যে সকল সংশোধন, সংযোজন, পরিবর্তন, প্রতিস্থাপন ও বিলোপ সাধন করা হয়েছে তা এবং অনুরূপ কোনো ফরমান, সামরিক আইন প্রবিধান, সামরিক আইন আদেশ বা অন্য কোনো আইন হতে বা আহরিত বলে বিবেচিত ক্ষমতাবলে অথবা অনুরূপ কোনো ক্ষমতা প্রয়োগ করতে গিয়ে বা অন্য বিবেচনায় কোনো আদালত, ট্রাইব্যুনাল বা কর্তৃপক্ষ প্রণীত কোনো আদেশ কিংবা প্রদত্ত কোনো দণ্ডাদেশ কার্যকর বা পালন করার জন্য উক্ত মেয়াদের মধ্যে কোনো ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রণীত, আদেশকৃত কাজকর্ম, গৃহীত ব্যবস্থা বা কার্যধারাসমূহ এতদ্বারা অনুমোদিত ও সমর্থিত হলো এবং সেগুলো বৈধভাবে প্রণীত, কৃত বা গৃহীত হয়েছে বলে ঘোষণা করা হলো। এসব ব্যাপারে কোনো আদালত, ট্রাইব্যুনাল বা কর্তৃপক্ষের কাছে কোনরূপ প্রশ্ন উত্থাপন করা যাবে না। সংক্ষেপে বলতে গেলে বলতে হয় যে, সামরিক শাসনামলে প্রবর্তিত সাংবিধানিক পরিবর্তনগুলোকে বৈধ করে নেয়া হয় (দ্রষ্টব্য ঃ সংসদ নেতা শাহ আজিজুর রহমান কর্তৃক স্পিকারের নিকট পেশকৃত বিল ৫ এপ্রিল, ১৯৭৯)

পঞ্চম সংশোধনীর রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া (Political reactions towards the Fifth Amendment) : জাতীয় সংসদে পঞ্চম সংশোধনী বিলটি উত্থাপিত হবার পর এর বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। সংসদের বিরোধীদলীয় নেতা বিলটির তীব্র সমালোচনা করে বলেন, সরকারি দলের নেতা যে বিলটি উত্থাপন করেছেন সংবিধানের ৮১ ও ৮২ নং ধারামতে সংসদে তা আলোচনার জন্য গৃহীত হতে পারে না। আবার শ্রী সুরঞ্জিত সেন গুপ্ত বিলটির বিরোধিতা করে বলেন, যে বিলটি সংসদে পেশ করে মার্শাল ল'কে সুকৌশলে সংবিধানে চাপিয়ে দেয়ার

Dhaka University Institutional Repository

চেষ্টা করা হয়েছে। তিনি আরো উল্লেখ করেন, সংবিধানের ১৪২ (ক) ধারামতে এ বিলটি সংসদে পেশ করা যায় না। তাছাড়া আওয়ামী লীগ সদস্য কর্নেল (অব.) আনোয়ারুলাহ এবং বিরোধী দলের ডেপুটি লিডার মহিউদ্দিন আহমদও বিলটির তীব্র সমালোচনা করে সংসদে বক্তব্য রাখেন।

শুধু জাতীয় সংসদের ভেতরেই নয় সংসদের বাইরেও বিরোধী দলগুলো ব্যাপক সভা সমিতির মাধ্যমে পঞ্চম সংশোধনীর বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানান। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সভাপতি আবদুল মালেক উকিল ফরিদপুরে এক জনসভায় সরকারের সমালোচনা করে বলেন, সরকার রাষ্ট্র পরিচালনার সর্বক্ষেত্রে ব্যর্থ হয়েছেন এবং পঞ্চম সংশোধনীর মাধ্যমে কালাকানুনসমূহকে অনুর্ভুক্ত করেছেন (দেখুন, ইত্তেফাক, ১৭ এপ্রিল, ১৯৭৯) দলের সাধারণ সম্পাদক আবদুর রাজ্জাক ফরিদপুরে এক জনসভায় বলেন, সংবিধানের পঞ্চম সংশোধনী সরকারের স্বেচ্ছাচারী কার্যকলাপ বৈধ করে নেয়ার প্রচেষ্টা বৈ আর কিছু নয়। আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে আরো বলা হয়, "এ সংশোধনীর আওতায় ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের পর থেকে জাতীয় সংসদের অধিবেশনের পূর্ব পর্যন্ত সামরিক আইনের অধীনে জারিকৃত প্রায় পাঁচশত মার্শাল ল' অর্ডার, রেগুলেশন, বিধি ও উপবিধিকে যেভাবে বৈধ রূপ দেয়ার চেষ্টা করা হয়েছে তা সাংবিধানিক ইতিহাসে এক নজিরবিহীন ঘটনা। অন্যদিকে বাঙালি জাতির দীর্ঘ সংগ্রামের মধ্যদিয়ে অর্জিত রাষ্ট্রীয় মূলনীতি চতুষ্টয়- জাতীয়বাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র এবং ধর্মনিরপেক্ষতার বিলোপসাধন এবং জাতীয়বাদ ও গণতন্ত্রের যে অপব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে তা স্বাধীনতা বিরোধী সুপরিকল্পিত চক্রান্তকারীদের স্বাধীনতার মৌল আদর্শের প্রতি এক নগ্ন হামলা" (দেখুন, ইত্তেফাক, ২২ এপ্রিল ১৯৭৯)।

এছাড়াও অন্যান্য রাজনৈতিক দলও গণতান্ত্রিক দৃষ্টিকোণ থেকে পঞ্চম সংশোধনীর তীব্র সমালোচনা করেন। বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি এক প্রস্তাবে অভিমত পোষণ করে যে, দেশ থেকে সামরিক আইন প্রত্যাহার করা হলেও পঞ্চম সংশোধনীর মাধ্যমে সামরিক শাসনের জের স্থায়ী করা হয়েছে। কারণ এর মাধ্যমে সামরিক শাসনামলে সংবিধানে আনীত সংশোধন, সংযোজন ও পরিবর্তনকে স্থায়ী আইনগত রূপ দেয়া হয়েছে। এদিকে মুসলিম লীগ প্রধান খান এ সবুর সংশোধনীর কঠোর সমালোচনা করে বলেন, এ সংশোধনী জনগণের কতিপয় মৌলিক অধিকার হরণ করে নিয়েছে। এ সংশোধনী গণতন্ত্রের নামে স্বেচ্ছাচারী শাসন কায়েমে সহায়ক হবে' (দেখুন, দৈনিক ইত্তেফাক, ৯ মে ১৯৭৯)। জাতীয় লীগ সভাপতি আতাউর রহমান খান

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম সংশোধনী বিল গৃহীত হওয়ায় উদ্বেগ প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, এতে সামরিক আদালতের বহুসংখ্যক দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে আপিলের অধিকার না থাকায় দুশ্চিন্তার অবকাশ থেকে যাচ্ছে।

যাহোক পঞ্চম সংশোধনীর বিরুদ্ধে এতসব প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করা সত্ত্বেও এর বাতিলের জন্য বিরোধী দলগুলো তেমন কোনো সুদৃঢ় আন্দোলন গড়ে তুলতে সক্ষম হয়নি। পক্ষান্তরে বিএনপি নেতারা দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ব্যাপক সফর শুরু করেন এবং বিভিন্ন স্থানে পঞ্চম সংশোধনীর গুণকীর্তন করেন। তাঁরা বলেন, এ সংশোধনীর মাধ্যমেই জনগণের মৌলিক অধিকার, সংবাদপত্র ও বিচার বিভাগের স্বাধীনতা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। যে যাই হোক এ কথা অনস্বীকার্য, পঞ্চম সংশোধনীর মাধ্যমে কার্যত সরকারি ক্ষমতার অত্যধিক কেন্দ্রীকরণ ঘটে। রাষ্ট্রপতির হাতে অত্যধিক ক্ষমতা নিয়োজিত হয়; জাতীয় সংসদের ক্ষমতা সীমিত করা হয়।

জেনারেল জিয়ার শাসন আমলের মূল্যায়ন ঃ

সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবারে হত্যা করা হল। জাতিকে বেসামরিক নেতৃত্বশূন্য করার জন্য। কারণ বেসামরিক নেতৃত্ব যেন ঘুরে দাঁড়াতে না পারে সেজন্য ঘটানো হল জেলহত্যার মত অপর এক জঘন্য হত্যাকাণ্ড। জাতীয় চার নেতা সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দিন আহমেদ, ক্যাপ্টেন মনসুর আলী ও এ এইচ এম কামারুজ্জামানকে জেলখানায় বন্দি অবস্থায় নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। বঙ্গবন্ধুসহ জাতীয় চার নেতার হত্যাকাণ্ড ছিল দেশি বিদেশি চক্রান্ত। এ চক্রান্তের দেশের কারও হাত ছিল সম্প্রসারিত, সক্রিয় এবং কারও হাত ছিল নির্লিপ্তভাবে গুটানো। এরা সকলেই ষড়যন্ত্র আর হত্যাকাণ্ডের স্বপক্ষ শক্তি। এদের অপরাধের পরিমাণ ভিন্ন হলেও মাত্রা অভিন্ন। জেনারেল জিয়ার ক্ষমতা দখল উল্লিখিত চক্র ও চক্রান্তের ধারাবাহিকতা ভিন্ন কিছু নয়। ক্ষমতা দখলের পর সংবিধান ও জাতীয় মুক্তিযুদ্ধের চেতনার পরিপন্থী কর্মকাণ্ড এবং মুক্তিযুদ্ধের বিরোধী শক্তিকে ক্ষমতার পাদপ্রদীপে এনে দিয়ে পূর্বানোমিত চিন্তা, বিশ্বাসকেই পরিপুষ্ট করেছেন জেনারেল জিয়া। যদিও মুক্তিযুদ্ধে তার ভূমিকা কম গৌরবোজ্জ্বল নয়। কিন্তু ক্ষমতার দুর্বার স্বপ্ন ও মোহে আদর্শচ্যুত হতে জেনারেল জিয়া বিন্দুমাত্র কার্পণ্য করেননি। জাতীয়তাবাদ ও সংবিধানের মৌলিক আদর্শকে পুলকে, পলকেই বদলে দিয়েছেন। অতঃপর সেনা বিদ্রোহের নামে অসংখ্য মুক্তিযুদ্ধের সূর্য সন্তানের জীবন প্রদীপ নিভে গেছে জেনারেল জিয়ার শাসনামলে। অবশেষে তিনি নিজেও ১৯৮১ সালের ৩০ মে চট্টগ্রামে কিছু সেনাসদস্যের হাতে মৃত্যুবরণ করেন।

Dhaka University Institutional Repository

হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদের শাসনামল[৬]

১৯৮২ সালে সামরিক শাসন জারির কারণ (Cause for the Proclamation of Martial law in 1982):

সাধারণত এশিয়া, আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকার উন্নয়নশীল দেশসমূহে যে সকল কারণে সামরিক বাহিনী রাজনীতিতে হস্তক্ষেপ করে সেসব কারণ ১৯৮২ সালে খুব একটা বিদ্যমান ছিল না। তবে বেসামরিক সরকারের দুর্নীতি, কলহ ও অন্তর্দ্বন্দ্ব এবং সামরিক সাংগঠনিক শ্রেষ্ঠত্বই মূলত: তখন সেনাবাহিনীকে রাজনীতিতে হস্তক্ষেপ করতে প্রলুব্ধ করেছিল। যাহোক এ ব্যাপারে আমাদের প্রথমে সরকারি ভাষ্য কি ছিল তার প্রতি দৃষ্টিপাত করব এবং পরে আরো কতিপয় বিশেষ কারণ উল্লেখ করব।

১। সরকারি ভাষ্য (Government Version): প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক ১৯৮২ সালের ২৪ মার্চ সমগ্র দেশে সামরিক শাসন জারির কারণ দর্শাতে গিয়ে বলেন, যেহেতু দেশে এমন এক পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটেছে অর্থনৈতিক জীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে, বেসামরিক প্রশাসন কার্যকরভাবে দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয়েছে, সকল স্তরে সীমাহীন দুর্নীতি জীবনের অংশ হয়ে উঠায় জনগণের জন্য দুর্বিষহ পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটেছে, আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির মারাত্মক অবনতিতে সম্মানজনক জীবন যাপন ও স্থিতিশীলতা বিপন্ন হয়ে উঠেছে কাজেই সেনাবাহিনীকে এ অবস্থা রোধকল্পে এগিয়ে আসতে হয়েছে। যেহেতু রাষ্ট্রের প্রতি দায়িত্ব পালনকে উপেক্ষা করে ক্ষমতাসীন দলের সদস্যদের মধ্যে ক্ষমতার কোন্দল জাতীয় নিরাপত্তা ও সার্বভৌমত্ব হয়ে উঠেছে হুমকিস্বরূক; যেহেতু দেশের জনগণ চরম হতাশায় দিশেহারা অবস্থায় এবং অনিশ্চয়তার মধ্যে নিপতিত এবং যেহেতু জাতির বৃহত্তর স্বার্থে এবং জাতীয় নিরাপত্তার স্বার্থে আমাদের কষ্টার্জিত দেশকে সামরিক আইনের আওতায় আনার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে সেহেতু দেশ ও জনগণের প্রতি সেনাবাহিনীর দায়িত্ববোধের অংশ হিসেবে দেশের সশস্ত্র বাহিনীর ওপর এ দায়িত্ব বর্তিয়েছে।

১৯৮২ সালের ২৪ মার্চের পূর্ব পর্যন্ত ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত বিএনপি সরকারের সমালোচনা করে প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক বলেন, তাদের স্বার্থপরতা, অযোগ্যতা, স্বজনপ্রীতি, সীমাহীন

---

[৬]। চৌধুরী, হাসানুজ্জামান, ১৯৮৫, ১৯৮৬, ১৯৮৭, ১৯৯১, ১৯৯৩, ১৯৯৪, ২০১০ (দ্রষ্টব্য গ্রন্থপঞ্জী)

Dhaka University Institutional Repository

দুর্নীতি এবং কোন্দল এ সরকারকে সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ করে দিয়েছে। তিনি জোর দিয়ে বলেন, এ সরকারের ওপর দেশবাসীর কোনো আস্থা নেই। এ প্রসঙ্গে তিনি ১১ ফেব্রুয়ারি (১৯৮২) জাতির উদ্দেশ্যে প্রদত্ত ভাষণে প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট বিচারপতি সাত্তার কর্তৃক তাঁর দুর্নীতিপরায়ণ মন্ত্রিসভার কথা অকপটে স্বীকারের কথা উল্লেখ করেন। তিনি আরো বলেন, সীমাহীন দুর্নীতির ফলে দেশে এমন এক নৈরাজ্যজনক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়, যে সরকারের একজন প্রভাবশালী মন্ত্রী তাঁর সরকারি বাসভবনে একজন ঘৃণ্য খুনি আসামিকে আশ্রয় দান করতেও দ্বিধাবোধ করেননি। এমনকি এ ন্যক্কারজনক ঘটনা যাতে সংবাদপত্রে প্রকাশিত না হয় সেজন্য সরকারের উচ্চপদে আসীন ব্যক্তিরা যথেষ্ট প্রভাব বিস্তারের বৃথা চেষ্টা করেছিলেন।

দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার বর্ণনা দিতে গিয়ে প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক বলেন, জাতীয় অর্থনীতি ছিল সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত। বিগত সরকারের ভ্রান্ত নীতি এবং সুষ্ঠু অর্থনৈতিক কর্মসূচি তথা দক্ষ পরিচালনার অভাবে সৃষ্ট অর্থনৈতিক বিশৃঙ্খলা বিভিন্ন শ্রেণীর জনগণের মধ্যকার ব্যবধান ক্রমশ বাড়িয়ে তুলেছিল। কল কারখানার উৎপাদন প্রায় বন্ধ হওয়ার উপক্রম হয়েছিল। অপরদিকে চরম অব্যবস্থা ও দুর্নীতির ফলে ব্যাংক, অফিস আদালত, রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পকারখানায় চোরাচালানি, কালোবাজারি, আড়তদার ও মুনাফাখোরদের দৌরাত্মে জনজীবন অতিষ্ঠ হয়ে উঠে। আমদানি-রপ্তানি, বৈদেশিক মুদ্রা প্রভৃতির ক্ষেত্রে চরম অবস্থার ফলে দেশি বিদেশি ব্যবসায়ী ও শিল্পতিগণ বাংলাদেশে অর্থ বিনিয়োগ করতে অনীহা প্রকাশ করে। বিদেশি সাহায্য সংস্থা আন্তর্জাতিক ব্যাংক ও অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান আমাদের রাজনৈতিক স্থিতিহীনতার জন্য ক্রমশ সরকারের প্রতি আস্থা হারাতে থাকে। সর্বোপরি সরকারের অদূরদর্শিতা ও সময়োপযোগী ব্যবস্থা গ্রহণে ব্যর্থতা দেশকে এক চরম অর্থনৈতিক সংকটের মুখে ঠেলে দেয়।

জেনারেল এইচএম এরশাদ দেশে সামরিক শাসন জারির পক্ষ সমর্থন করে বাংলাদেশ সুপ্রিমকোর্টের প্রাক্তন বিচারপতির ১৬ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ইউনিয়ন অভিষেক অনুষ্ঠানে প্রদত্ত ভাষণের কথা উল্লেখ করেন যাতে তিনি বলেছিলেনঃ "সমাজ জীবনে আজ এমন একটা অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে যে, যার যত ক্ষতি করার ক্ষমতা তার ততবেশি প্রতিপত্তি। সমাজে যারা সৎ ও ভালো তারা বড় অসহায় অবস্থায় কাল কাটাতে বাধ্য হচ্ছে। ধীর ধীরে ভালো মানুষেরা জনজীবন থেকে নিজেদের গুটিয়ে নিচ্ছে। ফলে সমাজে অসৎ ও দুর্নীতিবাজদের দাপট ও প্রতিপত্তি বেড়েই চলেছে। আজ আমাদের ব্যক্তিগত, সামাজিক ও জাতীয় জীবনে

Dhaka University Institutional Repository

মূল্যবোধের এমন এক ভয়াবহ অবস্থা ঘটেছে, সাহসিকতার সাথে এর মোকাবিলা করতে ব্যর্থ হলে আত্মমর্যাদা জাতি হিসেবে আমাদের সম্মান বিপন্ন হয়ে পড়বে।"

জেনারেল এরশাদ আরো বলেন, বিগত ৩০ মের দুর্ঘটনার পর হতে তাঁকে ক্ষমতা গ্রহণের জন্য অনেকেই অনুরোধ জানিয়েছিলেন। পরিস্থিতির নিরিখে হয়তো তখন তা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ও আশানুরূপ হতো। কিন্তু সেসব অনুরোধ তিনি তখন দৃঢ়তার সাথে প্রত্যাখ্যান করেন; কারণ তিনি মনে করেন, নিজ স্থান থেকেই তিনি ভালোভাবেই দেশ সেবা করে যেতে সক্ষম হবেন। তিনি আশা করছিলেন, দেশের রাজনীতিকগণ বিশেষ করে যাঁরা ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত আছেন, তাঁরা জাতির এ সংকটকালে উপযুক্ত কর্মপন্থা গ্রহণ করবেন এবং দেশকে অগ্রগতি ও সুসমৃদ্ধির পথে এগিয়ে নিয়ে যাবেন। কিন্তু পরবর্তী ঘটনাপ্রবাহ এ আশা আকাঙ্ক্ষাকে ধূলিস্মাত করে দেয়। জাতির জীবনে নেমে আসে চরম দুর্যোগ। এমতাবস্থায় সেনাবাহিনী নিরব দর্শকের ভূমিকা পালন করে যেতে পারে না। তাহলে তা হবে দেশ ও দেশবাসীর সাথে বিশ্বাসঘাতকতার সামিল।

২. বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের অভ্যন্তরীণ মতানৈক্য কোন্দল (Internal splits and factions of the Bangladesh Nationalist Party) : বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল মূলতঃ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের নেতৃত্বেই গঠিত হয়েছিল। জন্মলগ্ন থেকেই দলটি ছিল একটি ছাতাসদৃশ পার্টি Umbrella Party । এতে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের ও মতের সংমিশ্রণ ঘটে। এটা ছিল একটি বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের এক সম্মিলিত প্লাটফর্ম। দলটিতে দক্ষিণপন্থী, মধ্যপন্থী, বামপন্থী ও ইসলামপন্থী সব ধরনের ব্যক্তিরাই স্থান লাভ করেছিলেন। এ ধরনের বিভিন্নমুখী আদর্শ ও ভাবধারা সম্বলিত ব্যক্তিদের সমন্বয়ে একটি দলীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠা করা ছিল বাস্তবিকই দুরূহ কাজ। তবু জিয়াউর রহমানের জীবদ্দশায় কোনো রকমে তাদের ঐক্য বজায় রাখা সম্ভব হয়েছিল। কিন্তু তাঁর তিরোধানের পর দলের অভ্যন্তরীণ মতানৈক্য ও কোন্দল মাথাচাড়া দিয়ে উঠে এবং তা সুতীব্র আকার ধারণ করে। ১৯৮১ সালের রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের পর বিচারপতি সাত্তার যখন মন্ত্রিপরিষদ গঠনে সচেষ্ট হন তখন তা সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ পায়। এ সুযোগ সেনাবাহিনীকে ক্ষমতা গ্রহণে প্রলুব্ধ করে।

৩. অর্থনৈতিক সংকট ও দুর্নীতি (Economic Crisis and Corruption) : দেশে বিদ্যমান অর্থনৈতিক সংকট ও দুর্নীতি ১৯৮২ সালে সামরিক শাসন জারির পশ্চাতে ইন্ধন

Dhaka University Institutional Repository

যুগিয়েছিল। সাত্তার সরকারের অদূরদর্শিতা ও সময়োগী ব্যবস্থা গ্রহণে ব্যর্থতা দেশকে চরম অর্থনৈতিক সংকটের মুখে ঠেলে দেয়। আমদানি রপ্তানি ও বৈদেশিক মুদ্রা ইত্যাদি বিষয়ে সুষ্ঠু বিধি বিধানের অভাবে দেশি বিদেশি ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিগণ বাংলাদেশে অর্থ বিনিয়োগ করতে অনীহা প্রকাশ করেন। শুধু তাই নয় বিদেশি সাহায্য সংস্থা বিশ্বব্যাংক ও অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার অভাবে বাংলাদেশের প্রতি আস্থা হারাতে থাকে। ক্রমে বাংলাদেশ দেউলিয়া হওয়ার পথে অগ্রসর হতে থাকে। অর্থনৈতিক সংকটের পাশাপাশি দুর্নীতি সমাজের প্রতিটি রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবেশ করে। রাষ্ট্রপতি সাত্তার নিজেই বলেছেন, "সর্বোচ্চ পর্যায়ে বিভিন্ন গুরুদায়িত্বে যাঁরা নিয়োজিত আছেন তাদের অনেকেরই কর্তব্য ও দায়িত্ব পালনে ব্যর্থতা ও অবহেলা, ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির প্রচেষ্টা ও দেশের মঙ্গল ও কল্যাণ সম্পর্কে নির্লিপ্ততা ও দুর্নীতিপরায়ণতার ফলে দেশের সামগ্রিক অবস্থার অবনতি ঘটেছে।

৪. সেনাবাহিনীর ভূমিকা সম্পর্কিত বিতর্ক (Debate on the Role of Armed Forces) : ১৯৮১ সালের শেষভাগে বাংলাদেশের সাংবিধানিক প্রেক্ষাপটে এক নতুন প্রশ্ন দেখা দেয় এবং তাতে করে সশস্ত্র বাহিনীর সাংবিধানিক ভূমিকার ক্ষেত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ বিতর্কের সৃষ্টি হয়। উক্ত সালের ২৮ নভেম্বর জেনারেল এরশাদ জাতীয় সংবাদপত্র সম্পাদকদের সাথে আলোচনাকালে এক লিখিত বিবৃতিতে সমাজে সেনাবাহিনীর ভূমিকা ব্যাখ্যা করেন এবং এ মর্মে সংবিধানে বিধি বিধান সন্নিবেশ করার আহ্বান জানান। আর তাহলেই কেবল আমাদের দেশে অভ্যুত্থান ও হত্যাকাণ্ডের পুনরাবৃত্তির রোধ করা সম্ভব হবে বলে তিনি মনে করেন। তিনি দেশের সাংবিধানিক কাঠামোর ভেতর রাজনৈতিক ও সামরিক সমস্যাদির স্থায়ী সমাধান খুঁজে পাওয়ার ওপর গুরুত্বারোপ করেন। যেসব বিশেষ ক্ষেত্রে সেনাবাহিনী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে সেগুলো হচ্ছে- প্রাকৃতিক দুর্যোগ, সামাজিক অনাচার, স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা, যোগাযোগ ও রাস্তাঘাট নির্মাণ, জনশক্তি রপ্তানি, কৃষি প্রভৃতি।

প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক তাই বলেন ঃ "The British concept of keeping the military absolutely aloof has lost its significance today... the role of military especially in the context of a national army, should very much be that of a participant in the collective effort of the nation towards the achievement of progress, economic emancipation and political freedom in developing countries, (Major General H.M.

Dhaka University Institutional Repository

Ershad, "Role of the Military in Underdeveloped Countres", (প্রেক্ষিত, ১,২ ফাল্গুন, ১৩৯৩ দ্রষ্টব্য)।

জেনারেল এরশাদের এ বিবৃতি এ ধারণা দেশের রাজনৈতিক মহলে বিতর্কের সৃষ্টি করে। আওয়ামী লীগ দেশে বিদ্যমান সাংবিধানিক কাঠামোর অধীনে সেনাবাহিনীর প্রধান হিসেবে জেনারেল এরশাদের এ ধরনের মৌলিক সাংবিধানিক বিষয়ে বক্তব্য রাখার ঔচিত্য সম্পর্কে প্রশ্ন তোলে। বিএনপির নেতারাও তাঁর এরূপ বক্তব্যের যৌক্তিকতা সম্পর্কে প্রশ্ন তোলেন। উভয় দলই মনে করে, এ বক্তব্য সেনাবাহিনীকে বিতর্কের বিষয়বস্তুতে পরিণত করবে যা কোনোক্রমেই দেশের জন্য কল্যাণকর হতে পারে না। বিরোধী দল কর্তৃক সেনাবাহিনীর ভূমিকা সম্পর্কে এ ধরনের মন্তব্য করাকে সামরিক কর্তকর্তারা পছন্দ করতে পারেননি। এ অবস্থার প্রেক্ষিতে ক্ষমতাসীন সাত্তার সরকারের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে ১৯৮২ সালের ২৪ মার্চ সামরিক বাহিনী রাজনৈতিক দখল করে নেয়।

সামরিক বাহিনীর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য (Initial Aims and Objectives of the Military Government): ১৯৮২ সালের ২৪ মার্চ সামরিক শাসন জারির অব্যবহিত পরেই লে. জেনারেল হুসেনই মোহাম্মদ এরশাদ প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক হিসেবে জাতির উদ্দেশ্যে বেতার ও টেলিভিশন ভাষণে সামরিক বাহিনী কর্তৃক রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল করে নেয়ার কারণ ব্যাখ্যা করেন। উক্ত ভাষণেই তিনি কতিপয় সিদ্ধান্তের কথা ঘোষণা করেন। সিদ্ধান্তগুলো ছিল নিম্নরূপ।

ক. সংবিধানকে স্থগিত ঘোষণা করা হয়।

খ. জাতীয় সংসদকে ভেঙ্গে দেয়া হয়।

গ. মন্ত্রিসভাকে বাতিল করা হয়।

ঘ. সকল প্রকার রাজনৈতিক কার্যকলাপ নিষিদ্ধ করা হয়।

চ. স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে আসার পর দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা।

ছ. সরকার প্রধান হিসেবে প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক দায়িত্ব পালন করবেন এবং তার কাজে সাহায্য করার জন্য উপদেষ্টা নিয়োগ করবেন।

Dhaka University Institutional Repository

জ. সময়ে সময়ে জারিকৃত সামরিক বিধির সাহায্যে দেশ শাসন করা হবে।

স্বল্পকালের মধ্যেই প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক দুতপুল, যুব কমপেক্স, জেলা উন্নয়ন সমন্বয়কারী পদ ও কার্যকলাপ বাতিল করে দেন। রাষ্ট্রপ্রধানের পদে বিচারপতি এ এফ এম আহসানউদ্দীন চৌধুরীকে অধিষ্ঠিত করা হয়। তাঁকে সাহায্য করার জন্য উপপ্রধান সামরিক আইন প্রশাসন ও আঞ্চলিক সামরিক আইন প্রশাসক নিয়োগ করা হয়। পরবর্তীতে তাঁকে সাহায্য করার জন্য কিছুসংখ্যক মন্ত্রীও নিয়োগ করা হয়।

ইতোমধ্যে সামরিক সরকার তাঁর কতিপয় প্রাথমিক লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য স্থির করেন। এ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যগুলো ছিল নিম্নরূপঃ

১. দেশকে সামাজিক, প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক পর্যায়ের হাত থেকে রক্ষা করা।

২. সর্বগ্রাসী দুর্নীতির কবল থেকে সমাজকে মুক্ত করা।

৩. সামগ্রিকভাবে উৎপাদন বৃদ্ধি করা।

৪. সুষ্ঠু পরিবেশ সৃষ্টির মাধ্যমে জনগণের ধ্যান-ধারণার কার্যকর প্রতিফলন ঘটিয়ে গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা।

৫. সুখী ও সমৃদ্ধিশীল এবং শোষণমুক্ত সমাজব্যবস্থা কায়েম করা।

৬. একটি কর্মক্ষম ও সংবেদনশীল প্রশাসন ব্যবস্থা চালু করা যা জনগণের কাছে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ থাকবে।

৭. ভূমি সংস্কারের মাধ্যমে আপামর জনসমষ্টির ভাগ্যোন্নয়নের সুনিশ্চিত করা।

৮. একটি সর্বজনগ্রাহ্য স্থায়ী রাজনৈতিক কাঠামো সৃষ্টির মাধ্যমে জনগণকে অসৎ রাজনীতির শিকার হতে পরিত্রাণ দেয়া।

৯. বিচার বিভাগের বিকেন্দ্রিকরণ ও দ্রুত বিচারকার্য সম্পাদন।

১০. আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতি সাধন।

Dhaka University Institutional Repository

সরকারের প্রাথমিক লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য স্থির করার পর লে. জেনারেল হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ জনগণের মুক্তি অর্জনের লক্ষ্যে তাঁর সরকারের ১৮ দফা কর্মসূচি ঘোষণা করেন। এ দফাগুলো নিম্নরূপ :

১. অর্থনৈতিক মুক্তির মাধ্যমে রাজনৈতিক স্বাধীনতার সুফল ভোগ করা।

২. ধনী ও দরিদ্রের ব্যবধান ঘুচিয়ে জাতীয় সম্পদ সমবণ্টন করা।

৩. গ্রামীণ উন্নয়ন সাধন করা।

৪. উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে শিল্পজাত পণ্যের যথার্থ বণ্টন ও প্রতিযোগিতা সৃষ্টি।

৫. কৃষিপণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি ও খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন।

৬. কৃষকদের ন্যায্য পাওনার নিশ্চয়তা ও তাদের জীবনযাত্রার নিরাপত্তা বিধানপূর্বক ভূমিকার সংস্কার সাধন।

৭. পল্লী এলাকায় গ্রামীণ ব্যাংকের মাধ্যমে স্বল্প আয়ের মানুষের মধ্যে পুঁজিগঠন ও সরবরাহ করা।

৮. বেসরকারি খাতের শিল্পসমূহকে উৎসাহ দান ও বিনিয়োগ এবং বিনিয়োগের পরিবেশ সৃষ্টি করা।

৯. সমবায় ও কুটির শিল্পের উন্নয়ন।

১০. প্রশাসন ও বিচার বিভাগকে পুনর্বিন্যাস এবং বিকেন্দ্রিকরণ ও কৃচ্ছ্রতা সাধন করা।

১১. ছাত্রদের ভবিষ্যত জীবনের নিরাপত্তা বিধানপূর্বক শিক্ষাব্যবস্থার উন্নতি সাধন করা।

১২. সম্ভাব্য সর্বোচ্চ কর্মসংস্থানের সুযোগ প্রদান করা।

১৩. জাতীয় উন্নয়ন তৎপরতায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে মহিলারা যাতে সমাজে নিজেদের ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে পারে সেজন্য তাদেরকে সাহায্য করা।

১৪. জনগণকে স্বাস্থ্য সম্পর্কিত সুযোগ-সুবিধা প্রদান।

১৫. জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করা।

১৬. দুর্নীতির বিরুদ্ধে জেহাদ করা।

১৭. রাজনীতিতে কাজের রাজনীতিতে রূপান্তরিত করা।

১৮. জাতীয় জীবনে ইসলামী মূল্যবোধের প্রতিফলন ঘটান এবং নিজেদের ভাষা, কৃষি, ঐতিহ্য ও উত্তরাধিকারকে সমুন্নত রাখা।

449999

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

উপরে বর্ণিত ১৮ দফা 'কৃষকের মুক্তির সনদ' 'শ্রমিকের মুক্তির সনদ' এবং 'মেহনতি জনতার মুক্তির সনদ' প্রভৃতি বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এ কর্মসূচির যথাযথ বাস্তবায়নের মধ্যেই বাংলাদেশে বিরাজমান বিভিন্নমুখী সমস্যার সমাধান রয়েছে বরে ক্ষমতাসীন সরকার মনে করেন। ১৮ দফা কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য সরকার বাস্তবায়ন সেল (Implementation Cell) গঠন করেন।

এরশাদ সরকারের বেসামরিকীকরণ প্রক্রিয়া / বৈধকরণ প্রক্রিয়া (Civilianization Process/Legitimization Process of Ershad Government) : ১৯৮২ সালের ২৪ মার্চ ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে জেনারেল হুসেইন মোহাম্মদ এরশাদ তাঁর ক্ষমতাকে সুদৃঢ় করতে সচেষ্ট হন। গোড়া থেকেই তিনি তাঁর সামরিক শাসনকে বেসামরিকীকরণ কিংবা বৈধকরণের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। এ অনুভূতির থেকেই এরশাদের বেসামরিকীকরণ তথা বৈধকরণের প্রক্রিয়া পর্যায়ক্রমে শুরু হয়। অবশ্য এ প্রক্রিয়াকে মূলতঃ দুটো পর্যায়ে ভাগ করা চলে। নির্বাচনী প্রক্রিয়া (Party Building Process)। নিচে এ উভয় প্রক্রিয়া সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো।

১. নির্বাচনী প্রক্রিয়া (Electoral Process) :

ক. গণভোট মার্চ ১৯৯৫ (Referendum, March, 1985) : ১৯৮৫ সালের ২১ মার্চ সমগ্র বাংলাদেশে গণভোট অনুষ্ঠিত হয়। গণভোট অনুষ্ঠিত হয় মূলত: একটি লক্ষ্যকে সামনে রেখে। আর তা হলো রাষ্ট্রপতি ও প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক লেফটেন্যান্ট জেনারেল হুসেইন মোহাম্মদ এরশাদের অনুসৃত নীতি ও কর্মসূচি এবং স্থগিত সংবিধানের ভিত্তিতে জাতীয় নির্বাচনসমূহ অনুষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত রাষ্ট্রপতি পদে তাঁর অধিষ্ঠিত থাকার প্রশ্নে দেশের জনগণের আস্থা আছে কিনা তা যাচাই করা। এটা ছিল মূলতঃ 'হা' 'না' সূচক ভোট। বাংলাদেশে এটা ছিল দ্বিতীয় গণভোট। ইতোপূর্বে ১৯৭৭ সালের মে মাসে রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের শাসনামলে প্রথম গণভোট অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

সরকারি ঘোষণা অনুসারে গণভোটের বিপক্ষে কোনো প্রকার প্রচারণা ও বক্তব্য রাখা ছিল সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। তবে এর পক্ষে প্রচারণা করা ছিল উন্মুক্ত। গণভোটের পক্ষে প্রচারণাও হয় ব্যাপক। বেতার, টেলিভিশন সংবাদপত্র প্রচার পত্রিকা প্রভৃতির মাধ্যমে প্রচারণা চালান হয়েছিল। রাজনৈতিক বক্তব্য সম্বলিত দেয়াল লিখন নিষিদ্ধ থাকা ঘোষণা করা হলেও

Dhaka University Institutional Repository

গণভোটের পক্ষে পোস্টারিংয়ে কোনো বাধা নিষেধ ছিল না। একসূত্রে জানা যায়, আনুমানিক ২৪ লক্ষ পোস্টার ও ১০ লক্ষ লিফলেট সারাদেশে বিলি করা হয়েছিল। রাজধানী ঢাকাতেই কেবল সাত ধরনের নির্বাচনী পোস্টারিং করা হয়েছিল।

নির্বাচন কমিশন ২৭ মার্চ ১৯৮৫ চূড়ান্ত ফলাফল ঘোষণা করে। দেশে সর্বমোট ৪ হাজার কোটি ৭৯ লক্ষ ১০ হাজার ৯৬৪ ভোটারের মধ্যে ৩ কোটি ৪৫ লক্ষ ৬৩ হাজার ৪৪২ ভোট প্রদত্ত হয়। তন্মধ্যে 'হ্যা' সূচক ভোটের সংখ্যা ছিল ৩ কোটি ২৫ লক্ষ ৬১ হাজার ২৩৩ টি এবং 'না' সূচক ভোটের সংখ্যা ছিল ১৯ লক্ষ ১১ হাজার ২৮১টি। বাতিলকৃত ভোটের সংখ্যা ছিল ১ লক্ষ ২২ হাজার ৯৬১টি। নির্বাচন কমিশন ঘোষণা করেন, শতকরা ৯৪.১৪ ভাগ ভোট ছিল 'হ্যাঁ' সূচক এবং শতকরা ৫.৫ ভাগ ছিল 'না' সূচক ভোটের পরিমাণ। এভাবে ইউনিয়ন পরিষদ ও মিউনিসিপ্যাল নির্বাচনের পর ১৯৮৫ সালের ২১ মার্চ গণভোট অনুষ্ঠানের মাধ্যমে রাষ্ট্রপতি এরশাদ তাঁর শাসনামলে আংশিকভাবে হলেও বৈধ করে নিতে সক্ষম হন।

খ. উপজেলা নির্বাচন মে ১৯৮৫ (The Upa Zila Elections : May 1985) : বাংলাদেশের রাজনৈতিক অঙ্গনে ১৯৮৪ সালে সর্বাধিক বিতর্কের সৃষ্টি করেছিল এ উপজেলা নির্বাচন। সরকার ২৪ মার্চ ১৯৮৪ উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান নির্বাচনী অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন কিন্তু দেশের ২৩টি বিরোধী দল এ নির্বাচন অনুষ্ঠানের বিরোধিতা করে। এক্ষেত্রে দেশের ছাত্রসমাজ বিশেষ করে ছাত্রসংগ্রাম পরিষদ এক অগ্রণী ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিল। এমনি বিরোধিতার মুখে রাষ্ট্রপতি উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান নির্বাচন আপাতত স্থগিত রেখে নির্বাচনের পূর্ব পর্যন্ত উক্ত পদে মনোনয়নের ব্যবস্থা করবেন বলে এক ঘোষণা প্রদান করেন। কিন্তু ২৩ দল সেটারও বিরোধিতা করে। ফলে উপজেলাতে উপজেলা নির্বাহী অফিসারই (যিনি একজন সরকারি কর্মকর্তা) সর্বোচ্চ ক্ষমতাবান ব্যক্তি হিসেবে অবস্থান করতে থাকেন। শেষ পর্যন্ত সরকার ১৯৮৫ সালের মে মাসে উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান নির্বাচনের দিনধার্য করেন এবং সেদিন থেকে নির্বাচন অনুষ্ঠান শুরু হয়। দুটো পর্যায়ে এ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম পর্যায়ে ১৬ মে দেশে ৪৬০টি উপজেলার মধ্যে ২৫১টিতে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। মোট ১২৮৩ প্রার্থী এ নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। অবশ্য নির্বাচনের প্রথম পর্যায়ে দুটো উপজেলায় দুজন প্রার্থী বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হবার সুযোগ লাভ করেন। বাকি ২০৭টি উপজেলার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ২০ মে এবং তাতে মোট ১০৮৯ প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন।

Dhaka University Institutional Repository

উপজেলা নির্বাচনে বিভিন্ন কেন্দ্রে যদিও নির্বাচনী গোলযোগ, পুলিশের গুলিবর্ষণ, সংঘর্ষ ঘটে তবুও শেষ পর্যন্ত ২২ মের মধ্যে সব স্থগিত কেন্দ্রের ফলাফল ঘোষিত হয়ে যায়। মূলত এ নির্বাচন দলীয় ভিত্তিতে অনুষ্ঠিত না হলেও বেশকিছু প্রার্থী বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সাথে সম্পর্কযুক্ত ছিলেন।

বিভিন্ন উপজেলার ফলাফল বিশ্লিষ্টভাবে জরিপ করলে এটা স্পষ্ট হয়ে উঠে, শতকরা ৩৩ ভোটার প্রকৃতপক্ষে ভোট প্রদান করেন। প্রতিটি কেন্দ্রে গড়ে ২৫০০ জন ভোটার ছিলেন। গড় হিসেবে শতকরা ১৯ থেকে ৫০ ভাগ ভোটার ভোট প্রদান করেছিলেন।

গ. জাতীয় সংসদ নির্বাচন ৭ মে, ১৯৮৬ (The Jatio Sangsad, Election 7th May, 1986): গণভোট ও উপজেলা নির্বাচন সম্পন্ন হয়ে যাবার পর এরশাদ সরকার ১৯৮৫ সালের ৮ ডিসেম্বর জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করেন। সামরিক শাসন বিরোধী আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী বিভিন্ন রাজনৈতিক দল নির্বাচনের তারিখ সম্পর্কে প্রশ্ন তোলে। এদিকে সরকার বিরোধী রাজনীতিবিদদের নির্বাচনে অংশগ্রহণের জন্য আহ্বান জানান। কিন্তু ১৫ দলীয় ও ৭ দলীয় ঐক্য জোটসহ অন্যান্য কতিপয় বৃহৎ দল নির্বাচনের পক্ষে সাড়া দেয়নি। পক্ষান্তরে ৫ দফা দাবি তথা সার্বভৌম সংসদ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে তারা আন্দোলন অব্যাহত রাখে। তারা নির্দলীয় অন্তর্বর্তীকালীন সরকার প্রতিষ্ঠার সাথে সাথে সামরিক শাসন অবসানের দাবি উত্থাপন করে। ক্রমে এ আন্দোলন দুর্বার হয়ে উঠে। ঢাকাসহ দেশের প্রধান প্রধান শহরগুলোতে এক বিশেষ গতিবেগ লাভ করে। এ প্রেক্ষাপটে সরকার ১৯৮৬ সালের ২৬ এপ্রিল নির্বাচনের তারিখ পুনরায় ধার্য করেন এবং জোর দিয়ে বলেন, এবার যেকোনো অবস্থাতেই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।

উপরিউক্ত ঘোষণার প্রেক্ষিতে বিরোধী দলগুলো অভিযোগ করেন, সামরিক শাসনকে পাকাপোক্ত করার জন্যই জনমতকে উপেক্ষা করে সরকার সুষ্ঠু নির্বাচনের উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি না করেই একতরফাভাবে নির্বাচনের ঘোষণা প্রদান করেন। এ নির্বাচন মূলত 'নীল-নকশার নির্বাচন' এবং কাজেই এ ধরনের নির্বাচনে অংশ নেয়া তাদের পক্ষে কিছুতেই সম্ভব নয়। এমতাবস্থায় ২১ মার্চ (১৯৮৬) জাতির উদ্দেশ্যে এক বেতার ও টেলিভিশন ভাষণে রাষ্ট্রপতি সকল বিরোধী জোট ও দলকে সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণের আবেদন জানান এবং নির্বাচনের সুষ্ঠু পরিবেশ সৃষ্টির জন্য নিম্নোক্ত পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করেন (দেখুন, দৈনিক ইত্তেফাক, ২২ মার্চ)

Dhaka University Institutional Repository

অ. সামরিক সরকার নির্বাচন নির্দলীয় ও নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করবে;

আ. সামরিক আইন আদালত এবং আঞ্চলিক ও জেলা সামরিক প্রশাসকের দপ্তর বিলুপ্ত করা হবে

ই. মন্ত্রিপরিষদে কোনো রাজনৈতিক দলের সদস্য থাকতে পারবে না;

ঈ. নির্বাচনের পর জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশনের দিন থেকে সামরিক আইন প্রত্যাহার করা হবে;

উ. সংবিধান পুনর্বহাল করা হবে।

উক্ত ভাষণে রাষ্ট্রপতি আরো ঘোষণা করেন, নির্বাচনের তারিখ ২৬ এপ্রিল (১৯৮৬) পরিবর্তে অপর একটি সুবিধাজনক তারিখে ধার্য করা হবে। এরপরও যদি বিরোধী জোট ও দলগুলো নির্বাচনে অংশগ্রহণ না করেন এবং ৩১ মার্চের মধ্যে তাদের সুনির্দিষ্ট মতামত না দেন তাহলে সংসদ নির্বাচন অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত এবং সে সাথে সামরিক আইনের বিধি বিধান আরো কঠিনভাবে প্রয়োগ করা হবে বলে রাষ্ট্রপতি দ্ব্যর্থহীনভাবে ঘোষণা করেন।

রাষ্ট্রপতির এ ভাষণের গুরুত্ব উপলব্ধি করে ১৫ দলীয় ঐক্য জোটের প্রধান শরিকদল আওয়ামী লীগ নির্বাচনে অংশগ্রহণের সিদ্ধান্ত নেয়। সাথে সাথে জামায়াতে ইসলামী, মুসলিম লীগ, জাসদ প্রভৃতি দলও নির্বাচনে অংশ নেবে বলে ঘোষণা করে। পক্ষান্তরে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের বিএনপি নেতৃত্বে ৭ দলীয় ঐক্যজোট নির্বাচনে অংশগ্রহণের বিরুদ্ধাচরণ করে। এ জোট ক্ষমতাসীন সরকারের বিরুদ্ধে 'ডাইরেক্ট এ্যাকশনের' (Direct Action) ডাক দেয়। যাহোক শেষ পর্যন্ত বেশকিছু বিরোধী দলের অংশগ্রহণের নিশ্চয়তা সাপেক্ষে ১৯৮৬ সালের ৭ মে জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

Dhaka University Institutional Repository

জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল তাদের স্ব স্ব কর্মসূচি (প্রোগামস) জনসমক্ষে প্রচার করতে শুরু করে। এক্ষেত্রে ১৫ দলীয় ঐকজোটের পাঁচদফা দাবি সর্বাগ্রে লাভ করে। দফাগুলো ছিল নিম্নরূপ ঃ

১. সামরিক আইন প্রত্যাহার;

২. নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আওতায় সার্বভৌম জাতীয় সংসদের নির্বাচন;

৩. হৃত মৌলিক অধিকার পুনরুদ্ধারসহ বিচার বিভাগের স্বাধীনতা;

৪. রাজনৈতিক কারণে আটক, বিচারাধীন ও সামরিক আইনে দণ্ডিত সব রাজনৈতিক মামলা প্রত্যাহার;

৫. মধ্য ফেব্রুয়ারিতে সংঘটিতে ছাত্র হত্যার তদন্ত ও বিচার এবং নিহত আহতদের তালিকা প্রকাশ ও উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ প্রদান।

নির্বাচনী প্রচারাভিযানের উপরিউক্ত ৫ দফা দাবির সাথে আরো কয়েকটা দাবি সংযুক্ত করা হয় যেমন : চাল-ডালসহ নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের মূল্য হ্রাস, বন্যা ত্রাণের ক্ষেত্রে দুর্নীতি দূরীকরণ এবং ভাত ও কাজের সংস্থান সংক্রান্ত দাবি দেখুন : সাপ্তাহিক রোববার, ৩০ সেপ্টেম্বর, ১৯৮৬)। এদিকে জামায়াতে ইসলামীর নেতারা নির্বাচন সম্পর্কে তাঁদের স্বতন্ত্র অবস্থান সম্পর্কে প্রচার শুরু করেন। তাঁরা জোর দিয়ে বলেন, অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের নিশ্চয়তার জন্যই জামায়াতে ইসলামী একটা অরাজনৈতিক তত্ত্বাবধায়ক সরকার (নন পলিটিক্যাল কেয়ার টেকার গর্ভমেন্ট) গঠনের দাবি জানিয়ে আসছে। দশ দলীয় জোটের অন্যতম শরিক দল ডেমোক্রেটিক লীগ নেতারা নির্বাচনের প্রাক্কালে ঘোষণা প্রদান করেন, তাঁরা যেকোনো আগ্রাসন বিরোধী গণতান্ত্রিক শক্তির ঐক্যে বিশ্বাসী। তাঁরা জনগণকে আশ্বাস দিয়ে বলেন, ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হলে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ যেকোনো মূল্যে রক্ষা করা হবে। ৭ দলীয় ঐক্যজোট নির্বাচনের অংশ নেয়ার পূর্বশর্ত হিসেবে পাঁচ দফা জাতীয় দাবি মেনে নিলে বিএনপির নির্বাচনে যাবার পথে আর কোনো বাধা থাকবে না। যাহোক বিরোধী দল ও জোটগুলোর এসব কর্মসূচি ও দাবি দাওয়ার মধ্য দিয়ে অবশেষে ৭ মে (১৯৮৬) জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

Dhaka University Institutional Repository

১৯৮৬ সালের এ সংসদ নির্বাচনে ভোটারের সংখ্যা ৪,৭৮,৭৬,৯৭৯ জন; তারমধ্যে পুরুষ ভোটারদের সংখ্যা ছিল ২, ৫২,২৪,৩৮৫ জন এবং মহিলা ভোটারদের সংখ্যা ছিল ২,২৬,৫২,৪৯৪ জন। নির্বাচনে ৩০০টি আসনে ২১০৪ প্রার্থী মনোনয়নপত্র দাখিল করেন এবং চূড়ান্ত পর্যায়ে অংশ নেন ১,৫২৭ জন। জাতীয় পার্টি, আওয়ামী লীগ, জামায়াতে ইসলামী, বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টি, ন্যাপ (ভাসানী), ন্যাপ মোজাফফর), মুসলিম লীগ, জাসদ (রব) জাসদ (সিরাজ), বাকশাল, ওয়ার্কার্স পার্টি, প্রভৃতি দল এবং স্বতন্ত্র প্রার্থী বর্গ নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। নির্বাচনে জাতীয় পার্টি ১৫৩টি আসনে জয়লাভ করে। আওয়ামী লীগ লাভ করে ৭৬টি আসন। জামায়াতে ইসলামী লাভ করে ১০টি আসন এবং স্বতন্ত্র প্রার্থীগণ লাভ করে ৩২টি আসন। ৩০টি মহিলা সংরক্ষিত আসনের সবকটিই জাতীয় পার্টি লাভ করে। উল্লেখ্য, ৩৯টি দল ও উপদল কোনো আসন লাভ করতে সক্ষম হয়নি। যাহোক নির্বাচনী ফলাফল সুস্পষ্টভাবে নির্দেশ করে, ক্ষমতাসীন দল জাতীয় পার্টি সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। আওয়ামী লীগ, জামায়াতে ইসলামী ও অন্যান্য দল সমেত বিরোধী দল হিসেবে জাতীয় সংসদে স্থান লাভ করে। বলা বাহুল্য, সংসদ নির্বাচনের পর রাষ্ট্রপতি এরশাদ নিজেকে অপেক্ষাকৃত শক্তিশালী বলে মনে করেন এবং তাঁর সংসদ নির্বাচনের পর রাষ্ট্রপতি এরশাদ নিজেকে অপেক্ষাকৃত শক্তিশালী বলে মনে করেন এবং তাঁর সামরিক শাসনকে আরো অধিক পরিমাণে বৈধ করণের দিকে এগিয়ে নিতে সক্ষম হন।

ঘ. রাষ্ট্রপতি নির্বাচনী ঃ ১৫ অক্টোবর ১৯৮৬ (Presidential Election 15th October, 1986) : ১৯৮৬ সালের রাষ্ট্রপতি নির্বাচনকে জেনারেল এরশাদের শাসনামলকে বৈধ করার ক্ষেত্রে চতুর্থ নির্বাচনী প্রক্রিয়া বলে অভিহিত করা চলে। জাতীয় সংসদ নির্বাচনের প্রায় দু'মাস পর সংসদের অধিবেশন শুরু হলে প্রধান প্রধান বিরোধী দল ও জোটসমূহ তা বর্জন করেন। তাদের মূল দাবি ছিল সামরিক আইন প্রত্যাহার এবং অবিলম্বে গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা। কিন্তু এরশাদ সরকার রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের পূর্বে সামরিক শাসন প্রত্যাহার করা সম্ভব নয় বলে ঘোষণা দেন (দেখুন, দৈনিক ইত্তেফাক, ১১ জুলাই, ১৯৮৬)। তবে সরকার গণতন্ত্র পুন:প্রতিষ্ঠার আশ্বাস প্রদান করেন। এমতাবস্থায় আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে গঠিত ৮ দলীয় জোট নির্বাচন বর্জনের সিদ্ধান্ত নেয়। সাথে সাথে বিএনপির নেতৃত্বে ৭ দলীয় জোটও নির্বাচন বর্জনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। উভয় জোটই নির্বাচন অনুষ্ঠানের দিন (১৫ অক্টোবর) হরতাল পালনের জন্য জনগণের কাছে আহ্বান জানায়।

Dhaka University Institutional Repository

কিন্তু সরকার নির্ধারিত তারিখে নির্বাচন অনুষ্ঠানে অটল থাকেন। নির্বাচনের তারিখ যতই নিকটবর্তী হতে থাকে সরকারে ততই এর স্বপক্ষে জনমতকে প্রভাবিত করার সকল কৌশল ও উপায় কাজে লাগাতে থাকেন। সরকারি দল ও ব্যক্তিবর্গ দেশের বিভিন্ন স্থানে সভা সমাবেশ অনুষ্ঠান করে এরশাদের গুণাবলী কীর্তন করতে থাকেন। প্রধানমন্ত্রী মিজানুর রহমান চৌধুরীর গণতন্ত্র উত্তরণের প্রক্রিয়া সমাপ্ত করার জন্য জনসাধারণের প্রতি রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে অংশগ্রহণের আহ্বান জানান। (দেখুন, দৈনিক ইত্তেফাক, ১ অক্টোবর, ১৯৮৬)।

এদিকে বিরোধী দল ও জোটসমুহের নির্বাচনবিরোধী কর্মতৎপরতা যখন তুঙ্গে তখন সরকার ১৩ অক্টোবর (১৯৮৬) ৮ দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনা ওয়াজেদ এবং ৭ দলীয় নেত্রী বেগম খালেদা জিয়াকে তাঁদের স্ব স্ব বাসভবনে অন্তরীণ রাখেন। সে সাথে আরো কতিপয় বিরোধী দলীয় নেতাকে গ্রেফতার করেন। জামায়াতে ইসলামসহ কোনো বিরোধী দলই পুলিশী তৎপরতার মুখে জনসভার আয়োজন করতে ব্যর্থ হয়। অবস্থার প্রেক্ষিতে জনমনে নির্বাচন অনুষ্ঠানের প্রশ্নে সন্দেহ দেখা দেয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও সরকার নির্বাচন অনুষ্ঠানের ব্যাপারে অটল থাকেন এবং শেষ পর্যন্ত ১৫ অক্টোবর (১৯৮৬) নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়ে যায়।

সরকারি দল জাতীয় পার্টি, হুসেইন মোহাম্মদ এরশাদকে রাষ্ট্রপতি পদপ্রার্থী হিসেবে মনোনয়ন দান করে। মাওলানা মোহাম্মদ উলাহ হাফেজ্জী হুজুর ছিলেন বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলনের প্রার্থী। লে. কর্নেল (অব.) সৈয়দ ফারুক রহমান ছিলেন, আগস্ট বিপব বাস্তবায়ক পরিষদের প্রার্থী। অন্যান্য প্রার্থীরা ছিলেন মোঃ জহির খান, মাওলানা খায়রুল ইসলাম যশোরী, স্কোয়াড্রন লিডার (অব.) মোয়াজ্জম হোসেন চৌধুরী, অলিউল ইসলাম সুরুজ মিয়া, খলিলুর রহমান মজুমদার, আনসার আলী, মোঃ আবদুস সামাদ, মেজর (অব.) আফসার উদ্দীন এবং সৈয়দ মনিরুল হুদা চৌধুরী।

প্রার্থীদের সবাই নির্বাচনের প্রাক্কালে তাঁদের স্ব স্ব কর্মসূচি এবং নির্বাচিত এবং হবার পর তাঁরা দেশের ও দশের কল্যাণের জন্য কি কি কাজ করবেন সে বিষয়ে জনগণকে মোটামুটি একটা ধারণা প্রদান করেন। তবে দেশে গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠা ও সমাজ দেহ হতে দুর্নীতি দূর করাই ছিল প্রার্থীদের মূল বক্তব্য। প্রার্থীদের প্রায় সবাই স্থানীয় পর্যায়ে প্রশাসন ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজাবার ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

১৯৮৬ সালের তৃতীয় রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে জাতীয় পার্টির পদপ্রার্থী হুসেইন মোহাম্মদ এরশাদ বিপুল ভোটাধিক্যে জয়লাভ করেন। বাকি ১১জন প্রার্থী তাঁর তুলনায় নগণ্য সংখ্যক ভোট লাভ করেন। সর্বমোট ভোটারের সংখ্যা ছিল ৪ কোটি ৭৯ লক্ষ ১২ হাজার ৪৪৩ জন। তন্মধ্যে

Dhaka University Institutional Repository

রাষ্ট্রপতি এরশাদ লাভ করেন ২,১৭,১৭,৭৪৪ ভোট। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী মাওলানা মোহাম্মদ উলাহ হাফেজ্জী হুজুর লাভ করেন ১৪,৭৮,৯৩০ ভোট মাত্র। তৃতীয় সর্বাধিক ভোট লাভ করেন লে. কর্নেল (অব.) সৈয়দ ফারুক রহমান (দেখুন, দৈনিক ইত্তেফাক, ১৭ ও ২১ অক্টোবর, ১৯৮৬।) প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, সরকার এ নির্বাচন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তাদের শাসনামলে সম্পূর্ণরূপে বেসামরিকীকরণ করতে সক্ষম হন।

১৯৮৬ সালের সংসদ নির্বাচনের ফলাফল

দলের নাম	আসন সংখ্যা
জাতীয় পার্টি	১৫৩
বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	৭৬
জামায়াতে ইসলামী	১০
বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টি (সিপিবি)	৫
ন্যাশনাল আওয়ামী লীগ	৫
মুসলিম লীগ	৪
জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (রব)	৪
জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (সিরাজ)	৩
বাকশাল	৩
ওয়ার্কার্স পার্টি	৩
ন্যাপ (মোঃ)	২
স্বতন্ত্র	৩২
মোট	৩০০

সারণীতে দেখা যাচ্ছে যে, ১৯৮৬ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচনে এরশাদের সমর্থনপুষ্ট জাতীয় পার্টি সর্বাধিক সংখ্যক আসন পেয়ে বিজয়ী হয়। এরপর জাতীয় সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠ দল জাতীয় পার্টি কর্তৃক ৩০টি মহিলা সদস্যের আসন পূরণ করা হয়। নির্বাচনের ফলাফল ঘোষিত হলে বিরোধী দলসমূহ এ নির্বাচনকে প্রহসনমূলক নির্বাচন বলে আখ্যায়িত করেন। এ নির্বাচনে ব্যাপক সন্ত্রাস সৃষ্টি এবং 'ভোট ডাকাতির' অভিযোগ উত্থাপিত হয়। আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা এ নির্বাচনকে প্রহসনমূলক ও ভোট ডাকাতির নির্বাচন বলেই ক্ষান্ত হননি। তিনি অভিযোগ করেন, 'মিডিয়া ক্যু' করে সরকার এ নির্বাচনে জয়যুক্ত হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

৬. ৩রা মার্চ (১৯৮৮)-এর জাতীয় সংসদ নির্বাচন এবং এর ফলাফল (The Jatio Sangsad Election of 3rd March, 1988 and its Results) : ১৯৮৮ সালের ৩ মার্চের জাতীয় সংসদ নির্বাচন ছিল মূলত; একটা গ্রহসনমূলক নির্বাচন। এ নির্বাচনে দেশের বৃহত্তর রাজনৈতিক দল ও জোটসমূহ অংশগ্রহণ করা থেকে বিরত থাকে। ৮ দল, ৭ দল, ৫ দলীয় জোট এবং জামায়াতে ইসলামী নির্বাচনে অংশ নেয়নি। বরং তারা নির্বাচনের দিন ৩৬ ঘণ্টা সরকার ও নির্বাচন বিরোধী কর্মসূচি ঘোষণা করে এবং জনগণকে তাদের আন্দোলন অব্যাহত রাখার আহ্বান জানান।

এতদসত্ত্বেও নির্ধারিত দিনে জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী দলগুলো হচ্ছে- এরশাদের জাতীয় পার্টি, আসম আব্দুর রবের নেতৃত্বে সম্মিলিত বিরোধী দল, ফ্রিডম পার্টি, জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (সিরাজ), খেলাফত আন্দোলন, গণতন্ত্র, বাস্তবায়ন পার্টি এবং জনদল। এছাড়া কিছুসংখ্যক স্বতন্ত্র প্রার্থী এতে অংশ নেন। উল্লেখ্য, এ নির্বাচনে জাতীয় পার্টি ২৯৯টি আসনে প্রার্থী মনোনয়ন দান করে, সম্মিলিত বিরোধী দল ২৭২টি আসনে ফ্রিডম পার্টি ১১১টি আসনে (সিরাজ) ৫৬ আসনে এবং অন্যান্য দল মুষ্টিমেয় কয়েকটা আসনে প্রার্থী দাঁড় করায়।

নির্বাচনের ফলাফলের দিকে তাকালে দেখা যায়, ৩রা মার্চ ২৮১টি আসনের জন্য ২২ হাজার ভোটকেন্দ্র ভোট গ্রহণ করা হয়। ৩০০ সাধারণ আসন বিশিষ্ট জাতীয় সংসদের ১৮টি আসনে জাতীয় পার্টির প্রার্থীরা বিনাপ্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হন। অপর ১টি আসনে একজন প্রার্থীর মৃত্যু হওয়ায় নির্বাচন বন্ধ রাখা হয়। নির্বাচন কমিশনের বেসরকারি ফলাফল অনুযায়ী জাতীয় পার্টি ২৮১ আসনের মধ্যে ২৩৮টি আসন লাভ করে। সম্মিলিত বিরোধী দল ১৫টি ফ্রিডম পার্টি ও জাসদ (সিরাজ) ২টি করে আসন লাভ করে এবং স্বতন্ত্র প্রার্থীরা পায় ২২টি আসন (দেখুন, দৈনিক ইত্তেফাক, ৬ই মার্চ ১৯৮৮)।

নির্বাচন কমিশন কতিপয় ভোটকেন্দ্র ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত না হওয়ায় ৪৫টি আসনে নির্বাচন স্থগিত রাখেন। কমিশন জানান যে, ৪৫টি আসনের মধ্যে ৪১টি আসনের অধিকাংশ ভোটকেন্দ্রের ফলাফল পাওয়া যায়। বিধায় ১৯৭২ সালের রাজপ্রতিনিধিত্ব আদেশ অনুসারে এগুলোর ফলাফল ঘোষণা করা যায়। কমিশন আরো জানান, ৪টি আসনের ৭৬টি ভোটকেন্দ্রে পুনরায় ভোটগ্রহণ করা হবে। শেষ অবধি নির্বাচনের চূড়ান্ত সরকারি ফলাফলে দেখা যায়,

Dhaka University Institutional Repository

জাতীয় পার্টি সর্বাধিক সংখ্যক আসন লাভ করে এবং স্বতন্ত্র প্রার্থীগণ পায় ২৫টি আসন। নিচের ছকে নির্বাচনী ফলাফল আরো সুস্পষ্টভাবে দেখানো হলো ঃ-

১৯৮৮ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ফলাফল

দলের নাম	প্রাপ্ত আসন
জাতীয় পার্টি	২৫১
সম্মিলিত বিরোধী দল	১৯
ফ্রিডম পার্টি	২
জাসদ (সিরাজ)	৩
স্বতন্ত্র	২৫
	মোট = ৩০০ আসন

উৎস ঃ সাপ্তাহিক বিচিত্রা, ৪১ সংখ্যা, মার্চ ১৯, ১৯৮৮ নির্বাচনী ফলাফল বিশেষণ করলে এটা স্পষ্ট হয়ে উঠে যে, এ নির্বাচনে জনদল, খেলাফত আন্দোলন এবং গণতন্ত্র বাস্তবায়ন পার্টি কোনো আসন লাভে সক্ষম হয়নি। অবশ্য জাতীয় পার্টি তিন চতুর্থাংশেরও বেশি সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়ে বিপুল ভোটাধিক্যে জয়যুক্ত হয়।

৩। দল গঠন প্রক্রিয়া ঃ জাতীয় পার্টি গঠন (Process of Party Building : Foundation of the Jatio Party) ঃ ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হবার দেড় বছর পরেই জেনারেল হুসেইন মোহাম্মদ এরশাদ তাঁর সরকারকে বৈধ করার জন্য নির্বাচন ও দল গঠনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন এবং সেদিকে লক্ষ্য রেখেই পর্যায়ক্রমে নির্বাচন ও দল গঠনের দিকে অগ্রসর হতে থাকেন। ইতোপূর্বে আমরা এরশাদ শাসনামলে বিভিন্ন পর্যায়ের নির্বাচন সম্পর্কে আলোচনা করেছি। এখন আমরা আমাদের আলোচনা তাঁর দল গঠন প্রক্রিয়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখব।

গোড়াতেই যেটা জনদল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছিল সেটাই পরবর্তী পর্যায়ে জাতীয় পার্টি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৮৩ সালের ২৭ নভেম্বর জনদলের নাম ঘোষণা করা হয়েছিল কিন্তু দু'বছরেরও কম সময়ের মধ্যে অভ্যন্তরীণ মতানৈক্য ও কোন্দলকে কেন্দ্র করে তা নতুন নামে ১৯৮৬ সালের ১ জানুয়ারি জাতীয় পার্টি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। জন্মলগ্নে জাতীয় পার্টির ২১

Dhaka University Institutional Repository

সদস্য বিশিষ্ট সভাপতিমণ্ডলীর এবং ৫৭ সদস্যবিশিষ্ট জাতীয় পার্টির নির্বাহী কমিটির ঘোষণা করা হয়। মিজানুর রহমান চৌধুরীকে দলীয় সভাপতিমণ্ডলীর এক নম্বর সদস্য এবং ডা. এমএ মতিনকে এর সেক্রেটারি জেনারেল করা হয়। দলের জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য সচিব হন আনোয়ার জাহিদ।

এভাবে দল গঠনের পর দলের আদর্শ ও কর্মসূচি জনগণের সামনে তুলে ধরে জাতীয় পার্টির পক্ষ থেকে দেশের সব জাতীয়তাবাদী, গণতন্ত্রকামী, দেশপ্রেমিক দল ও ব্যক্তিবর্গকে পার্টির ছাতাকাতলে সমবেত হবার জন্য আহ্বান জানানো হয়। ক্রমে দলের সমর্থনের ভিত্তি সুদৃঢ় হতে থাকে।

এরশাদ সরকারের মূল্যায়ন :

১৯৮২ সালে ২৪ মার্চ সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে দেশ সামরিক শাসন জারি করেন লে. জেনারেল হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ। যদিও ক্ষমতা দখলের পূর্বে তিনি দেশের বিরাজমান অবস্থার বিবরণ দেন। বিশেষ করে বিএনপির অভ্যন্তরীণ মতানৈক্য ও কোন্দল, অর্থনৈতিক চরম সংকট, সর্বব্যাপী দুর্নীতি, আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির চরম অবনতি দেশের মানুষের জীবনযাত্রা বিপন্ন করে তুলেছিল। অতঃপর ক্ষমতা দখল করে সরকারের প্রাথমিক লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য স্থির করার পর লে. জেনারেল হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ জনগণের মুক্তি অর্জনের লক্ষ্যে তাঁর সরকারের ১৮ দফা কর্মসূচি ঘোষণা করেন। যাকে তিনি কৃষক, শ্রমিক ও মেহনতি মানুষের 'মুক্তির সনদ' বলে উল্লেখ করেন। অতঃপর বেসামরিক প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে ২১ মার্চ ১৯৮৫ সমগ্র বাংলাদেশে গণভোট অনুষ্ঠান করেন। ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণের অংশ হিসেবে মহকুমাকে জেলায় উন্নীত করা হয়। উপজেলা ব্যবস্থার প্রবর্তন করা হয় এবং নির্বাচিত উপজেলা চেয়ারম্যানের অধীনে উপজেলার সমস্ত কর্মকাণ্ড পরিচালিত করা হয় যা গ্রাম উন্নয়নে প্রাণের ছোঁয়া লাগায়। এরপর ৭ম জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ১৯৮৬ সালে। ইতোপূর্বে জাতীয় পার্টি নামে একটি রাজনৈতিক দলও গঠন করা হয়। জাতীয় পার্টির ব্যানারে ১৯৮৬ সালের ১৫ অক্টোবর রাষ্ট্রপতি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এবং লে. জেনারেল হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ বিপুল ভোটে নির্বাচত হন। কিন্তু তিনি বিরোধী রাজনৈতিক দল ও জোটসমূহের আস্থা অর্জন করতে পারেনি। ফলে রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা, হরতাল, অবরোধ চলতেই থাকে। বিশেষ পরিস্থিতি ১৯৮৬-এর নির্বাচিত সংসদ ভেঙ্গে দিয়ে ৩রা মার্চ ১৯৮৮ জাতীয় সংসদ

Dhaka University Institutional Repository

নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলো প্রধান বিরোধী রাজনৈতিক দরও জোটের অংশগ্রহণ ব্যতিরেখে। ফলে রাজনৈতিক অস্থিরাতা আরও বেড়ে যায়। এর ফলে ১৯৯০ সালের ৬ই ডিসেম্বর হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদের পদত্যাগের মাধ্যমে এরশাদ সরকারের শাসনামলের অবসান হয়। যদিও এরশাদ শাসনামলে উপজেলা, গুচ্ছ গ্রাম, ভূমি সংস্কার, যোগাযোগ ব্যবস্থাসহ বেশকিছু উন্নয়ন কার্যক্রম গৃহীত হয়েছিল। কিন্তু রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার কারণেই সবই ম্লান হয়ে যায়। দেশের সামগ্রিক উন্নয়ন ব্যাহত হয়। হরতাল, অবরোধের কারণে অর্থনীতির চাকা গতিশীল যেমন- গতিশীল হতে পারেনি। তেমনি রাজনৈতিক উন্নয়ন ব্যাহত হয়েছে বিপুলভাবে।

Dhaka University Institutional Repository

বেগম খালেদা জিয়ার শাসনামল[৭]

১৯৯১ সালের পঞ্চম জাতীয় সংসদ নির্বাচন (Fifth Jatiyo Sangsad Election 1991) ঃ ১৯৯০-এর গণআন্দোলনের তাৎক্ষণিক ফসল নির্দলীয় এবং নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ অবাধ ও নিরপেক্ষভাবে পঞ্চম জাতীয় সংসদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ১৯৯১ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি তারিখে। স্বাধীন নির্বাচন কমিশনের সরাসরি নিয়ন্ত্রণে রাজনৈতিক দলসমূহের জন্য অনুসরণীয় আচরণবিধি মোতাবেক কঠোর নিয়ম শৃঙ্খলার মধ্যদিয়ে বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনাসহ সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

পঞ্চম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ৭৬টি রাজনৈতিক দল অংশগ্রহণ করে। এছাড়া স্বতন্ত্র প্রার্থী ছিলেন অনেক। নির্বাচনে প্রার্থীর সংখ্যা ছিল ২,৭৭৪ জন। ভোটদাতার সংখ্যা ছিল সাড়ে ছয় কোটির ওপর (তবে ভোটদান করে ৩,৩০,৯৯,৫৬০ জন)। জাতীয় সংসদের সরাসরি প্রতিদ্বন্দ্বিতার ৩০০টি আসনের (মহিলা সদস্যসহ জাতীয় সংসদের মোট আসন ৩৩০টি) এর মধ্যে ২৯৮টি আসনে প্রার্থীর মৃত্যুর কারণে ২টি আসনে নির্বাচন স্থগিত থাকে। নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় নির্ধারিত তারিখে। এ নির্বাচনে শতকরা ৫২.৩৭ ভাগ ভোটদাতা ভোটদান করেন। দলগতভাবে জাতীয়তাবাদী দল প্রদত্ত ভোটের শতকরা ৩১.৪৪ ভাগ এবং আওয়ামী লীগ শতকরা ৩১.১৩ ভাগ ভোট লাভ করে। একাধিক আসনে জয়ী প্রার্থীদের পরিত্যক্ত এবং মৃত্যুর কারণে শূন্য হওয়া ১১টি ১৬৯টি আসন লাভ করে সংসদে একক সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের মর্যাদা লাভ করে। আওয়ামী লীগ ৮৮টি আসন লাভ করে বৃহত্তম বিরোধী দল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে।

১৯৯১ সালের ৯ মার্চ সংসদের ৪টি আসনের স্থগিত কেন্দ্রগুলোতে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এর মধ্যে আওয়ামী লীগ ৩টিতে এবং বিএনপি ১টিতে জয়লাভ করে। ১১ মার্চ ১৯৯১ জামায়াতের এক প্রতিনিধি দল অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সাহাবুদ্দীন আহম্মদের সঙ্গে সাক্ষাত করে বিএনপিকে সমর্থন দানের কথা ব্যক্ত করেন। ১৯৯১ এর ১৪ মার্চ মুন্সিগঞ্জ ৩ আসনে উপনির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে বিএনপি প্রার্থী বিজয়ী হন। নিচের সারণির মাধ্যমে পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন দলের প্রাপ্ত আসনগুলো দেখানো হলো।

৭। চৌধুরী, হাসানুজ্জামান, ১৯৯১ এবং ১৯৯২ (দ্রষ্টব্য গ্রন্থপঞ্জী)

Dhaka University Institutional Repository

১৯৯১ সালের সংসদ নির্বাচনের ফলাফল

রাজনৈতিক দল	নির্বাচিত আসন	সংরক্ষিত আসন	মোট
বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)	১৪১	২৮	১৬৯
আওয়ামী লীগ	৮৮	--	৮৮
জাতীয় পার্টি	৩৫	--	৩৫
জামায়াতে ইসলামী	১৮	২	২০
বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টি	৫		৭
বাকশাল	৪	--	৪
জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল	১	--	১
গণতন্ত্রী পার্টি	১	--	১
বাংলাদেশ ওয়ার্কার্স পার্টি	১	--	১
ইসলামী ঐক্যজোট	১	--	১
বাংলাদেশ ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (মোজাঃ)	১	--	১
ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক পার্টি (এনডিপি)	১	--	১
স্বতন্ত্র	৩	--	৩
সর্বমোট	৩০০	৩০	৩০০

২. বিএনপির সরকার গঠন (Formation of Government by the BNP) : ১৯৯১ সালে জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে বিজয়ী হয়। নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করতে পারেনি। আর সে কারণেই এর প্রধান রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বী আওয়ামী লীগ বিএনপির সরকার গঠনের দাবিকে অঙ্গীকার করে। আওয়ামী লীগ দাবি জানায় বিএনপির সংসদীয় সরকার গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ করার পরই কেবল অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সার্বভৌম সংসদের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তর করতে পারেন। এদিকে বিএনপি সংসদীয় সরকারের প্রশ্নে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করেই সরকার গঠনের উদ্যোগ নিতে সবিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করে। আওয়ামী লীগ নেত্রী শেখ হাসিনা ঘোষণা করেন, বিএনপি নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ না করায় বিএনপির সরকারের কোনো অধিকার নেই। বিএনপির সরকার গঠন করলে আওয়ামী লীগ আন্দোলন করবে বলে হুমকি দেয়। শেষ পর্যন্ত অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি ১৯ মার্চ ব্যাপক আলাপ

Dhaka University Institutional Repository

আলোচনার মাধ্যমে সকল রাজনৈতিক দলগুলো জরুরি ভিত্তিতে সরকার গঠনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করতে সম্মত হন। ওইদিনই রাষ্ট্রপতি জাতীয় সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলীয় নেত্রী বেগম খালেদা জিয়াকে প্রধানমন্ত্রী নিয়োগের ঘোষণা দেন। তিনি বিএনপি সংসদ সদস্যদের মধ্য থেকে ১১ জনকে মন্ত্রী ও ২১ জনকে প্রতিমন্ত্রী নিয়োগ করে একটি মন্ত্রিপরিষদ গঠন করেন। ২০ মার্চ বেগম খালেদা জিয়া বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন। প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পরপরই তিনি গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা ও বাংলাদেশের স্বাধীনতা এবং সার্বভৌমত্ব রক্ষার জন্য সকল মহলের সহযোগিতা কামনা করেন।

৩. সংসদীয় গণতন্ত্রের উত্তরণ প্রক্রিয়া (The Process of Transition of Democracy) : বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম চলাকালে রাষ্ট্রপতি পদ্ধতির সরকারি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হলেও, স্বাধীনতোত্তর বাংলাদেশে রাজনৈতিক জীবন আরম্ভ হয়। সংসদীয় ব্যবস্থার ভিত্তিতেই প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর পরই খালেদা জিয়া সাংবাদিকদের এক সাক্ষাতকারে ঘোষণা করেন, তিনি সংসদীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য দৃঢ় সংকল্প। নির্বাচনে জয়লাভের পর পরই অবশ্য তিনি ঘোষণা করেন যে তার দলের জন্য লক্ষ্য হলো স্বাধীন পররাষ্ট্রনীতি, দুর্নীতিমুক্ত সরকার প্রতিষ্ঠা, অর্থনৈতিক উন্নয়ন, খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন এবং সন্ত্রাস পাচার ও হত্যার অভিযোগে এরশাদের বিচার করা।

অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি ইতিমধ্যেই জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশন ৫ এপ্রিল আহ্বান করেন। নির্ধারিত তারিখে সংসদে অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। উদ্বোধনী অধিবেশনে তিনি অতি শিগগিরই রাষ্ট্রপতি দায়িত্বভার থেকে অব্যাহতি লাভের ইচ্ছা প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, সংবিধানানুযায়ী বাংলাদেশে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন ২৩ এপ্রিল থেকে ২২ অক্টোবরের মধ্যে হতে হবে। কিন্তু সংবিধান সংশোধন করে সংসদীয় শাসনব্যবস্থা চালু হলে দেড় মাসের মধ্যেই রাষ্ট্রপতি নির্বাচন সম্ভব হতে পারে। প্রথম অধিবেশনে বিএনপি প্রার্থী আব্দুর রহমান বিশ্বাস স্পিকার পদে জাতীয় সংসদে এবং শেখ রাজ্জাক আলী ডেপুটি স্পিকার পদে নির্বাচিত হন। সংসদ অধিবেশনের দ্বিতীয় দিনে জাতীয় সংসদে নবনির্বাচিত সকল সদস্য সংসদ ভবনের শপথ গ্রহণ করেন। সংসদের প্রথম অধিবেশন প্রায় ৪১ দিন স্থায়ী হয়। সংসদের প্রথম অধিবেশণ চলাকালীন বাংলাদেশের নেমে আসে প্রাকৃতিক দুর্যোগ। ২৯ এপ্রিল প্রচণ্ডতম ঘূর্ণিঝড়ে ও প্রবল জলোচ্ছ্বাসে উপকূলীয় অঞ্চলে দুই লক্ষাধিক লোকের মৃত্যু ঘটে। ৩০ এপ্রিল খালেদা জিয়া উপকূলীয় এলাকায় পরিদর্শন করেন। সরকার দেশে ও বিদেশে সর্বাত্মক ত্রাণ ও পুনর্বাসন তৎপরতার

Dhaka University Institutional Repository

জন্য সাহায্যের আবেদন জানায়। ঘূর্ণিঝড়, ঈদ প্রভৃতি কারণে সংসদের অধিবেশনে ২২ দিন মূলতবি থাকে।

১১ জুন থেকে জাতীয় সংসদের বাজেট অধিবেশন শুরু হয়। ওই অধিবেশনের শুরুতেই অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি তার পদ থেকে তাকে অব্যাহতি দেয়ার অনুরোধ জানান। ২০ জুন সংসদে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের পক্ষ থেকে ঘোষণা করা হয় যে ঈদের পর ২৯ জুন সংসদে সরকারি পদ্ধতি পরিবর্তনের জন্য বিল পেশ করা হবে। সংসদীয় পদ্ধতি চালু হলে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি তার পদ থেকে অব্যাহতি পাবেন। ২ জুলাই প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া সরকার পদ্ধতি পরিবর্তন সংক্রান্ত দ্বাদশ সংশোধনী বিল সংসদে উত্থাপন করেন। ওইদিনই আইন ও বিচারমন্ত্রী মির্জা গোলাম হাফিজ রাষ্ট্রপতির পূর্বপদে ফিরে যাওয়া সংক্রান্ত একাদশ সংশোধনী বিল উত্থাপন করেন। ২ দিন পর ৪ জুলাই বিরোধী দল আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকেও সংসদীয় সরকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে একটি বিল উত্থাপন করা হয়। উভয় দলের প্রস্তাবে কিছু মৌলিক পার্থক্য থাকায় সমঝোতার ভিত্তিতে একটি বাছাই কমিটি গঠন করা হয়। ২৮ জুলাই বাছাই কমিটি বিলটি সংসদে পেশ করে। বাছাই কমিটির সমঝোতায় বিলটি নিম্নরূপ ঃ

প্রথমত-বিএনপি প্রস্তাব করেছিল মন্ত্রিসভা গঠনে সরকার শতকরা ২০ ভাগ সংসদের বাইরে নিতে পারবে। বিরোধী দলের আপত্তির কারণে তা কমিয়ে শতকরা ১০ ভাগ করা হয়।

দ্বিতীয়ত-বিএনপির প্রস্তাবিত বিলে বলা হয়েছিল কোনো সদস্য ফ্লোর ক্রসিং করলে সংসদে তার সদস্যপদ খারিজ হবে এবং ৫ বছরের জন্য নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারবেন না। বাছাই কমিটি ৫ বছরের জন্য নির্বাচনের অযোগ্য বিধানটি রদ করে।

তৃতীয়তা- বিএনপি প্রস্তাব করেছিল সংসদের স্পিকার রাষ্ট্রপতি নির্বাচন পরিচালনা করবে। বাছাই কমিটি আওয়ামী লীগ প্রস্তাবিত নির্বাচিত কমিশন কর্তৃক রাষ্ট্রপতি নির্বাচন পরিচালনার বিধান করে।

সমঝোতার মাধ্যমেই বাছাই কমিটি বিলটি উত্থাপন করলেও ওই বিলে পাসের ক্ষেত্রে অনিশ্চয়তা দেখা দেয়। কারণ একই সাথে আওয়ামী লীগ ইনভেমনিটি আইন উত্থাপনের দাবি জানায়। অবশেষে সকল রকম সংশয়, দ্বিধা ও মতবিরোধের অবসান ঘটিয়ে আগস্ট মাসে দ্বাদশ সংশোধনী বিল পাস হয়। জাতীয় সংসদে ওই ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তের মধ্যদিয়ে সাড়ে ১৬

Dhaka University Institutional Repository

বছর পর বাংলাদেশে সংসদীয় গণতন্ত্র পদ্ধতির সরকার প্রতিষ্ঠিত হলো। একই সাথে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সাহাবুদ্দীন আহম্মদ পূর্বপদে ফিরে যাওয়ার বিধান সম্বলিত একাদশ সংশোধনী বিলটিও পাস হয়। দ্বাদশ সংশোধনী বিলে ৩০৭ জন উপস্থিত সংসদ সদস্যের মধ্যে সবাই একমত হয়ে ভোট দেন। একাদশ সংশোধনী বিলে জাতীয় পার্টি ও এলডিপি ভোটদান থেকে বিরত থাকে। সংসদে ওই সমঝোতা ও সহযোগিতার পরিবেশের মধ্যে পরের দিন বিনা বিতর্কে গণভোট বিলও পাস হয়। এ ব্যবস্থা অনুযায়ী সংসদে পাস হওয়া দ্বাদশ সংশোধনী বিলের ওপর গণভোট গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। ১৫ সেপ্টেম্বর গণভোট অনুষ্ঠিত হয়। সংসদীয় পদ্ধতির পক্ষে 'হ্যাঁ' ভোট পড়ে ৮৪ দশমিক ৪২ শতাংশ। 'না' ভোট দেশে হ্যাঁ ভোট পড়ে ১ কোটি ৬৩ লক্ষ ৪২ হাজার ৮৮২টি। না ভোট পড়ে ৩৩ লক্ষ ৮৫ হাজার ৭১৫টি। ভোট বাতিল হয় ১ লক্ষ ৯০ হাজার ৪০৮টি। ১৮ সেপ্টেম্বর অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সংবিধানের একাদশ ও দ্বাদশ বিলে সম্মতি প্রদান করেন। সংসদীয় সরকারের প্রধান হিসেবে প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া ১৯ সেপ্টেম্বর শপথ গ্রহণ করেন।

একাদশ ও দ্বাদশ সংশোধনী পাস হওয়ার ফলে নতুন রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। সেজন্য প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের তারিখ ৮ অক্টোবর ঘোষণা করা হয়। ২৫ সেপ্টেম্বর ছিল মনোনয়নপত্র পেশের শেষ তারিখ। বিএনপির পক্ষ থেকে আব্দুর রহমান বিশ্বাসকে মনোনয়ন দেয়া হয়। আওয়ামী লীগ মনোনয়ন দেয় সাবেক বিচারপতি বদরুল হায়দার চৌধুরীকে। ৮ অক্টোবর অনুষ্ঠিত নির্বাচনে বিএনপি প্রার্থী আব্দুর রহমান বিশ্বাস আওয়ামী লীগ প্রার্থী বিচারপতি বদরুল চৌধুরীকে ১৯৭২-৯২ ভোটের ব্যবধানে পরাজিত করে বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন। ৩৩০ জন সংসদ সদস্যদের মধ্য থেকে মোট ২৬৪ সংসদ সদ্য প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে। নবনির্বাচিত রাষ্ট্রপতি আব্দুর রহমান বিশ্বাস সুপ্রিমকোর্টের অস্থায়ী প্রধান বিচারপতি হাবিবুর রহমানের কাছে শপথ গ্রহণ করেন।

আব্দুর রহমান বিশ্বাস আনুষ্ঠানিকভাবে রাষ্ট্রপতির দায়িত্বভার গ্রহণের পর বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহম্মদ অস্থায়ী রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব থেকে অবসর গ্রহণ করেন এবং তাঁর পূর্বপদ সুপ্রিমকোর্টের প্রধান বিচারপতি হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। সংসদীয় গণতন্ত্রে উত্তরণ প্রক্রিয়ার সমাপ্তি ঘটে। অবশ্য এর সার্থকতা নির্ভর করবে বাংলাদেশের ভবিষ্যত রাজনীতির গতিধারার ওপর।

Dhaka University Institutional Repository

৪. গণভোট ১৯৯১ : বাংলাদেশের সংবিধানের ৪৮ নং ধারা অনুযায়ী রাষ্ট্র কাঠামো, সরকার ব্যবস্থার প্রকৃতি ও রাষ্ট্রীয় মূলনীতি সংক্রান্ত বিষয়ে কোনো সংশোধনী প্রস্তাব জাতীয় সংসদ কর্তৃক পাস হলে তা রাষ্ট্রপতি স্বাক্ষর করবেন কি না, এজন্য 'গণভোট' আয়োজন করা হয়। ১৯৯১ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পর বিএনপি সংসদে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। সংসদে নির্বাচিত সকল দলের সদস্যদের ঐকমত্যে দ্বাদশ সংশোধনী বিল পাস হয়। উক্ত পাসকৃত বিলে প্রেসিডেন্ট অনুমোদন দেবেন কি না তা জানার উদ্দেশে এক সপ্তাহের মধ্যে গণভোটের তারিখ ঘোষণার জন্য নির্বাচন কমিশনকে প্রেসিডেন্ট নির্দেশ দেবেন এবং নির্বাচন কমিশন ৪০ দিনের মধ্যে (প্রস্তাবিত গণভোট বিল অনুযায়ী) এ গণভোট অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করবেন এবং গণভোটে ভোটারগণ দ্বাদশ সংশোধনী বিলের পক্ষে রায় দিলে প্রেসিডেন্ট বিলটি অনুমোদন করবেন বিধায় ১৯৯১ সালের ১৫ সেপ্টেম্বর নির্বাচন কমিশন কর্তৃক দেশব্যাপী গণভোটের দিনধার্য করা হয়। উক্ত গণভোটে 'হ্যাঁ' এবং 'না' সূচক ভোটের ভিত্তিতে ভোট গ্রহণ করা হয়। 'হ্যাঁ' সূচক ভোটে বিলের পক্ষে বিপুলসংখ্যক ভোট পড়ায় সাংবিধানিকভাবে ধরে নেয়া হয় যে, রাষ্ট্রপতি বিলে সম্মতি দিয়েছেন। নিচে গণভোটের ফলাফল দেয়া হলো ঃ

প্রদত্ত ভোটের সংখ্যা	প্রদত্ত ভোটের শতকরা হার	'হ্যাঁ' ভোটের সংখ্যা	'না' ভোটের সংখ্যা	বাতিল ভোটের সংখ্যা
২,১৮,৮৮,৪৩৭	৩৫.১৯%	১,৮৩,০৮,৩৩৭ (প্রদত্ত ভোটের ৮৪.৪২%)	৩৩,১০,০৬২ (প্রদত্ত ভোটের ১৫.৫৮%)	১,৮৯,৯৯৮

সবশেষে বলা যায় যে, ১৯৯১ সালের ১৫ সেপ্টেম্বর অবাধ, নিরপেক্ষ ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশে 'গণভোট' অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত গণভোটে ভোটারগণ সংবিধানের দ্বাদশ সংশোধনীর পক্ষে ভোট দিয়ে সংসদীয় গণতন্ত্রের অগ্রযাত্রাকে প্রশস্ত করেন।

রাষ্ট্রপতি নির্বাচন, ১৯৯১ (Presidential Election, 1991): জাতীয় সংসদে ১৯৯১ সালের ৬ আগস্ট সংবিধানের দ্বাদশ সংশোধনী বিল পাস হয়। এর ফলে সংবিধান অনুসারে বাংলাদেশে সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয় এবং বেগম খালেদা জিয়া নতুন সরকার পদ্ধতি অনুযায়ী প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন। ১৯৯১ সালের ৬ আগস্ট সংবিধানের একাদশ সংশোধনী আইন দ্বারা অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সাহাবুদ্দীন আহমদের প্রধান বিচারপতি পদে

Dhaka University Institutional Repository

(পূর্ব পদে) ফিরে যাবার পথ সুগম করা হয়েছিল। সুতরাং নতুন সরকার ব্যবস্থা দ্রুত রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। ১৯৯১ সালের ৮ অক্টোবর রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের তারিখ নির্ধারিত হয়। ১৯৯১ সালের ১৪ আগস্ট তারিখে জাতীয় সংসদে 'রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত আইন' গৃহীত হয়। এ আইনে সংসদে সদস্যগণের প্রকাশ্য ভোটদানের বিধান করা হয়। ১৯৯১ সালের ২৮ সেপ্টেম্বর তারিখে জারিকৃত ৩৩ নং অধ্যাদেশে বলা হয় রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে কোনো সংসদ সদস্য তাঁর দলের প্রার্থীর পক্ষে ভোট প্রদান না করলে তিনি তাঁর সংসদ সদস্য পদ হারাবেন।

বিএনপি সরকারের রাষ্ট্রপতি নির্বাচন আইনের প্রকাশ্য ভোটদান পদ্ধতি এবং ২৮ সেপ্টেম্বর জারিকৃত ৩৩ নং অধ্যাদেশ বিরোধীদলগুলোকে বিক্ষুব্ধ করে তোলে। বিরোধী দলসমূহ এসব বিধি বিধান ও অধ্যাদেশকে মৌলিক অধিকার হরণ ও সংবিধানের পরিপন্থী বলে আখ্যায়িত করে এবং তীব্র সমালোচনা শুরু করে। এসব আইন ও অধ্যাদেশের বিরুদ্ধে সুপ্রিমকোর্টে রিট আবেদন দাখিল করে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন স্থগিত রাখার জন্য অন্তর্বর্তীকালীন আদেশ প্রার্থনা করা হয়। এর ফলে দেশের রাজনৈতিক অঙ্গন উত্তপ্ত ও অশান্ত হয়ে উঠে। অবশেষে ১৯৯১ সালের ৩ অক্টোবর বিএনপি সরকার ৩৩ নং অধ্যাদেশটি বাতিল করে। সরকার অবশ্য প্রকাশ্য ভোটদানের বিধান বহাল রাখে। সুপ্রিমকোর্টের হাইকোর্ট ডিভিশনও ৭ অক্টোবর তারিখে প্রদত্ত এক রায়ে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন স্থগিতকরণের আবেদন নাকচ করে দেয়।

১৯৯১ সালের ৮ অক্টোবর তারিখে অনুষ্ঠিত রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে বিএনপি প্রার্থী ছিলেন পঞ্চম জাতীয় সংসদের প্রথম স্পিকার জনাব আব্দুর রহমান বিশ্বাস। আওয়ামী লীগ, বাকশাল (বিলুপ্ত) ও গণতন্ত্রী পার্টি প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি বদরুল হায়দার চৌধুরীকে বিরোধীদলীয় প্রার্থী হিসেবে মনোনয়ন প্রদান করে। জাতীয় সংসদের অন্যান্য বিরোধী দলগুলো বিচারপতি বদরুল হায়দার চৌধুরীকে 'বিরোধীদলীয়' প্রার্থী হিসেবে গ্রহণ করেনি এবং নির্বাচনের সময় এসব দলের সংসদ সদস্যগণ ভোটদানে বিরত থাকেন। জাতীয় পার্টি এ রাষ্ট্রপতি নির্বাচন বর্জন করে।

এ রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে বিএনপি প্রার্থী আব্দুর রহমান বিশ্বাস ১৭২টি ভোট (২জন স্বতন্ত্র সদস্যের ভোটসহ) এবং বিচারপতি বদরুল হায়দার চৌধুরী ৯২টি ভোট পান। আব্দুর রহমান বিশ্বাসকে এ নির্বাচনে জয়যুক্ত ঘোষণা করা হয়। তিনি ১৯৯১ সালের ৯ অক্টোবর (সংবিধানের একাদশ সংশোধনী মোতাবেক) বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ তাঁর পূর্বতন পদে অর্থাৎ প্রধান

Dhaka University Institutional Repository

বিচারপতির পদে ফিরে যান। এর ফলে তিন জোটের রূপরেখা বা যুক্ত ঘোষণা অনুযায়ী সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয় এবং অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি তাঁর পূর্বপদ ফিরে পান।

খালেদা জিয়া সরকারের আশু কর্মকাণ্ড (The Immediate Activities of the Khaleda Zia Government) : জনগণ ভোট দিয়ে খালেদা জিয়াকে ক্ষমতায় সমাসীন করে, কাজেই সঙ্গত কারণেই এ সরকারের নিকট তাদের প্রত্যাশা অনেক। বাংলাদেশের মতো তৃতীয় বিশ্বের একটি দরিদ্র দেশে জনগণের সামনে বিদ্যমান রয়েছে হাজারো সমস্যা। অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান আর চিকিৎসা সমস্যার পাশাপাশি রয়েছে শিক্ষা, বেকার সমস্যাদি ও সন্ত্রাস। এসব সমস্যার উপযুক্ত সমাধানের প্রতিশ্রুতি দিয়েই মূলত ঃ ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া। জনগণ তাই তাঁর প্রতিশ্রুতিসমূহের ওপর সরল বিশ্বাসে আস্থা স্থাপন করে সেগুলোর বাস্তবায়নের দিকে তাকিয়ে থাকে।

জনগণকে দেয়া প্রতিশ্রুতির প্রতি জাগ্রত দৃষ্টি রেখে শাসনভার গ্রহণের পরপরই বেগম খালেদা জিয়া বলেন, তিনি জনগণের সুখ শান্তির জন্য কাজ করে যাবেন। তাঁর সরকারের প্রথম কাজ হবে ধ্বংসপ্রাপ্ত অর্থনীতিকে পুনর্গঠন করা এবং দেশে আইন-শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনা। গণঅভ্যুত্থানের নেত্রী হিসেবে তিনি 'দেশনেত্রী' উপাধিতে ভূষিত হন। তিনি পূর্ববর্তী এরশাদ সরকারের দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াই করে একটি দুর্নীতিমুক্ত প্রশাসন প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকার করেন। এর পাশাপাশি খালেদা জিয়া সত্যিকার অর্থে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার ওপর গুরুত্বারোপ করেন। গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার শুভ সূচনা হওয়ায় দাতাদেশসমূহ বাংলাদেশের বিপর্যস্ত অর্থনীতিকে চাঙ্গা করার জন্য ভাবতে থাকে।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায়, বেগম খালেদা জিয়ার একটি বিরাট সুবিধা ছিল, অর্থনীতির দিক থেকে পূর্ববর্তী এরশাদ সরকারের সাথে তাঁর এ সরকারের তেমন কোনো পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়নি। কেননা, বাংলাদেশে মুক্ত পুঁজিবাদী অর্থনীতির প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন প্রয়াত রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান। আর রাষ্ট্রপতি এরশাদ সে ধরনের অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকেই আরো এক ধাপ সংহত করেছিলেন। কাজেই মৌল অর্থনৈতিক নীতির প্রশ্নে বা এক্ষেত্রে দিক নির্দেশনা দেয়ার ব্যাপারে বেগম জিয়াকে বড় ধরনের কোনো পরিবর্তন আনয়ন করতে হয়নি। (দেখুন, কাগজ ২৮ মার্চ, ১৯৯১)। নির্বাচনী ওয়াদা অনুসারে দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ ও দুর্নীতির মুলোৎপাটনের ওপরও বিএনপি সরকার সর্বাধিক জোর প্রদান করে। কিন্তু এ দুটো কাজই বেশ কষ্টসাধ্য।

Dhaka University Institutional Repository

দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা প্রধানমন্ত্রীর নিজ হাতে নেই। কারণ তা দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক অবস্থার সাথেই জড়িত। পূর্ববর্তী এরশাদ সরকার জাতির জন্য যে অর্থনীতি রেখে গেছেন তাকে অর্থনৈতিক দূরবস্থার একটি 'ফসিল' হিসেবেই চিহ্নিত করা যায়। এ রকম শূন্য ভাণ্ডার নিয়েই খালেদা জিয়া সরকারকে অকূল সাগর পাড়ি দিতে হবে। রাতারাতি দ্রব্যমূল্য কমিয়ে আনা মনে হয় কারো পক্ষেই সম্ভব নয়। কারণ এরশাদ শাসনামলে যে ঘুষ দুর্নীতি প্রশাসনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে স্থান করে নিয়েছিল তা হঠাৎ করে দূর করা কষ্টসাধ্য নয় তাতে করে সরকার আমলাতান্ত্রিক জটিলতা তথা অসহযোগিতার শিকার হয়ে পুরো প্রশাসন ব্যবস্থাই ভেঙ্গে যেতে পারে। (দেখুন, সংবাদ চিত্র, ১২ এপ্রিল, ১৯৯১)। তাছাড়া ক্ষমতাসীন দলের অনেক নেতা ও সংসদ সদস্যই অনভিজ্ঞ শিল্পপতি ও ব্যবসায়ী শ্রেণী। বিএনপি সরকারকে এসব নেতা ও সংসদ সদস্যকে যথাযথভাবে নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালিত করতে হবে। এ সকল ক্ষেত্রে সরকার ব্যর্থ হলে প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার পক্ষে তাঁর নিজের ঘর সামলানোই মুশকিল হবে। আর এর পুরোপুরি সুযোগ গ্রহণ করবে বিরোধী দলগুলো। অবস্থাদৃষ্টে মনে হয় সরকার এ বিষয়ে যথেষ্ট সচেতন রয়েছেন।

প্রধানমন্ত্রী দেশে বিদ্যমান সংসদীয় গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া হতে সর্বাধিক সুফল পাওয়ার লক্ষ্যে এ প্রক্রিয়াকে সুসংহত করার জন্য জনগণের সর্বাত্মক সহযোগিতা কামনা করেন। ২৪ সেপ্টেম্বর (১৯৯১) ফেনী স্টেডিয়ামে এক বিশাল জনসভায় বেগম খালেদা জিয়া, "এদেশের মানুষ সর্বদাই গণতান্ত্রিক শক্তির সঙ্গে থেকে স্বৈরাচার বিরুদ্ধে আন্দোলন করেছে। এখন সংসদীয় সরকার প্রবর্তনের পর গণতন্ত্র প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পেয়েছে।" (দেখুন দৈনিক ইত্তেফাক, ২৫ সেপ্টেম্বর, ১৯৯১) জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে স্বনির্ভরতা অর্জনে তাঁর সরকারের দৃঢ় সংকল্পের কথা ব্যক্ত করে বেগম জিয়া বলেন, সরকার এক এক করে তার সকল প্রতিশ্রুতিই পূরণ করবে। ইতিমধ্যেই তাঁর সরকার আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের আস্থা অর্জনে সক্ষম হয়েছে বলে তিনি ঘোষণা দেন। ১৯৯১-৯২ অর্থ বছরের জন্য সরকারের পক্ষ থেকে ২৪০ কোটি মার্কিন ডলারের অর্থনৈতিক সহযোগিতার প্রস্তাব পেশ করা হয়। যুক্তরাষ্ট্র ২৩০ কোটি মার্কিন ডলারের সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি দেয়। (দেখুন, সাপ্তাহিক বিচিত্রা, ৭ জুন, ১৯৯১)। এক সুষম উন্নয়নের কর্মসূচি গৃহীত হবে, কোনরূপে রাজনৈতিক স্বার্থে কোনো উন্নয়ন কর্মসূচি গৃহীত হবে না বলে সরকারের দৃঢ় প্রত্যয় ঘোষণা করেন।

Dhaka University Institutional Repository

নবনির্বাচিত প্রেসিডেন্ট আব্দুর রহমান বিশ্বাসও সরকারের নীতি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন, সরকার যেকোনো মূল্যে সংবিধানের মর্যাদা রক্ষা করবেন। দল-মত-ধর্ম-গোত্র নির্বিশেষে সকলের প্রতি সুবিচার ও নিরপেক্ষতা রক্ষা করাই হবে বিএনপি সরকারের নীতি। জনগণের জীবনমাত্রার মানোন্নয়ন ও সকল নাগরিকের মৌলিক চাহিদা পূরণ করা সরকারের মূল লক্ষ্য বলে বিবেচিত হবে বলে প্রেসিডেন্ট আশাবাদ ব্যক্ত করেন। (দেখুন, সাপ্তাহিক বিচিত্রা, ১৮ অক্টোবর, ১৯৯১)। এদিকে ২৩ নভেম্বর এক অধ্যাদেশের মাধ্যমে এরশাদ সরকার প্রতিষ্ঠিত উপজেলা ব্যবস্থা করে দেয়া হয়। সরকার উপজেলা ব্যবস্থার ফলে পুরাতন থানা প্রশাসন ব্যবস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেন।

৫. বিরোধী দলসমূহের সরকার বিরোধী তৎপরতা এবং বিএনপির পাল্টা পদক্ষেপ গ্রহণ (Anti Government activities of the Opposition Parties and the adoption of Counter-measures undertaken by BNP) : সর্বদলীয় ঐকমত্যের ওপর আস্থার মাধ্যমে দেশে সংসদীয় গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হলেও মাত্র ছয় মাসের মধ্যেই বিরোধী দলগুলো সরকার বিরোধী কর্মসূচি গ্রহণ এবং বিভিন্ন দাবি দাওয়া উত্থাপন করতে শুরু করে। জাতীয় পার্টি সর্বপ্রথম সরকারের বিরোধিতা করতে গিয়ে মধ্যবর্তী নির্বাচনের দাবি জানাতে থাকে। প্রধান বিরোধী দল আওয়ামী লীগও সেপ্টেম্বর মাসে (১৯৯১) হরতাল পালনের পর ঘোষণা করে, এর পরবর্তী আন্দোলন হবে ক্ষমতাসীন বিএনপি সরকারকে হটাবার আন্দোলন। সরকারের বিরুদ্ধে দলটির অভিযোগ ছিল দুটো বিষয়কে কেন্দ্র করে। প্রথমত. তিন জোটের রূপরেখা লঙ্ঘন এবং দ্বিতীয়ত. দেশ পরিচালনায় সার্বিক ব্যর্থতা। বামপন্থী পাঁচদলীয় জোটের পক্ষ থেকে জাতীয় সরকার গঠনের দাবি জানানো হয়।

৬. বিরোধী দলসমূহের নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রতিষ্ঠার দাবি এবং লাগাতার সংসদ বর্জন (The Demand of the Opposition for the establishment of Non Party Caretaker Government and the Contineous Boycott of the Parliament) : নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রতিষ্ঠা এবং এর অধীনে নির্বাচন অনুষ্ঠান করা বাংলাদেশের নতুন কিছু নয়। ইতোমধ্যে ১৯৯১ সালে এ ধরনের সরকার গঠন এবং এর নিয়ন্ত্রণে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। আর সেই সূত্র ধরেই ক্ষমতাসীন সরকারের কতিপয়

Dhaka University Institutional Repository

অগণতান্ত্রিক নীতি ও কর্মকাণ্ডের প্রেক্ষাপটে দেশের বিরোধী দলগুলো পুনরায় ১৯৯৩ সালের শেষভাগে এসে পুনরায় নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবি উত্থাপন করে। যেসব সরকারি, অগণতান্ত্রিক কর্মকাণ্ডের প্রেক্ষিতে এ দাবি করা হয়। তারমধ্যে সর্বত্র দলীয়করণ, বিগত উপনির্বাচনগুলোর তিক্ত অভিজ্ঞতা, বিরোধী দলের সাথে সরকারের আচরণ এসব ছিল প্রধান।

বিরোধী দলসমূহের এ দাবির জবাবে সরকারি দলের পক্ষ থেকে বলা হয়, বিএনপি সরকারের অধীনে অধীনে সকল নির্বাচনই অবাধ ও নিরপেক্ষ হয়েছে। সংসদে সরকারি দলের সদস্যরা বলেন, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন অনুষ্ঠানের দাবি অসাংবিধানিক ও আপত্তিকর। তাঁরা আরো বলেন, বিরোধী দলের এ দাবি নির্বাচন কমিশনের প্রতি অনাস্থাস্বরূপ। (দেখুন, দৈনিক ইত্তেফাক, ২৪ সেপ্টেম্বর, ১৯৯৩)।

নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবি এবং তা নিয়ে বিতর্ক কেবল জাতীয় সংসদের সীমাবদ্ধ থাকেনি। ধীরে ধীরে এ দাবি ও বিতর্ক বিরোধী দলগুলোর বিভিন্ন সভা সমিতিতেও স্থান পেতে শুরু করে। ৩রা ডিসেম্বর (১৯৯৩) বিরোধীদলীয় নেত্রী শেখ হাসিনা ঢাকায় এক জনসভায় বলেন, সরকার দুর্নীতি, সন্ত্রাস ও নির্যাতনের জন্য জনগণের বিশ্বাসযোগ্যতা হারিয়েছেন। তাই অবিলম্বে সরকারকে পদত্যাগ করে নিরপেক্ষ, নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন দিতে হবে। আর এ লক্ষ্যে গড়ে তুলতে হবে দুর্বার গণআন্দোলন। তিনি বলেন, 'উন্নয়ন উন্নয়ন বলে সরকার চিৎকার করলেও তাঁরা করতে পেরেছেন কেবল দুর্নীতির উন্নয়ন। এ সরকারের ভিত ঘুণে ধরেছে: সরকারের বেশি দিন আয়ু নেই। একটু ঝাঁকুনি দিয়েছিলাম আর তাতেই সরকার বেসামাল হয়ে পড়েছিল। আর একটু নাড়া দিলেই নিজেদের ব্যর্থতার কারণে তাদের পতন হবে। (দেখুন, দৈনিক ইত্তেফাক, ৪ঠা ডিসেম্বর, ১৯৯৩)। তিনি আরো বলেন, ক্ষমতাসীন সরকার বিশ্বাসযোগ্যতা হারিয়েছে বলেই আমরা তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন চাই। উক্ত সভায় তোফায়েল আহমদ বলেন, "একটি স্বৈরাচারী সরকারকে উৎখাত করে আর একটি নব্য স্বৈরাচারী সরকারকে আমরা পেয়েছি। এ সরকারকে হটাতে হবে।" (দেখুন, দৈনিক ইত্তেফাক)। শেখ হাসিনা অপর এক জনসভায় বলেন, দেশে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করে সামাজিক অস্থিরতা দূর করার জন্য আওয়ামী লীগ দুর্বার আন্দোলন শুরু করেছে। এ আন্দোলনকে জোরদার করে নির্দলীয়, নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য তিনি সকল মহলের আন্তরিক সহায়তা কামনা করেন। (দেখুন, আজকের কাগজ, ১৯ ডিসেম্বর-১৯৯৩)। তিনি এ সরকারকে নব্য স্বৈরাচার আখ্যায়িত করে বলেন, এ

Dhaka University Institutional Repository

অগণতান্ত্রিক নীতি ও কর্মকাণ্ডের প্রেক্ষাপটে দেশের বিরোধী দলগুলো পুনরায় ১৯৯৩ সালের শেষভাগে এসে পুনরায় নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবি উত্থাপন করে। যেসব সরকারি, অগণতান্ত্রিক কর্মকাণ্ডের প্রেক্ষিতে এ দাবি করা হয়। তারমধ্যে সর্বত্র দলীয়করণ, বিগত উপনির্বাচনগুলোর তিক্ত অভিজ্ঞতা, বিরোধী দলের সাথে সরকারের আচরণ এসব ছিল প্রধান।

বিরোধী দলসমূহের এ দাবির জবাবে সরকারি দলের পক্ষ থেকে বলা হয়, বিএনপি সরকারের অধীনে অধীনে সকল নির্বাচনই অবাধ ও নিরপেক্ষ হয়েছে। সংসদে সরকারি দলের সদস্যরা বলেন, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন অনুষ্ঠানের দাবি অসাংবিধানিক ও আপত্তিকর। তাঁরা আরো বলেন, বিরোধী দলের এ দাবি নির্বাচন কমিশনের প্রতি অনাস্থাস্বরূপ। (দেখুন, দৈনিক ইত্তেফাক, ২৪ সেপ্টেম্বর, ১৯৯৩)।

নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবি এবং তা নিয়ে বিতর্ক কেবল জাতীয় সংসদের সীমাবদ্ধ থাকেনি। ধীরে ধীরে এ দাবি ও বিতর্ক বিরোধী দলগুলোর বিভিন্ন সভা সমিতিতেও স্থান পেতে শুরু করে। ৩রা ডিসেম্বর (১৯৯৩) বিরোধীদলীয় নেত্রী শেখ হাসিনা ঢাকায় এক জনসভায় বলেন, সরকার দুর্নীতি, সন্ত্রাস ও নির্যাতনের জন্য জনগণের বিশ্বাসযোগ্যতা হারিয়েছেন। তাই অবিলম্বে সরকারকে পদত্যাগ করে নিরপেক্ষ, নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন দিতে হবে। আর এ লক্ষ্যে গড়ে তুলতে হবে দুর্বার গণআন্দোলন। তিনি বলেন, 'উন্নয়ন উন্নয়ন বলে সরকার চিৎকার করলেও তাঁরা করতে পেরেছেন কেবল দুর্নীতির উন্নয়ন। এ সরকারের ভিত ঘুণে ধরেছে: সরকারের বেশি দিন আয়ু নেই। একটু ঝাঁকুনি দিয়েছিলাম আর তাতেই সরকার বেসামাল হয়ে পড়েছিল। আর একটু নাড়া দিলেই নিজেদের ব্যর্থতার কারণে তাদের পতন হবে। (দেখুন, দৈনিক ইত্তেফাক, ৪ঠা ডিসেম্বর, ১৯৯৩)। তিনি আরো বলেন, ক্ষমতাসীন সরকার বিশ্বাসযোগ্যতা হারিয়েছে বলেই আমরা তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন চাই। উক্ত সভায় তোফায়েল আহমদ বলেন, "একটি স্বৈরাচারী সরকারকে উৎখাত করে আর একটি নব্য স্বৈরাচারী সরকারকে আমরা পেয়েছি। এ সরকারকে হটাতে হবে।" (দেখুন, দৈনিক ইত্তেফাক)। শেখ হাসিনা অপর এক জনসভায় বলেন, দেশে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করে সামাজিক অস্থিরতা দূর করার জন্য আওয়ামী লীগ দুর্বার আন্দোলন শুরু করেছে। এ আন্দোলনকে জোরদার করে নির্দলীয়, নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য তিনি সকল মহলের আন্তরিক সহায়তা কামনা করেন। (দেখুন, আজকের কাগজ, ১৯ ডিসেম্বর-১৯৯৩)। তিনি এ সরকারকে নব্য স্বৈরাচার আখ্যায়িত করে বলেন, এ

Dhaka University Institutional Repository

সরকারের হাত থেকে জনগণকে মুক্তি দিতে হলে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন ছাড়া কোনো বিকল্প নেই। তিনি সকল অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য দেশবাসীর প্রতি আহ্বান জানান। (দেখুন, আজকের কাগজ, ৭ জানুয়ারি-১৯৯৪)।

১৯৯৪ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি জাতীয় সংসদের শীতকালীন অধিবেশন শুরু হয়। সেদিন জাতীয় সংসদে ভাষণ দানকালে প্রেসিডেন্ট আব্দুর রহমান বিশ্বাস যেকোনো মূল্যে গণতন্ত্রকে রক্ষা ও জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের শাসন অব্যাহত রাখার দৃঢ় অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন। ইতোমধ্যে সরকার সুপ্রিমকোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে নয়জন বিচারপতি নিয়োগ করেন। প্রধান বিচারপতির সাথে কোনো পরামর্শ না করেই সুপ্রিমকোর্টের আইনজীবী সমিতি এক জরুরি সাধারণ সভা আহ্বান করে সরকারের নিয়োগকে বেআইনী বলে অভিহিত করেন। সমিতি নিয়োগকৃত বিচারকদের বিচারকার্য পরিচালনার দায়িত্ব না দেয়ার জন্য প্রধান বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদের নিকট অনুরোধ জানায়। প্রধান বিচারপতির কোনো এক্তিয়ার ছাড়া সুপ্রিম কোর্টের বিচারক নিয়োগের ফলে প্রধান বিচারপতির কার্যত অস্তিত্বহীন হয়ে পড়েছেন বলে প্রধান বিচারপতি ষষ্ঠ বার কাউন্সিল সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন। (দেখুন, দৈনিক ইত্তেফাক, ৬ ফেব্রুয়ারি)।

ইতোপূর্বে প্রদত্ত প্রেসিডেন্টের ভাষণ এবং বিচারপতি নিয়োগের বিষয়টির মধ্যে কোনরূপ সামঞ্জস্য নেই বলেই পর্যবেক্ষক মহল মনে করেন।

প্রধান বিচারপতির এ বক্তব্যকে তথ্যমন্ত্রী ব্যারিস্টার নাজমুল হুদা রাজনৈতিক বক্তব্য বলে আখ্যায়িত করেন। প্রধান বিচারপতি এ ধরনের রাজনৈতিক বক্তব্যের মাধ্যমে সংবিধানকে আঘাত করেছেন। প্রধানমন্ত্রী তাঁর বক্তব্যে বলেন, বিচার বিভাগ, সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে কাজ করে চলেছে এবং বিচার বিভাগের ওপর আমাদের সম্পূর্ণ আস্থা রয়েছে। এ প্রসঙ্গে বিরোধীদলীয় ভারপ্রাপ্ত নেতা আব্দুস সামাদ আজাদ বলেন, প্রধানমন্ত্রী ও তথ্যমন্ত্রীর বক্তব্যে গোটা বিচার বিভাগকেই কটাক্ষ করে করা হয়েছে। তোফায়েল আহমদ বলেন, প্রধান বিচারপতির বক্তৃতার সাথে রাজনীতির কোনো সম্পর্ক নেই বিরোধী দলীয় সদস্যগণ সকলেই তোফায়েল আহমদের এ বক্তব্য সমর্থন করেন। অপরদিকে জাতীয় পার্টির সংসদীয় দলের ভারপ্রাপ্ত নেতা ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদ সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনকে দেশের সমগ্র জনগণের ইচ্ছার প্রতিফলন হিসেবে আখ্যা দিয়ে বলেন, এ নির্বাচনের মাধ্যমে জনগণ বিএনপি সরকারের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রকাশ

Dhaka University Institutional Repository

করেছে। তাই অবিলম্বে নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠান করা উচিত।

এপ্রিল মাসের প্রথম সপ্তাহে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠানের দাবি জানাতে আওয়ামী লীগ সচিবালয় ঘেরাও কর্মসূচি পালন করে। তখন সশস্ত্র ব্যক্তিদের গুলিতে দুজন ছাত্র নিহত হয়। এ হত্যার প্রতিবাদে ১০ এপ্রিল (১৯৯৪) সারাদেশে সকাল-সন্ধ্যা হরতাল পালিত হয়। হরতাল চলাকালে শেখ হাসিনা বলেন, নব্বইয়ের গণঅভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে ভোট ডাকাতি ও দুর্নীতিবাজ সরকারের পতনের পর দেশবাসীর আশা ছিল ভোট ডাকাতি ও দুর্নীতির পতন হবে। কিন্তু দুঃখের বিষয় জনগণের সে আকাঙ্ক্ষা বিন্দুমাত্রও সফল হয়নি। ক্ষমতাসীন দল দুর্নীতিতে আকণ্ঠ নিমজ্জিত এবং ভোট ডাকাতির ক্ষেতে অতীতে সকল রেকর্ড ভঙ্গ করেছে। মাগুরার উপনির্বাচনের কালো টাকা, অবৈধ, অস্ত্র ও স্থানীয় প্রশাসনকে ব্যবহার করে ভোট ডাকাতির মাধ্যমে কষ্টার্জিত গণতন্ত্রকে বিএনপি ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিয়েছে। জাতীয় পার্টিও সেদিন পৃথকভাবে সকাল-সন্ধ্যা হরতাল আহ্বান করে। গণফোরাম নেতা ড. কামাল হোসেন দেশের বিদ্যমান পরিস্থিতিকে সংকট উত্তরণে মৌলিক ইস্যুগুলোকে সরকার ও বিরোধী দলগুলোকে জাতীয় সংলাপ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সমঝোতায় আসার আহ্বান জানান। তিনি আরো বলেন, শুধু তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন নয়, এর পাশাপাশি নির্বাচন কমিশনকে শক্তিশালী করার দাবি উত্থাপন করা আবশ্যক। (দেখুন, দৈনিক ইত্তেফাক, ৮ ও ৯ এপ্রিল-১৯৯৪)। আওয়ামী কার্যনির্বাহী সংসদের দুদিনব্যাপী সভা সমাপ্ত হয় ১৭ এপ্রিল (১৯৯৪)। উক্ত সভায় সিদ্ধান্ত হয়, বগুড়ার শূন্য আসনের আসন্ন উপনির্বাচনে অংশগ্রহণ না করা এবং সে সাথে বিএনপি সরকারের অধীনে আর কোনো নির্বাচনে অংশ না নিয়ে কেবলমাত্র একটি গ্রহণযোগ্য নির্দলীয়, নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে জাতীয় নির্বাচনের দাবিতে আন্দোলন জোরদার করা। আওয়ামী লীগ সভানেত্রী অভিযোগ করেন বিএনপিই বন্ধ করেছে। কাজেই আন্দোলন ছাড়া বিরোধী দলের সামনে আর কোনো পথ খোলা নেই বলে তিনি মন্তব্য করেন। (দেখুন, দৈনিক ইত্তেফাক, ১৮ এপ্রিল, ১৯৯৪)।

বিরোধী দলগুলোর সদস্যরা জাতীয় সংসদের ত্রয়োদশ অধিবেশনের শেষ সপ্তাহ এবং চতুর্দশ অধিবেশন সম্পূর্ণ বয়কট করেন। এ বয়কটের পেছনে যেসব দাবি উত্থাপন করা হয় তারমধ্যে ছিল তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সংসদ নির্বাচন, সরকারের বিরুদ্ধে দলীয়করণ, দুর্নীতির অভিযোগ, সন্ত্রাস, দমন ও বিশেষ ক্ষমতা আইন বাতিলের দাবি। সংসদ অধিবেশন বর্জনের ফলে দেশের

Dhaka University Institutional Repository

রাজনৈতিক পরিস্থিতি অত্যন্ত ঘোলাটে হয়ে উঠে। তথ্যমন্ত্রী ব্যারিস্টার নাজমুল হুদা কর্তৃক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবিকে কটাক্ষ করে মন্তব্য এবং এ সরকারের আইনগত কোনো ভিত্তি নেই সংক্রান্ত বক্তব্য বিদ্যমান রাজনৈতিক পরিবেশেকে অত্যধিক সংকটাপন্ন করে তোলে।

এদিকে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিষয়ে সরকারি অভিমতকে প্রত্যাখ্যান করে ব্যারিস্টার কে এস নবী বলেন, যেকোনো বিষয়ে জাতীয় সমঝোতা হলে এটি অবশ্যই গণতান্ত্রিক। একে অগণতান্ত্রিক বলা জনগণের রায়কে অবজ্ঞা করারই সামিল। অবশ্য তিনি বলেন, 'তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে গণতান্ত্রিক সরকারের বিকল্প আখ্যা দেয়া ঠিক নয়। এমনকি নির্বাচন কমিশনের ক্ষমতা বৃদ্ধিও তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিকল্প হতে কারণ তত্ত্বাবধায়ক সরকার হবে জাতীয় সমঝোতার সরকার।' (দেখুন, দৈনিক ইত্তেফাক, ২৬ মে-১৯৯৪)।

এমনি যখন রাজনৈতিক অবস্থা, তখন সরকারের পক্ষ থেকে সংকট নিরসনে কিছুটা উদ্যোগ গৃহীত হয়। প্রধানমন্ত্রীর পক্ষ থেকে সকল বিরোধী দলকে জাতীয় সংসদ অধিবেশনে যোগদানের জন্য আহ্বান জানান। প্রধানমন্ত্রী বলেন, মনোনীত সরকার নির্বাচিত গণতান্ত্রিক সরকারের বিকল্প হতে পারে না। তিনি জোর দিয়ে বলেন, জাতীয় সংসদই হলো সকল কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রবিন্দু। এদিকে ১৯৯৪-৯৫ অর্থ বছরের বাজেট জাতীয় সংসদে পেশ করা হয় জাতীয় বিরোধী দলগুলোর অনুপস্থিতিতেই। এমতাবস্থায় বিরোধী দলসমূহ সংসদের বাইরেও আন্দোলনের কর্মসূচি দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। এভাবে একদিন সংসদ বর্জন এবং অপরদিকে সংসদেব বাইরে আন্দোলন অব্যাহত রাখার সিদ্ধান্ত নেয়ার ফলে সরকার নিতান্তই অসুবিধাজনক এক অবস্থায় নিপতিত হয়।

৭. বিরোধী দলসমূহ কর্তৃক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের রূপরেখা ঘোষণা ৮[৮] (Declaration of the Outline of Caretaker Government by the Opposition Parties): ১৯৯৪ সালের ২৭ জুন বিরোধী দলসমূহের রূপরেখা অনুষ্ঠানের ঘোষিত হয়। আওয়ামী লীগ সভানেত্রী ও জাতীয় সংসদে বিরোধীদলীয় নেত্রী শেখ হাসিনা জাতীয় সংসদ ভবন সভাকক্ষে এক জনাকীর্ণ সাংবাদিক সম্মেলনে এ ঘোষণা প্রদান করেন। উক্ত রূপরেখার বর্ণিত বিষয়সমূহ ছিল নিম্নরূপ ঃ

---

[৮]। চৌধুরী, হাসানুজ্জামান, আমাদের ভবিষৎ করনীয়: নব্বই এর যৌথ ঘোষণার আলোকে, ঢাকা: রাজনীতি গবেষণা কেন্দ্র, ১৯৯১।

Dhaka University Institutional Repository

প্রথমত-একটি নির্দলীয়, নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে জাতীয় সংসদের সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে প্রেসিডেন্ট জাতীয় সংসদ ভেঙ্গে দেয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী পদত্যাগ করবেন।

দ্বিতীয়ত-অন্তর্বর্তীকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকার পরিচালনার জন্য প্রেসিডেন্ট জাতীয় সংসদে প্রতিনিধিত্বকারী আন্দোলনরত রাজনৈতিক দলসমূহের নিকট গ্রহণযোগ্য ব্যক্তিকে প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ করবেন। এ প্রধানমন্ত্রীই সরকারের প্রধান কর্মকর্তা হিসেবে তাঁর কাজ পরিচালনা করেন।

তৃতীয়ত-অন্তর্বর্তীকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধানমন্ত্রী নিজে কোনো নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবেন না। তিনি কোনো রাজনৈতিক দলের সদস্য এবং নির্বাচনে প্রার্থী হবেন না, এমন ব্যক্তিদের সমন্বয়ে একটি মন্ত্রিসভা (ক্যাবিনেট) গঠন করবেন।

চতুর্থত-এ সরকারের মূল দায়িত্ব হবে প্রেসিডেন্ট কর্তৃক সংসদ ভেঙ্গে দেয়ার পর ৯০ দিনের মধ্যে একটি অবাধ, নিরপেক্ষ ও সুষ্ঠু জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠান করা।

পঞ্চমত-নির্বাচনের পর সংবিধানের ৫৬ অনুচ্ছেদের ৩ দফা অনুযায়ী প্রেসিডেন্ট নতুন প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ করার সঙ্গে সঙ্গে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার বিলুপ্ত হয়ে যাবে।

ষষ্ঠত-তত্ত্বাবধায়ক সরকারের মূল দায়িত্ব হবে অবাধ, সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ নির্বাচন সুনিশ্চিত করা এবং সংবিধানে প্রদত্ত সাধারণ দায়িত্ব ও কর্তৃব্য পালন ছাড়াও জরুরি রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ড পরিচালনা করা।

সপ্তমত- নির্বাচন কমিশনকে আরো জোরদার করার প্রস্তাবও রাখা হয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের রূপরেখায়। এ লক্ষ্যে কমিশনকে পুনর্গঠন এবং এর জন্য স্বয়ংসম্পূর্ণ আচরণবিধি প্রণয়নের মাধ্যমে একে স্বাধীন প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলার ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়।

৮. রাজনৈতিক সংকট নিরসনে কূটনৈতিক ও বুদ্ধিজীবীদের উদ্যোগ অক্টোবর, ১৯৯৫ (Initiatives on the part of the Diplomats and Intelligentsia to dispel Political Crisis, October 1995) : দেশে বিদ্যমান সংকট নিরসনকল্পে প্রথমত কূটনৈতিক উদ্যোগ গৃহীত হয়। বাংলাদেশে নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত ডেভিড মেরিল

Dhaka University Institutional Repository

সংকট নিরসনের প্রস্তাবসমূহ সরকারি ও বিরোধী দলের সাথে যোগাযোগ করেন। কমনওয়েলথ মহাসচিবের বিশেষ দূত স্যার নিনিয়ান স্টিফেন প্রথমে সরকারি দলের নেতাদের সঙ্গে এক বৈঠকে মিলিত হন ১৫ অক্টোবর (১৯৯৫)। জাতীয় সংসদ ভবনে সংসদ উপনেতার অফিস কক্ষে দেড় ঘণ্টা স্থায়ী এ বৈঠক শেষে স্যার নিনিয়ান সাংবাদিকদের বলেন, সরকারের মন্ত্রী ও নেতাদের সাথে তাঁর তথ্যপূর্ণ ও কার্যকর আলোচনা হয়েছে কিন্তু বিস্তারিত কোনো কিছু প্রকাশ করেননি। এছাড়াও দেশের বুদ্ধিজীবীগণ সরকারি ও বিরোধীদলীয় নেত্রীর সঙ্গে সাক্ষাত করে সংকট নিরসনের সমাধানের প্রতি ইঙ্গিত করেন। কিন্তু অবস্থাদৃষ্টে মনে হয় সংকট নিরসনের দ্রুত কোনো সমাধান বাস্তবে হবার নয়। বিরোধী দলের পক্ষ থেকে ১৬ অক্টোবর থেকে ৯৬ ঘণ্টার হরতাল পালন করা হয়। হরতালের শেষ দিনে (১৮ অক্টোবর) শেখ হাসিনা প্রধানমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে বলেন, 'প্রেসিডেন্টকে জাতীয় সংসদ ভেঙ্গে দিতে বলুন, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচনের ঘোষণা প্রদান করুন, হরতাল করব না।' (দেখুন, দৈনিক ইত্তেফাক, ১৯ অক্টোবর-১৯৯৫)। অন্যথায় দাবি আদায় না পর্যন্ত আন্দোলন থামবে না বলে তিনি পুনর্ব্যক্ত করেন। শেখ হাসিনা বলেন, আলোচনার মাধ্যমে সঙ্কটের অবসান করা হলে তা দেশের জন্য কল্যাণ বয়ে আনবে। তবে তিনি জোর দিয়ে বলেন, আন্দোলনের পাশাপাশি সরকারের সঙ্গে সংলাপে বসার অভিপ্রায় বিরোধী দলগুলোর রয়েছে। সংসদ ভবনে অনুষ্ঠিত সম্মিলিত বিরোধী দলের এক সভায় বলা হয়, বিরোধী দল সব সময়ই গণতান্ত্রিক রীতিনীতিতে বিশ্বাসী এবং এ বিশ্বাসকে সমুন্নত রাখতে চায়। তাই দাবি আদায়ে শান্তিপূর্ণ সকল পদ্ধতি অবলম্বনে পিছপা হবে না।

এ সভাশেষে বিরোধীদলীয় চীফ হুইপ মোহাম্মদ নাসিম সাংবাদিকদের বলেন, বিরোধী দল সব সময়ই অর্থবহ সংলাপের পক্ষে। কিন্তু সরকার অতীতের মতো এখনো সংলাপকে সামনে রেখে বিশেষত প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রী যেসব বক্তব্য দিয়ে চলেছেন, তাতে সংলাপের পরিবেশ বার বার বিঘ্নিত হচ্ছে। এ ধরনের সরকারের সাথে সংলাপের কি ফল হবে তা স্পষ্ট নয়। তবুও দেশবাসীকে আমরা জানাতে চাই, বিরোধী দল গণতান্ত্রিক রীতিনীতি ও ঐতিহ্যকে সমুন্নত রাখতে চায়। তবে তিনি পুনরায় জোর দিয়ে বলেন, আলোচনার মূল বিষয় হবে জাতীয় নির্বাচনের ব্যাপারে সাংবিধানিক গ্যারান্টি নিশ্চিত করা।

Dhaka University Institutional Repository

৯. পঞ্চম জাতীয় সংসদ বিলুপ্তি ঘোষণা, ১৫ ফেব্রুয়ারির নির্বাচন এবং বিরোধী দলগুলোর নির্বাচন প্রতিহতকরণ কর্মসূচি (Dissolution of the Fifth Jatio Sangsad, the 15th Febreary Election and the Programme of Resisting the Election by the Opposition): ১৯৯৫ সালের ২৪ নভেম্বর প্রধানমন্ত্রী ও সংসদ নেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার পরামর্শক্রমে প্রেসিডেন্ট আব্দুর রহমান বিশ্বাস সংবিধানের ৭২ নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী পঞ্চম জাতীয় সংসদের বিলুপ্তি ঘোষণা করেন। সেই সঙ্গে তিনি প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়াকে স্বীয় পদে অধিষ্ঠিত থেকে কাজ চালিয়ে যাবার জন্য অনুরোধ জানান। প্রধানমন্ত্রীর মন্ত্রিপরিষদও পূর্ণ মর্যাদায় বহাল থাকে।

জাতির উদ্দেশে প্রদত্ত বেতার ও টেলিভিশন ভাষণে প্রধানমন্ত্রী বলেন, উপনির্বাচনে দল অসম্মতি প্রকাশ করায় জাতীয় সংসদ ভেঙ্গে দেয়ার জন্য তিনি প্রেসিডেন্টকে পরামর্শ দান করেন। তিনি যেকোনো মূল্যে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখার ওপর গুরুত্বারোপ করেন। নির্বাচন কমিশন আগামী ৯০ দিনের মধ্যে জাতীয় সংসদের সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে বলে উল্লেখ করেন প্রধানমন্ত্রী।

প্রধানমন্ত্রী দেশের সকল দল ও নেতার উদ্দেশে বলেন, 'আসুন যে গণতন্ত্রের ধারা আমরা সূচনা করেছি তা বজায় রাখার জন্য সুষ্ঠু নিরপেক্ষ ও অবাধ নির্বাচন অনুষ্ঠানের পক্ষে মুক্ত মনে আলোচনা করি। সবাই মিলে দেশ, জাতি ও জনগণের স্বার্থে আসন্ন নির্বাচনকে সফল করি ও গণতন্ত্রকে শক্তিশালী করি। (দেখুন, জাতির উদ্দেশে প্রদত্ত প্রধানমন্ত্রীর ভাষণ যা দেশের বিরাজমান রাজনৈতিক অচলাবস্থার জন্য বিরোধী দলকে দায়ী করেন। বিরোধী দলগুলোর তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবিকে তিনি অগণতান্ত্রিক, অযৌক্তিক এবং সংবিধান পরিপন্থী বলে বর্ণনা করেন।

প্রেসিডেন্ট বিশ্বাস জাতীয় সংসদ ভেঙ্গে দেয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঘোষণা দেন, ১৯৯৬ সালের ২২ ফেব্রুয়ারির মধ্যে দেশে ষষ্ঠ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠান করতে হবে। এ ঘোষণার তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে গিয়ে বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনা বলেন, সংসদ "বাতিল করতে সরকার বাধ্য হয়েছেন, এ বিজয় জনগণের।" জাতীয় পার্টির পক্ষ থেকে মিজানুর রহমান চৌধুরী তাঁর প্রতিক্রিয়ায় বলেন, 'এতে নতুন কিছু নেই। উপনির্বাচন করতে পারেনি তাই সংসদ ভেঙ্গে দিতেই হবে।

Dhaka University Institutional Repository

এদিকে সরকার ঘোষিত সময়সীমার মধ্যে নির্বাচন অনুষ্ঠান করার পক্ষে নির্বাচন কমিশন তার কর্মতৎপরতা শুরু করে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত প্রতি পদক্ষেপেই দারুণভাবে বাধার সম্মুখীন হয়। দেশের বিভিন্ন শহরে নির্বাচন কমিশন অফিসে হাঙ্গামা, ভাঙ্গচুর এমনকি অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটে। ৯ ডিসেম্বর (১৯৯৫) থেকে আবার দিন দিনব্যাপী লাগানো হরতাল পালিত হয়। হরতালের প্রথমদিনে রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় আওয়ামী লীগের মিছিল শেষে দুপুরে জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে আয়োজিত সমাবেশে দলের সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য আব্দুস সামাদ আজাদ বলেন, প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া এমন জনবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছেন এবং আর কোনো উপায় না দেখে একদলীয়ভাবে নির্বাচন করতে সচেষ্ট হয়েছেন। কিন্তু লক্ষ্য করার বিষয় এ দেশের প্রতিটি দল ও জনগণ নির্বাচনের ঘোষিত তফসিল ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করেছে। (দেখুন, দৈনিক ইত্তেফাক, ১০ ডিসেম্বর ১৯৯৫)। তিনি আরো বলেন, বেগম জিয়াকে অবশ্যই পদত্যাগ করতে হবে এবং তারপর প্রেসিডেন্টকে তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠন করতে দিতে হবে আর নির্বাচন হবে সে তত্ত্বাবধায়ক সরকারেরই অধীনে। অন্য কোনো উপায়ে কোনো নির্বাচন বাংলার মাটিতে হবে না, হতে পারে না, জনগণ তা হতে দেবে না বলে তিনি দৃঢ়তার সাথে ঘোষণা দেন। (দেখুন, দৈনিক ইত্তেফাক, ১০ ডিসেম্বর, ১৯৯৫)।

১৫ ফেব্রুয়ারি (১৯৯৬৬) নির্বাচনের দিন ধার্য করা হয়। সে পরিকল্পনা অনুসারে ১৭ জানুয়ারি ছিল মনোনয়নপত্র জমা দেয়ার শেষ দিন। পরদিন ছিল মনোনয়নপত্র বাছাইয়ের শেষ দিন। ৩০০ আসনের জন্য মনোনয়নপত্র জমা পড়ে ১৯৮৭টি।

সরকারি এ সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে তিন বিরোধী দলের ১৭ জানুয়ারির বৈঠকে বলা হয়, একদলীয় ভোট ডাকাতির প্রহসনমূলক নির্বাচনী প্রক্রিয়া দেশকে এক অবশ্যম্ভাবী সংঘাত ও সংঘর্ষের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। কিন্তু বিরোধী দলগুলো অর্জিত গণতন্ত্রকে ধ্বংস করার ষড়যন্ত্র কোনো অবস্থাতেই মেনে নেবে না। তারা এ নির্বাচন কেবল বর্জনই করবে না, যেকোনো মূল্যে তা প্রতিহত করবে বলে অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়। উক্ত বৈঠকে আরো বলা হয় হয়, বিএনপি নেতৃত্ব গণতন্ত্রকে হত্যা করার জন্য ভোটারবিহীন নির্বাচনে যে প্রক্রিয়া শুরু করেছে তা তাদের দীর্ঘদিনের লুক্কায়িত স্বৈরাচারী চরিত্রেরই বহিঃপ্রকাশ মাত্র। নেতারা ১৫ ফেব্রুয়ারির প্রহসনমূলক নির্বাচনে অংশগ্রহণ না করার জন্য জনগণের প্রতি আহ্বান জানিয়ে অত্যন্ত কঠোর ভাষায় বলেন, উদ্ভূত পরিস্থিতির জন্য বিএনপি সরকার এবং নির্বাচন কমিশন দায়ী থাকবে। (দেখুন, দৈনিক ইত্তেফাক, ১৮ জানুয়ারি, ১৯৯৬)।

Dhaka University Institutional Repository

বিরোধী দলের পক্ষ থেকে নির্বাচন প্রক্রিয়ার সঙ্গে জড়িত সকল প্রশাসনিক কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের উদ্দেশে বলা হয়, বিএনপি সরকারের একদলীয় নীল-নকশার নির্বাচনে তারা যেন সকল প্রকার সহযোগিতা থেকে বিরত থাকেন। তিন দলের পক্ষ থেকে আরো বলা হয়, যারা ১৫ ফেব্রুয়ারি নির্বাচনে প্রার্থী হয়েছেন ২৩ জানুয়ারির মধ্যে যেন তারা প্রার্থিতা প্রত্যাখ্যান করেন; অন্যথায় তারা গণদুষমন হিসেবে চিহ্নিত হবেন।

আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে শেখ হাসিনা 'প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার পদত্যাগ ও তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন– এ এক দফার আন্দোলনকে চূড়ান্ত লক্ষ্যে পৌঁছবার জন্য জনগণের প্রতি আহ্বান জানান। এর পাশাপাশি সংসদ নির্বাচন বাতিল করার জন্য জামায়াতে ইসলামী, আওয়ামী লীগ এবং জাতীয় পার্টি প্রধান নির্বাচন কমিশনারের নিকট পৃথক পৃথক পত্র দেয়। (দেখুন, দৈনিক ইত্তেফাক, ২০-২৫ জানুয়ারি, ১৯৯৬)। তারা রেডিও-টেলিভিশনকে স্বায়ত্তশাসন প্রদানের দাবিতেও বিক্ষোভ সমাবেশের আয়োজন করে। বিক্ষোভ সমাবেশ পণ্ড করার জন্য পুলিশি নির্যাতন চালানো হয়। এতে করে অনেক দলীয় কর্মি ও সাধারণ জনতা আহত হয়। আন্দোলনরত বিরোধী দলগুলো ১৫ ফেব্রুয়ারির সংসদ নির্বাচন প্রতিহত করার জন্য এক নতুন অ্যাকশন কর্মসূচি গ্রহণ করে ২৬ জানুয়ারি (১৯৯৬)। এ কর্মসূচির লক্ষ্য ছিল।

ক. যেখানে নির্বাচনী প্রচারণা সেখানেই প্রতিরোধ গড়ে তোলা।

খ. প্রধান তিনটি বিরোধী দলের সাথে অন্যান্য বিরোধী দলের সমন্বিত কর্মসূচি গ্রহণ করা।

গ. ক্ষমতাসীন বিএনপি সরকারের প্রহসনমূলক নির্বাচনের প্রতি সমর্থন না দেয়ার জন্য পশ্চিম দাতা দেশগুলোর প্রতি আহ্বান জানানো।

ঘ. আইনজীবী ও বুদ্ধিজীবীসহ দেশের সকল পেশাজীবীদের সাথে বিরোধী নেতাদের মতবিনিময় করে প্রহসনমূলক নির্বাচন প্রতিহত করা।

অপরদিকে ক্ষমতাসীন দল এর পূর্ব সিদ্ধান্ত অনুসারে ১৫ ফেব্রুয়ারি নির্বাচন অনুষ্ঠানে অটল থাকলে বিরোধী দলগুলো তা প্রতিহত করার লক্ষ্যে ১৪ এবং ১৫ ফেব্রুয়ারিসহ ছয়দিনের এক ব্যাপক কর্মসূচির ঘোষণা দেয়। ১০ ফেব্রুয়ারি (১৯৯৬) থেকে উক্ত কর্মসূচি শুরু হবে বলে জানানো হয়। আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা ৫ ফেব্রুয়ারি এক সাংবাদিক সম্মেলনে দেশের সার্বিক রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে অত্যন্ত নাজুক ও উদ্বেগজনক বলে বর্ণনা করেন। তিনি

Dhaka University Institutional Repository

বলেন, ১৫ ফেব্রুয়ারি জনগণ নিজেরাই সকাল-সন্ধ্যা কারফিউ প্রদান করবে এবং ভোটাররা ঘরের বাইরে যাবে না। (দেখুন, দৈনিক ইত্তেফাক, ৬ ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৬)।

ক্ষমতাসীন বিএনপি সরকারের পক্ষ থেকে ঘোষণা দেয়া হয়, ১৫ ফেব্রুয়ারি নির্বাচনের কোনো বিকল্প নেই। সরকারি এ ঘোষণার প্রতিবাদে ঢাকা শহরে এবং অন্যান্য জেলা শহরে সন্ত্রাসী ঘটনা ঘটতে থাকে। এসব স্থানে অগ্নিসংযোগের এবং বোমাবাজির ঘটনা অতিমাত্রায় বৃদ্ধি পায়। আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির এতই অবনতি ঘটে যে, বাংলাদেশ সচিবালয়ের সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীরা এক সমাবেশের আয়োজন করে ঘোষণা দেন, নিরাপত্তা নিশ্চিত না করলে তাদের পক্ষে নির্বাচনী দায়িত্ব পালন করা সম্ভবপর হবে না।

এতদসত্ত্বেও সরকার নির্বাচন অনুষ্ঠানে অনড় থাকেন। নির্বাচনের আগের দিন (১৪ ফেব্রুয়ারি) সারাদেশে অবরোধের ফলে সড়ক, নৌ এবং রেল যোগাযোগ বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। দেশের এক অঞ্চল হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। সর্বত্র নজিরবিহীন হরতালের মধ্যে এবং রাজধানীতে সেনা টহলের মধ্যে ১৫ ফেব্রুয়ারি সংসদ নির্বাচন শেষ পর্যন্ত শেষ অনুষ্ঠিত হয়।

বাস্তবে ১৫ ফেব্রুয়ারির নির্বাচন এক প্রহসনমূলক নির্বাচনে পরিণত হয়। কেননা অনেক ভোটকেন্দ্র ভোটারের উপস্থিতি তেমন ছিল না বললেই চলে। প্রায় কেন্দ্রেই অগ্নিসংযোগ, ব্যালটবাক্স ও নির্বাচনী কাগজপত্র ছিনতাই, কোনো কোনো কেন্দ্রে প্রিজাইডিং অফিসার ও পোলিং অফিসার নিখোঁজ ও আহত হন। নির্বাচন কমিশনের ঘোষিত ফলাফল অনুসারে সমগ্র দেশের ২৫০টি আসনে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে ১১৯টি আসনের ফলাফল ঘোষিত হয়। ৮৪টি আসনের বিভিন্ন কেন্দ্রে ভোটগ্রহণ সম্ভবপর হয়নি। আর ৩৫টি আসনে অতিরিক্ত ভোট পড়ে বলে ফলাফল স্থগিত রাখা হয়।

নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার অব্যাবহিত পরেই নামমাত্র যে সকল বিরোধী দল নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেছিল এবং যে সকল প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন তাদের পক্ষ থেকে নির্বাচনে ব্যাপক কারচুপির অভিযোগ আনয়ন অব্যাহত থাকে। নির্বাচন কমিশনেও একের পর এক অভিযোগ দায়ের করা হতে থাকে। শুধু দেশীয় সাংবাদিকগণই নন বিদেশ থেকে আগত সাংবাদিকদের পাঠানো প্রতিবেদনে রিপোর্ট নির্বাচনে অনিয়ম ও কারচুপির চিত্র ফুটে উঠে। সঙ্গত কারণে দেশে এবং বিদেশে নির্বাচনী ফলাফল নিয়ে প্রশ্ন উঠে। এমতাবস্থায় এটি অত্যন্ত

Dhaka University Institutional Repository

স্বাভাবিক, দেশের সকল বিরোধী দল ১৫ ফেব্রুয়ারির নির্বাচন বাতিলের জোর দাবি জানায়। (দেখুন, দৈনিক ইত্তেফাক, ২৮ ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৬)।

শুধু তাই নয়, ঢাকায় নিযুক্ত কূটনীতিক ও দাতাগোষ্ঠী (Donars) নির্বাচন পর্যবেক্ষণ করে সন্তুষ্ট হতে পারেননি। এদিকে বিরোধী দলগুলো ক্ষমতাসীন সরকারকে অবৈধ বলে চিত্রিত করতে থাকে। আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা অবৈধ সরকারকে স্বীকৃতি না দেয়া এর সাথে কোনো প্রকার সহযোগিতা না করার জন্য দাতাদেশ ও সংস্থাগুলোর প্রতি আহ্বান জানান। বিরোধী দলসমূহ ২৪ ফেব্রুয়ারি (১৯৯৬) থেকে তিন দিনের লাগাতার অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দেয়। ক্ষমতাসীন বিএনপি সরকার উক্ত অসহযোগ আন্দোলনে নীরব থাকেনি বরং অসহযোগ চলাকালে বিভিন্ন স্থানে গুলি, বোমাবাজি ও অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটানো হয়। এর পাশাপাশি ঢাকাসহ সারাদেশে সরকারের পুলিশ বাহিনী বিরোধী নেতাদের গ্রেফতারের জন্য সর্বাত্মক 'অ্যাকশন প্রোগাম' শুরু করে। কেন্দ্রীয় নেতারা জেলা ও স্থানীয় নেতাদের নাম গ্রেফতারের তালিকাভুক্ত ছিল বলে জানা যায়। বিবিসির সংবাদদাতা এ সংখ্যাকে ৪০০০ বলে উল্লেখ করেন। এ অবস্থাদৃষ্টে প্রতীয়মান হয়, অর্থনৈতিক অবস্থার চরম অবনতির দিকে যেন সরকারের কোনো দৃষ্টি নেই। জনমনে প্রশ্ন উঠে চারিদিকে সন্ত্রাস আর রাজনৈতিক অস্থিরতা আমাদের নিস্তার কোথায়? এ প্রশ্নের সঠিক উত্তর যেন কারোই জানা নেই।

১০. ১৫ ফেব্রুয়ারি নির্বাচন-উত্তর রাজনৈতিক পরিস্থিতি (Political situation in the post 15 February Election): ১৫ ফেব্রুয়ারি নির্বাচনের পর বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতির এতটুকু উন্নত হয়নি সৃষ্ট হয়নি কোনোরূপ স্বাভাবিক অবস্থা। এর প্রধান কারণ, এ নির্বাচন জনমনে কোনোরূপ উৎসাহ উদ্দীপনা জাগ্রত করেনি। একে ভোটারবিহীন নির্বাচন বললেও অত্যুক্তি হয় না। দেশের রাজনৈতিক তথা সামগ্রিক অবস্থা ক্রমেই নাজুন থেকে অধিকতর নাজুক আকার ধারণ করে।

স্বাধীনতার অব্যাবহিত পরে স্বভাবিকভাবেই জনগণ আশা করেছিল, দেশে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার পাশাপাশি গণমানুষের ভাগ্যের উন্নয়ন ঘটবে। দেশ এগিয়ে যাবে সমৃদ্ধির পথে। কিন্তু বাস্তবে দেখা গেল বিপরীত চিত্র। স্বাধীনতার ২৪ বছর পর পেছনে ফিরে তাকালে হতাশ হওয়া ছাড়া আর উপায় থাকে না। এ দীর্ঘ সময়ে দেশের জনগোষ্ঠী তথা জনশক্তি আর সামগ্রিক উৎসকে ব্যবহার করে আমাদের যতটুকু অগ্রসর হবার কথা ছিল আমরা ততটুকু অগ্রসর হতে

Dhaka University Institutional Repository

পারিনি। সংঘাত, সন্ত্রাস, অস্থিরতা আর সময়ে সময়ে অপশাসন গোটা দেশ ও জাতির অগ্রগতিকে যেন শেকল দিয়ে পিছু টেনে চলেছে।

নব্বইয়ের গণঅভ্যুত্থানের পর অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে অর্জিত গণতান্ত্রিক বিজয় ভূলুণ্ঠিত হতে চলেছে। সরকার ও বিরোধী দলসমূহ এজন্য পরস্পরকে দোষারোপ করলেও দেশের রাজনৈতিক অঙ্গন কেন সংঘাতপূর্ণ হয়ে উঠেছে তা দেশবাসীর অজানা নয়। ২২ মাসের রাজনৈতিক সংকটের মীমাংসা কেন হয়নি, একদলীয় নির্বাচনের নামে কেন এবং কিভাবে দেশময় অরাজক পরিবেশ সৃষ্টি করা হয়েছে তাও সমগ্র দেশের জনগণের জানা। রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা একটি দেশের সামগ্রিক অগ্রগতিকে কিভাবে ব্যাহত করে তার উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত যেন বাংলাদেশ। সারাদেশব্যাপী অনিয়মই যেন নিয়মে পরিণত হয়েছে।

১৫ ফেব্রুয়ারির নির্বাচনের পূর্বেই দেশে রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা এবং আইনের শাসনের অনুপস্থিতিতে মাথাচাড়া দিয়ে উঠে সন্ত্রাস নামের বিষবৃক্ষ। শহরবন্দর, নগর-গঞ্জ সর্বত্রই চলছে বিরামহীন সন্ত্রাসী তৎপরতা। নির্বাচনকে সামনে রেখে চলমান অবৈধ অস্ত্র উদ্ধার অভিযানের কারণে প্রকাশ্যে অস্ত্রবাজি কিছুটা হ্রাস পেলেও সন্ত্রাস এখনো চলছে। এখনো কথায় কথায় প্রাণ হারাচ্ছে। তবে সন্ত্রাস শব্দটির সঙ্গে রাজনীতির যেন একটা বিশেষ সম্পর্ক রয়েছে। জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারির (১৯৯৬) কতিপয় সন্ত্রাসী ঘটনার বিশেষণ সেটিই ইঙ্গিত করে। শহর নগর গ্রামগঞ্জ যেখানেই হোক না কেন অস্ত্রবাজ এবং সন্ত্রাসীদের সঙ্গে রয়েছে রাজনৈতিক দলগুলোর বিশেষ যোগসূত্র। অবৈধ অস্ত্র উদ্ধার অভিযানের সময় ঘাপটি মেরে থাকলেও এসব অস্ত্রবাজ সন্ত্রাসীরাই সারাদেশে জনগণের নাভিশ্বাস সৃষ্টি করে থাকে। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে শুরু করে শিল্পাঙ্গন, ব্যবসা প্রতিষ্ঠানসহ সমাজের সর্বত্র যারাই সন্ত্রাস করছে তাদের প্রত্যেকেরই দলীয় পরিচয় রয়েছে। তারা নিজেদের অস্তিত্বের স্বার্থে যেমনি রাজনৈতিক দলের সাথে সম্পর্ক রাখছে তেমনি এক শ্রেণীর রাজনীতিক নিজেদের অবস্থান সংহত করার জন্যও অস্ত্রবাজ সন্ত্রাসীদের পুষছে। মূলতঃ এদের হাত ধরেই সারাদেশে পল্লবিত হচ্ছে সন্ত্রাস নামের বিষবৃক্ষ। (দেখুন, চিত্রবাংলা (সাপ্তাহিক), (৯-১৫ ফেব্রুয়ারি)। এ ধরনের প্রশ্রয় ছাড়াও দেশে বিদ্যমান বেকারত্ব এবং মূল্যবোধের অবক্ষয়ের কারণেও অনেক সম্ভাবনাময় তরুণ সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িয়ে পড়ছে। বর্তমানে সারাদেশে সংঘটিত সন্ত্রাসী তৎপরতার মাঝে অধিকাংশই হচ্ছে 'রাজনৈতিক সন্ত্রাস' (Political Violence) আর ১৫ ফেব্রুয়ারির একদলীয় নির্বাচনকে ঘিরে সন্ত্রাস

Dhaka University Institutional Repository

এতই বৃদ্ধি পেতে থাকে যে, এর ফলে দেশ যেন এক অনিশ্চিত গন্তব্যের দিকে ছুটে চলেছে। (দেখুন, চিত্রবাংলা (সাপ্তাহিক), (৯-১৫ ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৬)।

গণতন্ত্র রাজনৈতিক রূপ দেয়া এবং রাষ্ট্র পরিচালনায় ক্ষেত্রে শাসনতান্ত্রিক ধারা অব্যাহত রাখার যে সুযোগ গণঅভ্যুত্থান ও ১৯৯১ এর নিরপেক্ষ নির্বাচন পরবর্তী পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছিল তাকে কাজে লাগাতে ব্যর্থ হয়েছেন খালেদা জিয়া। তিনি সাংবিধানিক পথকে সমুন্নত রাখার অঙ্গীকার করলেও তার ক্ষমতার পাদপ্রদীপে আসার ইতিহাসকে তিনি অস্বীকার করে চেয়েছিলেন। ১৯৯১ এর তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচিত হয়ে তিনি যদি বাংলাদেশের সত্যিকার গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় এগিয়ে আসতেন তিনি যদি দেশে জবাবদিহিমূলক সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে সচেষ্ট হতেন, মাগুরা-মিরপুরের মতো উপনির্বাচনে যদি তার দল ভোটকারচুপির আশ্রয় না নিতো– সংসদে তার প্রতিটি কর্মকাণ্ডের জবাবদিহিতার জবাবদিহিতার ব্যবস্থা করতেন তাহলে বিরোধী দল পরবর্তীতে পদত্যাগের সিদ্ধান্ত নিতে পারত না। পঞ্চম সংসদ প্রতিষ্ঠার পর একটি বিষয় লক্ষ্যণীয় ছিল তা হচ্ছে সংসদ নেত্রী সংসদকে এগিয়ে চলতে চেয়েছেন, নিয়মিত সংসদে আসতেন না এমনকি সরকারি সাংসদরা বিরোধী দলকে সংসদে কথা বলার সুযোগ দিতে চাইতেন না এবং সংখ্যাগরিষ্ঠতার বলে বিরোধীদলীয় সাংসদদের দাবিয়ে রাখতে চাইতেন। জাতীয় সংসদের স্পিকার দলীয় স্পিকারের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন। সব মিলিয়ে পরিস্থিতিই বিরোধী দলকে সংসদ থেকে রাজপথে নিয়ে আসে এবং পরবর্তীতে বিরোধী দলের একযোগে পদত্যাগের ঘটনা ঘটে।

পঞ্চম জাতীয় সংসদ ভেঙ্গে দেবার পরও সমঝোতার পথ খোলা ছিল। কিন্তু বিএনপি সরকার সংবিধানের দোহাই দিয়ে সে পথ অগ্রাহ্য করেছে। অথচ সংবিধান হচ্ছে- দেশ জাতির আশা আকাঙ্ক্ষার প্রতীক। কিন্তু বিএনপি সরকার সাংবিধানিক যুক্তি দাঁড় করিয়ে দলগুলোকে উপেক্ষা করে একদলীয় নির্বাচন অনুষ্ঠানের সচেষ্ট হয়। আর বিরোধী দলের ভাষায় এ প্রহসনমূলক নির্বাচন প্রতিরোধ করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। আর বিরোধী দলের ভাষায় এ প্রহসনমূলন নির্বাচন প্রতিরোধ করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। এর ফলে ১৫ ফেব্রুয়ারির নির্বাচনকে ঘিরে ক্রমবর্ধমান সন্ত্রাসী ঘটনা ও অস্থির রাজনীতি দেশের ভবিষ্যত নতুন করে অনিশ্চিত করে তুলেছিল। এ পরিস্থিতিতে দেশবাসী নিজেদের অর্থনৈতিক ভবিষ্যত ও নিরাপত্তার কথা ভেবে শঙ্কিত হচ্ছিল।

Dhaka University Institutional Repository

যেভাবেই মূল্যায়ন করা হোক না কেন তিনটি বিরোধী দলকে বাইরে রেখে ষষ্ঠ জাতীয় সংসদ নির্বাচন কতটা গ্রহণযোগ্যতা পাবে তা ছিল রীতিমত ভাবনার বিষয়। একদিকে যেমন সরকার তার অস্তিত্ব রক্ষায় স্বার্থেই যেকোনো মূল্যে নির্বাচন করতে চাইছিল আবার বিরোধী দলগুলোও তাদের সর্বশক্তি দিয়ে নির্বাচন প্রতিহত করার চেষ্টা করছিল এবং নির্বাচন প্রতিহত করার উদ্দেশ্যে বিশেষ কর্মসূচি দিচ্ছিল তার ফলে দেশের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি দ্রুত অবনতি হয়।

এ অবস্থায় রাজনৈতিক পর্যবেক্ষক মহলের ধারণা ছিল নির্বাচন সম্পূর্ণ করতে পারলেও বিরোধী দলীয় আন্দোলনের মুখে বিএনপি সরকার খুব বেশি দিন তার একদলীয় সংসদ টিকিয়ে রাখতে পারে না। আর ১৫ ফেব্রুয়ারির পর থেকেই যে বিরোধী দল সরকার পতনের দাবিতে আন্দোলনে যাবে তা ছিল প্রায় নিশ্চিত এবং তখন নৈতিকভাবে দুর্বল বিএনপি সরকারের পতনের আন্দোলনও সহজেই জমে উঠবে। পর্যবেক্ষকদের মতে ১৫ ফেব্রুয়ারি পরবর্তী একদলীয় বিএনপি সরকার হয়তো পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিল পাস করে জনগণের সমর্থন করাবার চেষ্টা করবে। কিন্তু দেশের সামগ্রিক পরিস্থিতি ততক্ষণ পর্যন্ত সরকারি দলের নিয়ন্ত্রণের মধ্যে থাকবে কিনা তাও ছিল ভাববার বিষয়।

১৯৯৬ সালের ফেব্রুয়ারির নির্বাচনকে কেন্দ্র করে নির্বাচন-পূর্ববর্তী সহিংসতা সাধারণ মানুষকে বিপন্না করে তোলে। আর এ রাজনৈতিক অস্থিরতা, অস্থিতিশীলতা ভোট এবং চলমান ও রাজনৈতিক নেতৃত্বের প্রতি সাধারণ মানুষের মধ্যে যে বিতৃষ্ণার মনোভাব সৃষ্টি করেছিল তা দেশের রাজনৈতিক উন্নয়নকে আরো মন্থর করে দেয়ার সম্ভাবনারই আলামত ছিল। আর এ থেকে উত্তরণের প্রথম পদক্ষেপ নেয়ার দরকার ছিল সকল দলের অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে একটি অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন। যা ভোটারদের মধ্যে রাজনীতির প্রতি নতুন আশার সঞ্চার করতে পারে। এছাড়া তখন আর কোনো বিকল্প পথ খোলা ছিল না।

১৫ ফেব্রুয়ারি (১৯৯৬)-এর নির্বাচন কার্যত বিরোধী দল ছাড়াই অনুষ্ঠিত হয়ে যায় জাতীয় সংসদ নির্বাচন। সঙ্গত কারণেই বিরোধী দলগুলো নির্বাচন প্রত্যাখ্যান করে। অতঃপর তারা বিদ্যমান সংকট নিরসনের জন্য ১০ মার্চ প্রেসিডেন্টের সাথে আলোচনায় বসবে বলে ঠিক হয়। কিন্তু ইতিমধ্যে একের পর এক সহিংস ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছে মানুষ, নষ্ট হয়েছে জাতীয় সম্পদ ও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে দেশের অর্থনীতি। পৃথিবী জুড়ে রাজনৈতিক অর্থনৈতিক উন্নয়নের বিপরীতে বাংলাদেশের চলার পথ তৈরি হয়েছে দুর্লভ প্রাচীর।

Dhaka University Institutional Repository

রাজনৈতিক অস্থিরতার মধ্যে ১৫ ফেব্রুয়ারি জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়াকালে অনেকের ধারণা ছিল সাংবিধানিক ধারাবাহিকতায় নির্বাচন সম্পন্ন হবার পর আরেকটি গ্রহণযোগ্য নির্বাচন অনুষ্ঠানের পথ সুগম হবে। কিন্তু সরকার সে পথে না গিয়ে ১৫ ফেব্রুয়ারিতে নির্বাচিত একদলীয় সরকারকে স্থায়ী রূপ দিতে সচেষ্ট হয়। যা ছিল ইচ্ছার বিরোধী।

বিরোধী দল ভোট ডাকাতি, সন্ত্রাস এবং নির্যাতনের অভিযোগে এ নির্বাচনকে অবৈধ বলে প্রত্যাখ্যান করে এবং সরকারকেও অবৈধ বলে আখ্যায়িত করে। তারা সরকারের সাথে কোনরূপ আপস মীমাংসায় অস্বীকৃতি জানায়। দেশ অনির্দিষ্টকালের জন্য অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দেয়। কেবলমাত্র প্রধানমন্ত্রী পদত্যাগ এবং ৯০ দিনের মধ্যে আবার নির্দলীয় নিরপেক্ষ অস্থায়ী সরকারের অধীনে অবাধ নির্বাচন অনুষ্ঠানের নিশ্চয়তা পেলে তাদের কর্মসূচি প্রত্যাহার করবেন।

বাংলাদেশে এ রাজনৈতিক সঙ্কটের তথা জাতীয় সংকটের সূত্রপাত ১৯৯০ সালের মতো নিরপেক্ষ, নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবিকে কেন্দ্র করে। এর আগে ১৯৯৫ সালের মার্চে সাবেক তথ্যমন্ত্রী ব্যারিস্টার নাজমুল হুদার এক মন্তব্যের প্রতিবাদে বিরোধী দলগুলো সংসদ থেকে ওয়াক আউট করে। পরবর্তী অসাধু রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার কারণে এ ওয়াক আউটই পরিণত হয় সংসদ বর্জন নামক দলীয় বিরোধী রাজনৈতিক আন্দোলনে।

এরপর ২৭ জুন (১৯৯৫) বিরোধী দলগুলো পাশাপাশি তত্ত্বাবধায়ক সরকারের রূপরেখা ঘোষণা করে এবং এ দাবি বাস্তবায়নের জন্য সংসদ বর্জন আন্দোলনের পাশাপাশি মাঠ পর্যায়ে দুর্বার আন্দোলন গড়ে তুলতে সচেষ্ট হয়। আন্দোলনের মুখে সরকারি দল প্রধান বিরোধী দলগুলোর নেতাদের সাথে আলোচনায় বাধ্য হয় রাজনৈতিক মীমাংসার আশায়। কিন্তু কোনো সুরাহা না হওয়ায় বিরোধী দল তাদের আন্দোলন চালিয়ে যায়। এ সংকট উত্তরণের লক্ষ্যে পৃথিবীব্যাপী নতুন গণতান্ত্রিক জোয়ারের পরিবেশে আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক নেতাদের দৃষ্টি পরে বাংলাদেশের সংকট সমাধানের লক্ষে। কমনয়েলথ মহাসচিব এমেকা এনিয়াকু এবং তাঁর দূত স্যার নিনিয়ান সরকারি ও বিরোধী দলগুলোর মধ্যে একটি স্পষ্ট মীমাংসার উদ্যোগ নেন। কিন্তু এ মহাপ্রচেষ্টাও কোনো সমাধা বের করতে চেষ্টা করতে ব্যর্থ হয়। এভাবে পরবর্তী আরো প্রচেষ্টা চালানো সত্ত্বেও গভীর সঙ্কটের মধ্য দিয়ে পার হয়ে যায় পুরো একটি বছর। এরপর

Dhaka University Institutional Repository

নতুন বছরে পা দিয়ে বিরোধী দল তাদের দাবি সামনে রেখে আন্দোলন আরো তীব্র করে তোলে।

বিরোধী দলীয় আন্দোলনে বছরের (১৯৯৬ সাল) প্রথম দুই মাসে অচল হয়ে পড়ে দেশ। কিন্তু সরকার বিরোধী দাবিকে উপেক্ষা করে এ বিক্ষুব্ধ রাজনৈতিক অবস্থার মধ্যেই ১৯৯৬ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারিকে সামনে রেখে ষষ্ঠ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করে। সাংবিধানিক ধারাবাহিকতা রক্ষার নামে বিরোধী দলীয় ভাষায় এ প্রহসনের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় প্রচণ্ড সহিংসতা ও বিরোধী দলীয় বাধার মুখে। কিন্তু সংকট এতে আরো বৃদ্ধি পেল এবং নির্বাচন পরবর্তী বিরোধী দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কনসেপ্ট নীতিগতভাবে মেনে নিয়ে বলেন, "যে সমস্যার সাথে গোটা দেশ, জাতি, জনগণ এবং গণতন্ত্র প্রত্যক্ষভাবে জড়িত এ ধরনের সমস্যার একাধিক সমাধান থাকতে পারে। তাই এসব সমাধানের প্রস্তাব নিয়ে বিস্তারিত আলাপ-আলোচনা হওয়া প্রয়োজন। এরমধ্যে যে সমাধান সর্বাপেক্ষা গ্রহণযোগ্য বলে প্রতীয়মান হবে জাতীয় স্বার্থে তা গ্রহণ করতে আমরা প্রস্তুত। (দেখুন, সাপ্তাহিক পূর্ণিমা, ৬ই মার্চ ১৯৯৬, ৯ম বর্ষ, ২৯ সংখ্যা)।

প্রদত্ত ভাষণে প্রধানমন্ত্রীর তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রস্তাবের মধ্যে ছিল ঃ

১। দেশ ও জনগণের সামগ্রিক স্বার্থ বিবেচনা করে ভবিষ্যত সকল জাতীয় নির্বাচনকালীন নির্দলীয় সরকার গঠন করা হবে। প্রস্তাবিত এ সরকার দৈনন্দিন সরকারি কার্যকাণ্ড পরিচালনা করবেন। নতুন কোনো নীতিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন না। নির্বাচন কমিশন নির্বাচন পরিচালনা করার পূর্ণ দায়িত্ব ও ক্ষমতাপ্রাপ্ত থাকবে। (২) ষষ্ঠ জাতীয় সংসদে প্রথম অধিবেশনে আমরা এ বিষয়ে সংবিধানের প্রাসঙ্গিক সংশোধনী বিল আনব। যত শিগগিরই সম্ভব এ সংশোধনী বিল পাস করানোর এবং সংবিধান অনুযায়ী গণভোটের ব্যবস্থা করা হবে। (৩) অতঃপর ন্যূনতম সময়ের মধ্যে ৭ম জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত করার ব্যবস্থা নেয়া হবে। (দেখুন, সাপ্তাহিক পূর্ণিমা-৬ মার্চ, ১৯৯৬; ৯ম সংখ্যা)।

প্রধানমন্ত্রীর এ তত্ত্বাবধায়ক প্রস্তাব স্থবিরতার মধ্যে কিছুটা আশার সঞ্চার করলেও বিরোধী দল এ প্রস্তাব কয়েকটি কারণে প্রত্যাখ্যান করে। আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা এক বিবৃতিতে বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া তাঁর ভাষণে নির্দলীয় সরকারের অধীনে

Dhaka University Institutional Repository

নির্বাচনের কথা বলছেন, কিন্তু এ ব্যাপারে কোনো সুনির্দিষ্ট সময়সীমার কথা উল্লেখ করেননি। (দেখুন, সাপ্তাহিক পূর্ণিমা ৬ মার্চ, ১৯৯৬, ৯ম বর্ষ ২৯ সংখ্যা ।

বিরোধী দলের দাবির প্রেক্ষিতে প্রেসিডেন্ট আব্দুর রহমান বিশ্বাসও এগিয়ে আসেন। বিরোধী ও সরকারি দলগুলোর সাথে আলোচনার মাধ্যমে গভীর সঙ্কটের পাহাড় এক বিন্দুও টলেনি। মানুষের ভেতর সমঝোতা এবং সংকট নিরসনের আশা প্রবলভর হলেও কার্যত কোনো ফলাফল বেরিয়ে আসেনি। ফল হয় বিরুপ। দেশের অর্থনীতির অবয়ব আরো দুর্বল ও জরাজীর্ণ হয়ে পড়েছে। ধারাবাহিক রাজনৈতিক অস্থিরতা ও অনিশ্চয়তা গোটা দেশের অর্থনীতিকে জিম্মি করে ফেলে। ব্যক্তি বিশেষের ক্ষমতার আকাঙ্ক্ষা গোটা দেশের অগ্রযাত্রাকে বিপন্ন করে তোলে।

মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তী বিধ্বস্ত দেশ যখন উন্নয়নের পথে পা দিয়েছে তখন থেকেই নেমে আসে একের পর এক বাধা। দীর্ঘ ২৪ বছরেও দেশের রাজনৈতিক ব্যবস্থা প্রাতিষ্ঠানিকতা পায়নিঃ রাজনৈতিক অস্থিরতা দেশের আইন-শৃঙ্খলা ও অর্থনীতিকে করেছে জরাজীর্ণ; জনগণ রাজনীতির প্রতি আস্থা হারিয়েছে। আর রাজনৈতিক দলগুলো পরস্পরকে করছে সন্দেহ ও অবিশ্বাস। অবিশ্বাস থেকে শুরু হয়েছে সন্ত্রাস ও হানাহানি যার থেকে মুক্তি লাভ করা কঠিন হয়ে পড়বে।

পর্যবেক্ষক মহলের মতে সরকারি ও বিরোধী দল পরস্পরের প্রতি অভিযোগের যে লম্বা তালিকা হাজির করেছে তাতে কোনো সমাধান কখনোই বের হয়ে আসতে পারে না। এ সমাধানের জন্য প্রয়োজন সকলকে নিয়ে একটি যুক্তিগ্রাহ্য কাঠামোর মধ্যে আলোচনায় বসা। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থা সংবিধানের মাধ্যমে প্রয়োজনে সংবিধান পরিবর্তন করে সকল সমস্যার সমাধার পথ বের করা। কারণ মানুষের মঙ্গল ও উন্নয়নের মধ্যেই সংবিধানের সার্থকতা। সংকট সমাধানের জন্য ভীষণ প্রয়োজন সংলাপ। তা নাহলে সরকারের পক্ষেও যেমন বিরোধী দাবি মেটানো সম্ভব নয় তেমনি বিরোধী দলের পক্ষেও সম্ভব নয় তাদের ইতিবাচক ধারায় প্রবাহিত করা।

১১. সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনী (13th Amendment to the Constution) : ১৯৯৬ সালের ২১ মার্চ দেশে অবাধ সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষভাবে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের উদ্দেশে নির্বাচন কমিশনকে সাহায্য-সহায়তা প্রদান এবং সংবিধানের অধীন অর্পিত দায়িত্ব পালনের জন্য নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠনের লক্ষ্যে সংবিধানের কতিপয় বিধানের অধিকতর সংশোধনকল্পে ত্রয়োদশ বিল উত্থাপন করা হয়। ২৪ মার্চ আইনমন্ত্রীর প্রস্তাব অনুযায়ী ১০ সদস্য

Dhaka University Institutional Repository

বিশিষ্ট একটি বাছাই কমিটিতে বিলটি প্রেরণ করা হয়। এর পূর্বে বিলটির ওপর সাধারণ আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। অতঃপর ২৫ মার্চ বাছাই কমিটি এর রিপোর্ট প্রদান করে এবং এবং ২৩ মার্চ বিলটি সর্বসম্মতিক্রমে ২৬৮-০ ভোটে পাস হয়। (দেখুন, দৈনিক ইত্তেফাক ৩১ মার্চ, ১৯৯৪)।

ত্রয়োদশ সংশোধনী বিলের মূল বিষয়সমূহ (Salient Features of the 13th Amendment) ঃ ত্রয়োদশ সংশোধনী বিলের মূল বিষয়সমূহ নিম্নরূপ ঃ

১. জাতীয় সংসদ ভেঙ্গে দেয়ার ১৫ দিনের মধ্যে প্রেসিডেন্ট ১১ সদস্য বিশিষ্ট একটি উপদেষ্টা পরিষদ গঠন করবেন। তাদের মধ্য হতে একজনকে প্রধান উপদেষ্টা নিয়োগ করা হবে।

২। প্রধান উপদেষ্টা প্রধানমন্ত্রীর এবং উপদেষ্টাগণ মন্ত্রীর পদমর্যাদা ও সুযোগ-সুবিধা ভোগ করবেন।

৩. এ সরকার নীতি নির্ধারণী কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারবেন না।

৪. সর্বশেষ অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি অথবা আপিল বিভাগের বিচারক অথবা কোনো নাগরিককে প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে পাওয়া না গেলে অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসেবে প্রেসিডেন্ট প্রধান উপদেষ্টার পদ অলংকৃত করবেন। তবে সেক্ষেত্রে প্রেসিডেন্টকে পুনরায় শপথ নিতে হবে এবং এ শপথবাক্য পাঠ করাবেন বিচারপতি।

৫. প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর সাথে আলোচনাক্রমে বাংলাদেশের নাগরিকদের মধ্য হতে ১০ উপদেষ্টা নিয়োগের ক্ষমতা প্রেসিডেন্টকে দেয়া হয়।

৬. জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠানের তিনমাস পূর্বে এ নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠিত হবে এবং নতুন প্রধানমন্ত্রী নিয়োগের পূর্ব পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করবে।

এ নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিল তথা সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনী বিলটি পাস হওয়ার পর পরই প্রধানমন্ত্রী ও সংসদনেত্রী এক সংক্ষিপ্ত ভাষণে বলেন, ষষ্ঠ সংসদ এক ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালন করেছে। তিনি আরো বলেন, বিরোধী দলের দাবিসমূহ এতে সন্নিবেশিত হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনী বিল পাসের পরবর্তী ঘটনা প্রবাহ (Events Since the Passage of the 13th Amendment): জাতীয় সংসদের সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনী বিল পাসের পরবর্তী ঘটনাসমূহের মধ্যে প্রধানমন্ত্রীর পদত্যাগ, জাতীয় সংসদ বাতিল এবং তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা নিয়োগ সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া ২৯ মার্চ বঙ্গভবনে প্রেসিডেন্টের সাথে সাক্ষাত করে এবং ক্ষমতা হতে সরে দাঁড়ানোর সিদ্ধান্ত ব্যক্ত করেন। তিনি সে সাথে সম্ভাব্য স্বল্প সময়ের মধ্যে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠনের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়ার জন্য প্রেসিডেন্টকে অনুরোধ জানান। বাস্তবিক পক্ষে তাঁর গণআন্দোলনের চাপে প্রধানমন্ত্রী এ সিদ্ধান্ত ব্যক্ত করেন বলে পর্যবেক্ষকগণ মনে করেন।

৩০ মার্চ (১৯৯৬) প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শক্রমে প্রেসিডেন্ট জাতীয় সংসদ ভেঙ্গে দেন। অতঃপর প্রেসিডেন্ট প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর সাথে আলোচনার প্রেক্ষিতে সাবেক বিচারপতি হাবিবুর রহমান বঙ্গভবনে প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন। তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠনের পর টেলিভিশনের সাথে এক সাক্ষাতকারে প্রেসিডেন্ট আশা প্রকাশ করেন, এর ফলে দেশের চলমান অস্থিরতা দূরীভূত হবে এবং অর্থনীতি আবার চাঙ্গা হয়ে উঠবে। তিনি আরো বলেন, তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠনের যে দাবি বিরোধী দলসমূহ করেছিল তা এতদিনে পূরণ হলো। এখন দেশবাসী যাতে নির্বিঘ্নে সংসদে তাদের প্রতিনিধি প্রেরণ করতে পারে সেজন্য তিনি সকলের সহযোগিতা কামনা করেন। নির্দলীয় সরকারের ওপর যে দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে তা যাতে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয় সেজন্যও তিনি সকলের সহযোগিতা চান। (দেখুন, দৈনিক ইত্তেফাক, ৩১ মার্চ ১৯৯৪)

খালেদা জিয়ার শাসনামলের মূল্যায়নঃ

বিচারপতি সাহাবুদ্দীন সাহবের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে ১৯৯১ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারির নির্বাচনে আপসহীন নেত্রীর খেতাবে ভূষিত হয়ে বেগম খালেদা জিয়া সরকার গঠন করেন। সংবিধান সংশোধন করে রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারের বদলে দেশে সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা কায়েম করা হয়। কিন্তু বিভিন্ন কারণে বিরোধী দলের সংসদ বর্জনের রাজনীতির প্রাণকেন্দ্রে পরিণত হতে পারেনি। এক্ষেত্রে সরকারি দলের দায়ও নিতান্ত কম নয়। স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী সংসদে তার যথাযথ দায়িত্ব পালন করেননি বলেও অভিযোগ রয়েছে। উপরন্তু পরবর্তী জাতীয় সংসদ নির্বাচন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত হবে এ দাবি নিয়ে সকল বিরোধী দল

Dhaka University Institutional Repository

একযোগে যখন আন্দোলন সংগ্রাম করছিল তখন গায়ের জোরে ভোটারবিহীন নির্বাচন ১৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৬ অনুষ্ঠিত হয় এবং জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যান। অতঃপর দেশি, বিদেশি চাপের মুখে সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনীর মাধ্যমে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা প্রণয়ন করে সংসদ ভেঙ্গে দেন এবং ক্ষমতা থেকে সরে দাঁড়ান। বেগম জিয়া তার শাসনামলে বিরাট সুযোগ থাকা সত্ত্বেও বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে গতিশীল ও দ্বন্দ্বময় করে তুলতে পারেননি। বরং তার শাসনামলে গণতন্ত্রের ছন্দপতন ঘটেছে। এরই পরিণতিতে ১৯৯৬ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বাধীন রাজনৈতিক দল বিএনপি শোচনীয় পরাজয় বরণ করে।

Dhaka University Institutional Repository

শেখ হাসিনার শাসনামল:

সপ্তম জাতীয় সংসদ নির্বাচন ১৯৯৬ (Seventh Jatio Sangsad Election 1996) : বাংলাদেশের ইতিহাসে জাতীয় সংসদ নির্বাচন একটি অন্যতম ঘটনা। নির্বাচন যাতে সুষ্ঠু, অবাধ ও নিরপেক্ষ হয় সেদিকে দৃষ্টি রেখে নির্বাচন কমিশন ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করে। ওই নির্বাচনে মোট ভোটার সংখ্যা ছিল ৫ কোটি ৬৭ লাখ ১৬ হাজার ৯৩৫ জন। ভোটারদের ভোট প্রদানের জন্য সারাদেশে ২৫ হাজার ৯৫৭টি ভোটকেন্দ্র স্থাপন করা হয়। নির্বাচনী সময়ে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য সারাদেশে সরকার সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী, বিডিআর, পুলিশ ও আনসার বাহিনী মোতায়েন করে। দেশের নির্বাচনী ইতিহাসে এ প্রথমবারের মতো রেকর্ডসংখ্যক পর্যবেক্ষক নির্বাচন পর্যবেক্ষক্ষণ করে। প্রায় দু'শ বিদেশি পর্যবেক্ষক ছিলেন। বিদেশি পর্যবেক্ষকদের মধ্যে ছিলেন, ইউরোপীয়ান ইউনিয়ন, সার্ক ফোরাম, কমনওয়েলথ, মার্কিনভিত্তিক এনডিআই, এশিয়া ফাউন্ডেশন, নরওয়ে জিয়াস ও জাপানের প্রতিনিধিসহ আরো কয়েকটি দেশে ও সংস্থার প্রতিনিধি।

সপ্তম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের সংসদের ৩০০টি আসনে মোট ২ হাজার ৫৭৪ প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। এরমধ্যে ২৭৯ স্বতন্ত্র প্রার্থী ছিলেন। নির্বাচনে প্রায় ৮০টি দল ও জোট অংশগ্রহণ করে। এর মধ্যে আওয়ামী লীগ, বিএনপি ও জামায়াতে ইসলামী সবকটি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। আর জাতীয় পার্টি ২৯৪টি আসনে প্রার্থী মনোনয়ন দান করে। একক্ভাবে আওয়ামী লীগ নেত্রী শেখ হাসিনা ৩টি, জাতীয় পার্টি নেতা হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ ৫টি ও বিএনপি নেত্রী খালেদা জিয়া ৫টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন।

নির্বাচনী প্রচারাভিযানে রাজনৈতিক দলগুলো ক্ষমতায় গেলে ভবিষ্যতে জনগণের কল্যাণে কি ধরনের কর্মসূচি গ্রহণ করবে তা ভোটারদের কাছে উপস্থাপন করে। আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা আওয়ামী লীগের অতীত শাসনামলের ভুলত্রুটির জন্য ভোটার জনগণের কাছে ক্ষমতা প্রার্থনা করেন। দলীয় নির্বাচনী ইশতেহারেও অতীতের ভুলভ্রান্তিকে ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখার জন্য দেশবাসীর জন্য আহ্বান জানানো হয়। বিএনপি সভানেত্রী খালেদা জিয়া তুলে

Dhaka University Institutional Repository

ধরেন, বিএনপির শাসন ছিল স্বর্ণযুগ। তিনি উল্লেখ করেন, এ দেশকে মালয়েশিয়া, কোরিয়া কিংবা সিঙ্গাপুরের মতো উন্নয়নশীল দেশে পরিণত করার জন্য বিএনপি সরকার সেসব কর্মসূচি গ্রহণ করে। তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের নামে ১৭০ দিনে হরতাল করে তা বাস্তবায়ন করতে দেয়া হয়নি। দেশের অর্থনীতিতে ক্ষতি হয়েছে। তিনি জনগণকে স্মরণ করে দেন, বিএনপি সরকার চাকরির বয়সীমা বৃদ্ধি, পেনসনের মেয়াদ বৃদ্ধি প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ নিয়েছিল।

জাতীয় পার্টির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান মিজানুর রহমান এরশাদ সরকারের ৯ বছরের শাসনামলের সংস্কার কর্মসূচির উল্লেখ করেন। জামায়াতের আমীর অধ্যাপক গোলাম আযম সৎ লোকের শাসন এবং কোরান ও সুন্নাহভিত্তিক আইন প্রণয়নের লক্ষ্যে জামায়াতে ইসলামী ভোট দেয়ার জন্য দেশবাসীর প্রতি আহ্বান জানান। এ চারটি প্রধান দলসহ নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী রাজনৈতিক দলগুলো নির্বাচিত স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান বিশেষ করে জেলা, থানা ও ইউনিয়ন পরিষদের ক্ষমতা বৃদ্ধি এবং নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে জেলা ও থানা পরিষদ গঠনের অঙ্গীকার ব্যক্ত করে। ফারাক্কার পানির ন্যায্য হিসাব আদায় এবং ২৫ বছর মেয়াদি মৈত্রী চুক্তি নবায়ন না করার কথা প্রধান ৪টি দলই তাদের ইশতেহারে উল্লেখ করে। এছাড়া সংবাদপত্রের স্বাধীনতা এবং বিচার বিভাগকে নির্বাচনী বিভাগ থেকে পৃথকীকরণের অঙ্গীকারও চারটি দলই ব্যক্ত করে।

অবশেষে ১২ জুন নির্ধারিত তারিখে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় এবং এতে প্রায় শতকরা ৭৩ জন ভোট প্রদান করেন। চূড়ান্ত ফলাফলে দেখা যায়, আওয়ামী লীগ ১৪৬টি, বিএনপি ১১৬টি, জাতীয় পার্টি ৩২টি, জামায়াতে ইসলামী ৩টি, ইসলামী ঐক্যজোট ১টি, জাসদ (রব) ১টি ও স্বতন্ত্র ১টি আসন লাভ করে। বিস্তারিত নিচের সারণীতে দেয়া হলো ঃ

Dhaka University Institutional Repository

সপ্তম জাতীয় সংসদ নির্বাচন (১৯৯৬)

দল	মোট প্রার্থী	নির্বাচিত প্রার্থী
আওয়ামী লীগ	৩০০	১৪৬
বিএনপি	৩০০	১১৬
জাতীয় পার্টি	২৯৪	৩২
জামায়াতে ইসলামী	৩০০	৩
ইসলামী ঐক্যজোট	১৬৩	১
জাসদ (রব)	৬৮	১
জাকের পার্টি	২৩৯	--
গণফোরাম	১০৫	--
ফ্রিডম পার্টি	৫৫	--
সিপিবি	৬৭	--
খেলাফত আন্দোলন	৪৮	--
ওয়ার্কার্স পার্টি	৩৫	--
বাসদ (খালেক)	৩০	--
স্বতন্ত্র	২৭৯	১
অন্যান্য	--	--
সর্বমোট	--	৩০০

জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ এককভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে এবং এবং স্বতন্ত্রভ প্রার্থী আওয়ামী লীগের যোগদান করায় মোট সংখ্যা ১৪৭-এ দাঁড়ায়। সংক্ষিপ্ত মহিলা আসনের ৩০টির মধ্যে আওয়ামী লীগ পায় ২৭টি আসন এবং জাতীয় পার্টি লাভ করে ৩টি আসন। ২৩ জুন রাষ্ট্রপতি আওয়ামী লীগ পায় ২৭টি আসন এবং জাতীয় পার্টি লাভ করে ৩টি আসন। ২৩ জুন রাষ্ট্রপতি আওয়ামী লীগ নেত্রী শেখ হাসিনাকে সরকার গঠনের আহ্বান জানান এবং ফলে শেখ হাসিনা ওইদিন বিকেলে পার্টিতে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে আরো ১৯ জন মন্ত্রীসহ শপথ গ্রহণ করেন। আওয়ামী লীগকে জাতীয় পার্টি ও জাসদ (রব) নিঃশর্ত সমর্থন দান করায়

Dhaka University Institutional Repository

জাতীয় পার্টির সচিবকেও জাসদ নেতা রবকে মন্ত্রিত্ব দেয়া হয়। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এ সরকারকে কোয়ালিশন সরকার না হলে 'জাতীয় ঐক্যমতের সরকার' বলে আখ্যায়িত করেন।

শেখ হাসিনার সরকার ও কার্যক্রম (Sheikh Hasina Government and Activities) :

১৯৯৬ সালের ১৪ জুলাই সপ্তম জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম বৈঠকেই বিএনপি সংসদ থেকে ওয়াকআউট করে। বিএনপি তাদের দলীয় স্পিকার শেখ রাজ্জাক আলীর কাছে অধিকার প্রস্তাব উত্থাপন করলে তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেন। এদিনই বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় হুমায়ুন রশিদ চৌধুরী স্পিকার এবং এডভোকেট আব্দুল হামিদ ডেপুটি স্বিকার নির্বাচিত হন।

১৯৯৬ সালের ২২ জুলাই প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহমদের মনোনয়নপত্র জমা দেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী আব্দুস সামাদ আজাদ ও জিলুর রহমানসহ আওয়ামী লীগ নেতারা। প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ একক প্রার্থী হওয়ায় নির্বাচন কমিশন ২৩ জুলাই তাঁকে প্রেসিডেন্ট হিসেবে ঘোষণা দেন। বিচারপতি সাহাবুদ্দিনকে রাষ্ট্রপতি নিয়োগের বিষয়টি দেশে বিদেশে ব্যাপক প্রশংসা অর্জন করে।

১৯৯৬-এর ২৮ জুলাই আওয়ামী লীগ সরকারের অর্থমন্ত্রী শাহ এএমএস কিবরিয়া ১৯৯৬-৯৯ অর্থবছরের করমুক্ত উদ্বৃত্ত বাজেট পেশ করে। এ তারিখে জাতীয় পার্টির নেতা ঢাকা মহানগরীর সাবেক মেয়র নাজিউর রহমান মঞ্জু আত্মসমর্পণ করে। তাকে কারাগারে প্রেরণ করা হয়। শেখ হাসিনা চট্টগ্রামের এক জনসভায় বলেন, তার সরকারের কোনো মন্ত্রী এমপি দুর্নীতি করলে তার বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

শেখ হাসিনার সরকারের পথ পরিক্রমণের প্রথম দিকেই ১৩ আগস্ট, ১৯৯৬-এ শেখ মুজিবুর রহমানের আত্মস্বীকৃত খুনি ফারুক, শাহরিয়ার ও খায়রুজ্জামানকে পুলিশ গ্রেফতার করে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রণালয়ের বরাত দিয়ে বলা হয়, রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার প্রশ্নে ক্ষতিকর ভূমিকায় লিপ্ত থাকার অভিযোগে তাদেরকে আটক করা হয়।

সরকার ১৫ আগস্টকে জাতীয় শোক দিবস হিসেবে ঘোষণা করে দিনটিকে সরকারি ছুটি ঘোষণা করে। ক্ষমতায় প্রত্যাবর্তনের পরে আওয়ামী লীগ কর্তৃক শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি প্রদান করা হয়।

Dhaka University Institutional Repository

সপ্তম জাতীয় সংসদের অন্যতম উল্লেখযোগ্য ঘটনা হলো ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ বাতিল বিল উত্থাপন এবং পাস। ১৯৯৬ এর ১২ নভেম্বর ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ বাতিল বিল সর্বসম্মতিক্রমে সংসদে পাস হয়। বিরোধীদলীয় সদস্যগণ তখন সংসদে উপস্থিত ছিলেন না। এ অধ্যাদেশ বাতিলের ফলে শেখ মুজিবুর রহমান, তাঁর পরিবারবর্গ ও জেলে চার নেতার হত্যাকাণ্ডে জড়িত দোষী ব্যক্তিদের বিচারে বাধা অপসারিত হয়।

শেখ হাসিনা সরকার ও গঙ্গার পানি বণ্টন চুক্তি (Sheikh Hasina's Government and Water Distribution) : ১৯৯৬-এর ১২ ডিসেম্বর বাংলাদেশের জাতীয় রাজনীতিতে এক ঐতিহাসিক ঘটনার সংযোজন ঘটে। মাত্র পাঁচ মাসের শেখ হাসিনার সরকার ভারতের সঙ্গে গঙ্গার পানি বণ্টন সংক্রান্ত চুক্তির ক্ষেত্রে বড় ধরনের সাফল্য অর্জন করেন। ১২ ডিসেম্বর গঙ্গার পানি বণ্ট নিয়ে ভারত-বাংলাদেশের মধ্যে ঐতিহাসিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ৩০ বছর মেয়াদি এ চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন দুই প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশের শেখ হাসিনা এবং ভারতের এইচ.ডি.দেব গৌড়া। এ চুক্তির ফলে প্রতি বছর ১ জানুয়ারি থেকে ৩১ মে পর্যন্ত শুকনো মৌসমে বাংলাদেশ ফারাক্কা বাঁধ থেকে কমপক্ষে ৩৫ হাজার কিউসেক পানি পাবে। তাছাড়া ফারাক্কা বাঁধে পানির প্রবাহ ৭০ হাজার কিউসেক হলে বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে তা সমানভাবে বণ্টন হবে। কিন্তু পানির প্রবাহ যদি ৭৫ হাজার কিউসেক হয় তাহলে ভারত পাবে ৪৯ হাজার কিউসেক বাকি অংশ পাবে বাংলাদেশ। চুক্তিটি সইয়ের পর থেকেই কার্যকর হয়েছে এবং মেয়াদ শেষ হবার পর পারস্পরিক সমঝোতার ভিত্তিতে চুক্তিটি নবায়ন করা যাবে।

দুই দেশের প্রণীত তিন পয়েন্ট ফর্মুলার ওপর ভিত্তি করে এ চুক্তিটি করা হয়েছে। এর আওতায় পানির প্রবাহ ৭০ হাজার কিউসেক অথবা এর কম হলে বাংলঅদেশ কমপক্ষে ৩৫ হাজার কিউসেক অথবা ৫০ শতাংশ পানি পাবে। দশ দিনের পিরিয়ডে যদি কোনো সময় ফারাক্কার পানির প্রবাহ ৫০ হাজার কিউসেক কম হয় তাহলে দুই সরকার ন্যায্যতা, সততা আর কোনো পক্ষে প্রতি ক্ষতিকারক নয়-এ মূলনীতির ভিত্তিতে পরিস্থিতি জরুরিভাবে মোকাবেলা করার জন্য তাৎক্ষণিকভাবে বৈঠক বসবে। চুক্তিতে দুই সরকার কর্তৃক মনোনীত সমান সংখ্যক প্রতিনিধি নিয়ে কমিটি গঠন করার কথা বলা হয়েছে। চুক্তির আওতায় দুই সরকার পাঁচ বছর অন্তর পানির হিস্যার ব্যাপারে পর্যালোচনা করতে পারবেন। চুক্তি অনুযায়ী প্রতিক্রিয়া মূল্যায়ন হিস্যা ব্যবস্থার কার্যকারিতার ব্যাপারে কোনো পক্ষ চাইলে দু'বছর পর প্রথম পর্যালোচনা বৈঠক আহ্বান করতে পারবে।

Dhaka University Institutional Repository

দুই দেশের প্রধানমন্ত্রীর এ ঐতিহাসিক চুক্তি স্বাক্ষরকালে বাংলাদেশের পক্ষে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আব্দুল সামাজ আজাদ, পানিসম্পদ মন্ত্রী আব্দুর রাজ্জাক, প্রধানমন্ত্রীর সচিব ড. মহিউদ্দীন খান আলমগীর, পররাষ্ট্র সচিব ফারুক সোবহান, পানি সম্পদ সচিব ড. শামসুল হুদা প্রমুখ। ভারতের পক্ষে উপস্থিত ছিলেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী আই. কে. গুজরাল, পানি মন্ত্রী জ্ঞানেশ্বর মিশ্র, পররাষ্ট্র সচিব সালমান হায়দার, পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতিবসু প্রমুখ। চুক্তিটি স্বাক্ষরের পর ভারতের প্রধানমন্ত্রী দেব গৌড়া এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন, এ চুক্তি দুই দেশের বন্ধুত্বকে আরো সুদৃঢ় করবে। আঞ্চলিক ও দ্বিপক্ষীয় সম্পর্কের ক্ষেত্রেও নতুন ধারা সৃষ্টি হবে। ইতঃপূর্বে ১৯৭৭ সালে জিয়াউর রহমানের শাসনামলে ফারাক্কা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল যার বদৌলতে বাংলাদেশ ৩০ হাজার কিউসেক পানি পাবার সুযোগ লাভ করে। ১৯৭৭ সালের পর দীর্ঘ ২৩ বছর পরে ১৯৯৬ সালে প্রথম আনুষ্ঠানিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

শেখ হাসিনা সরকার ও জননিরাপত্তা আইন (Sheikh Hasina's Government and Public Security Law) : স্বাধীন বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠাতা দল আওয়ামী লীগ স্বাধীনতারত্তোরকালে দেশে প্রথম সরকার গঠন করে। ১৯৭২ সালের মূল সংবিধানের সংসদীয় গণতন্ত্রের মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় জীবনের সূচনার কথা ঘোষণা করা হয় এবং তা কার্যকর করা হয়। সংবিধানের জনগণের মৌলিক মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার ও তার নিশ্চয়তা প্রদানের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। তথাপি সরকারের কার্যক্রম আরম্ভ হবার সঙ্গে সঙ্গেই জনগণের মৌলিক মানবাধিকার সংকোচনকারী কতিপয় সংশোধনী উত্থাপন ও পাস করা হয়।

বাংলাদেশ সংবিধানের দ্বিতীয় সংশোধনী আইন তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশের স্থপতি শেখ মুজিবুর রহমানের আমলে গৃহীত হয়। এ সংশোধনী আইনের গুরুত্বপূর্ণ দিক ছিল জরুরি বিধানাবলী সংক্রান্ত সংবিধানের নবম ভাগের সংযোজন। এ জরুরি বিধানাবলীর সারমর্ম ছিল যুদ্ধ বা বহিরাক্রমণ অথবা অভ্যন্তরীণ গোলযোগের দ্বারা বাংলাদেশ এ এর যেকোনো অংশের নিরাপত্তা বা অর্থনৈতিক জীবন বিপন্ন হবার আশঙ্কা দেখা দিলে রাষ্ট্রপতি জরুরি অবস্থা ঘোষণা করতে পারবেন। জরুরি অবস্থা চলাকালীন সময়ে নাগরিকদের মৌলিক অধিকার স্থগিত থাকবে।

সংবিধানের ৩৩ নং অনুচ্ছেদের সংশোধন করে বলা হয় যে, কারণ না দর্শিয়ে যেকোনো ব্যক্তিকে যেকোনো সময়ে গ্রেফতার বা বিনা বিচারে আটক রাখা যাবে। সংবিধানের ওইরূপ

Dhaka University Institutional Repository

সংশোধনী জনগণের মৌলিক অধিকার হরণ এবং এবং গণতান্ত্রিক মূল্যবোধকে দারুণভাবে সঙ্কুচিত করে। তৎকালীন সময়ে স্বাধীনতাত্তোরকালে নব্য রাষ্ট্র ও সমাজে যে সংকট দেখা দিয়েছিল তা মোকাবেলা করার জন্য দ্বিতীয় সংশোধনী আইনের প্রয়োজনীয়তা থাকা হয়তো স্বাভাবিক ছিল। স্বাধীনতা লাভের দীর্ঘ উনত্রিশ বছর পরে প্রায় একই ধরনের আইন প্রণয়ন রাষ্ট্র ও সরকারের ত্রিমুখী যাত্রার কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। ১৯৭৪ সালে আওয়ামী লীগ নিয়ন্ত্রণাধীন জাতীয় সংসদ চরম গণবিরোধী নিপীড়নমূলক বিশেষ ক্ষমতা আইন করে। এ আইনে যে কাউকে বিনাবিচারে আটক রাখার ব্যবস্থা করা হয়। এছাড়াও সংবাদপত্রও বন্ধ করে দেয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। এ ব্যবস্থাগুলো রাখা হয়। আইন-শৃঙ্খলা সংক্রান্ত কিছু ব্যবস্থার সাথে। পরবর্তীতে চতুর্থ সংশোধনী আইন পাস করে একদলীয় একনায়কত্ব কায়েম করে দেশ থেকে গণতন্ত্র উচ্ছেদের ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

দীর্ঘ ২১ বছর পরে ১৯৯৬ সালের নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতারোহণ করে আওয়ামী লীগ পূর্ণ উদ্যমে বিশেষ ক্ষমতা আইনের প্রয়োগ করতে থাকে। বিশেষ ক্ষমতা আইনের সরকার হাজার হাজার মানুষকে কারাগারে নিক্ষেপ করে। খালেদা জিয়ার বিএনপি ও এ কালোআইন বিশেষ ক্ষমতা আইন প্রয়োগ করে বহু লোককে গ্রেফতার করেছে। তবে বর্তমান সরকার কর্তৃক এ আইনটি প্রয়োগের মাত্রা পূর্বেকার রেকর্ড বহুগুণে ছাড়িয়ে গেছে। প্রধানমন্ত্রী স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিয়েছেন, এ আইনটি বাতিল করা হবে না। ক্ষমতা কুক্ষিগত রাখার জন্য দমনমূলক এ বিষে আইনটি ব্যবহার করার ধারাবাহিকতার আলেঅকেই নতুন জননিরাপত্তা আইন করা হয়েছে বলে বিরোধী দল অভিমত পোষণ করে। জননিরাপত্তা আইনটিতে-

প্রথমত- হাইজ্যাক, জোর করে বা ভয় দেখিয়ে কারো কাছ থেকে টাকা অথবা অন্যকোনো মুলবান সম্পদ ছিনিয়ে নেয়া এবং গায়ের জোরে টেন্ডার ছিনিয়ে নেয়া বা টেন্ডার পদ্ধতিতে কাজের চুক্তি বিঘ্নিত করার জন্য শাস্তির বিধান করা হয়েছে।

দ্বিতীয়ত-একই সাথে ব্যবস্থা রাখা হয়েছে মটরগাড়ি ও সম্পত্তির ক্ষতিসাধন করা, যানবাহন চলাচলে বাধা দেয়অ অপরাধ করতে উস্কানি দেয়া এবং বোমাবাজির বিরুদ্ধে।

তৃতীয়ত-এ আইনে কেউ গ্রেফতার হলে তাকে বিচার শেষ না হওয়া পর্যন্ত জামিন দেয়া যাবে না।

চতুর্থত-এ আইনে আটক ব্যক্তির বিচার ৯০ দিনের মধ্যে শেষ করতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

এ আইনের আওতায় অপরাধীদের বিচারের জন্য বিশেষ ট্রাইব্যুনালগুলো থাকবে। অভিনবদের গ্রেফতারের এক মাসের মধ্যে পুলিশী তদন্ত শেষ করতে হবে। ট্রাইব্যুনালের রায়ের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে আপিল করা যাবে। এ কথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, জননিরাপত্তা আইনের যেভাবে অপরাধের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, সেগুলো বর্তমানে বাংলাদেশে সীমাহীন অবস্থায় পৌছে গেছে। প্রধান বিরোধী দল বিএনপি ও তার সাথে জোটবদ্ধ তিনদল ছাড়াও অন্যান্য দলসমূহ এ আইনকে কালাকানুন বলে অভিহিত করে এ আইনের বিরুদ্ধে অনশন করেছে।

বর্তমান বাংলাদেশে বিরোধী দলের কোনো মিছিল, বিক্ষোভ বা হরতাল কর্মসূচি থাকলে যে বিষয়গুলো সংঘটিত হয় তাহলো প্রতিবাদকারীদের ওপর পুলিশ ও সরকার সমর্থকদের মাধ্যমে গাড়ি ভাঙ্চুর ও বোমাবাজি। এরফলে একাধিক পুলিশও নিহত হয়েছে। এরফলে বিরোধী দলগুলো মনে করে যে, ভাঙ্চুর, সম্পত্তি নষ্ট ও বোমাবাজি বন্ধ করার ব্যবস্থা নেয়ার নামে সরকার মূলত তাদের সরকার বিরোধী কর্মকাণ্ড প্রতিহত করার জন্য এ আইন প্রণয়ন করেছে। রাজনৈতিক কর্মীদের নিষ্ক্রিয় রাখার জন্যই এ আইনের আওতায় গ্রেফতার হলে তাদেরকে নিদেনপক্ষে তিন মাস কারাবন্দি রাখার ব্যবস্থা রয়েছে।

সরকার পক্ষীয় আইনজ্ঞরা যদিও এ আইনের সমর্থন ও গুণাগুণ বর্ণনা করে সন্ত্রাসবিরোধী লেবাস পরাবার চেষ্টা করেছেন, কিন্তু বিরোধী সমর্থক আইনজ্ঞবৃন্দ এ আইনটির ত্রুটি সম্পর্কে নানা ধরনের বিশ্লেষণ দিয়েছেন। তাঁদের মতে, জননিরাপত্তা আইনটি অত্যন্ত ত্রুটিপূর্ণ। কারণ পুলিশ একমাস তো দূরের কথা পাঁচ বছরেও অনেক অপরাধের তদন্ত শেষ করতে পারে না। কাজেই এ আইনের শর্ত পূরণ করতে গিয়ে পুলিশ জোরজুলুম করে অভিযুক্তদের কাছ থেকে অপরাধ করার স্বীকারোক্তি আদায় করবে, ভয় দেখিয়ে ভুয়া সাক্ষি দাঁড় করাবে এবং সেখানে প্রকৃত অপরাধীকে চিহ্নিত করতে না পেরে নিরপরাধীকে শাস্তি প্রদান করবে। তারপরেও প্রতিটি মামলা তিনমাসের মধ্যে শেষ করতে গিয়ে ট্রাইব্যুনালের বিচারগণ তড়িঘড়ি করবেন এবং এরফলে ন্যায় ও সুষ্ঠু বিচার ব্যাহত হবে। জননিরাপত্তা আইনের সাক্ষ্য প্রমাণের জন্য আর একটি নতুন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। তাহলো আদালত অডিও বা ভিডিও টেপ এবং আলোকচিত্র প্রমাণ হিসেবে গ্রহণ করবে। আধুনিক যুগে অপরাধ প্রমাণের এ ব্যব্সথাটা সঠিক হলেও বাংলাদেশের মত অনুন্নত দেশে এর ভয়াবহতাও বিচারের বিষয়। উন্নত দেশসমূহে এরূপ টেপ ও ছবি সাক্ষ্য হিসেবে গ্রহণ করা হলেও সেখানে একই সাথে বলা থাকে, কিভাবে টেপরেকর্ড বা ছবি আইনত গ্রহণযোগ্য হবে। সেসব রাষ্ট্রে আরো ব্যবস্থাও থাকে যাতে রেকর্ড

Dhaka University Institutional Repository

বা টেপ ও চবি বানোয়াট বা সাজানো কি না সে সম্পর্কে প্রশ্ন তোলা এবং সঠিকবাবে যাচাই করা যায়। বাংলাদেশের জননিরাপত্তা আইনে এরূপ কোনো ব্যবস্থা রাখা হয়নি।

পর্যবেক্ষকদের মতে, জননিরাপত্তা আইনকে কালোআইন হিসেবে অভিহিত করার কারণ হলো, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য এ নতুন আইন তৈরি করার দরকার ছিল না। যেসব অপরাধের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এ আইন প্রণয়ন করা হয়েছে, তার প্রায় সব কয়টির বিষয়ে বাংলাদেশ পেনাল কোডে ব্যবস্থা নেয়া আছে। পেনাল কোডের অষ্টম অধ্যায়ের শিরোনাম হচ্ছে 'Of offences against the public tranquility'। এ অধ্যায়ের ধারাগুলোতে উল্লেখ আছে যে, মানুষের চলাচলের অধিকার ও আইনে প্রদত্ত অন্যান্য অধিকার ভোগে বাধা দিলে শাস্তি পেতে হবে। জেল, জরিমানাসহ শাস্তির স্বরূপও নির্দিষ্টভাবে এ আইনে উল্লেখ করা আছে।

পেনাল কোডের অষ্টম অধ্যায়ের ১৪১ ধারা থেকে শুরু করে ১৬০ ধারা পর্যন্ত বেআইনী সমাবেশ, চলাচলে বাধা দেয়া, মারধর করা, দাঙ্গা করা, ছাত্রদেরকে এমন কোনো রাজনৈতিক কাজে ব্যবহার করা যা জনশৃঙ্খলা ব্যাহত করে- এমন সব কাজকে ফৌজদারি অপরাধ (criminal offence) বলে বর্ণনা করে সেগুলোর জন্য শাস্তির বিধান করা আছে। একই পেনাল কোডের of offences affecting the Human Body, of offences against Property, of Extortion, of Kidnapping, Abduction, Slavery and child labour and of Mischief অধ্যায়ে ও অনুচ্ছেদগুলোতে মানুষের প্রাণনাশ করা আন্ত করা, কারা সম্পত্তির ক্ষতিসাধন করা, ভয় দেখিয়ে কারো কাছ থেকে টাকাপয়সা বা মূল্যবান সম্পদকে ছিনিয়ে নেয়া বা আদায় করে নেয়া এবং কাউকে অপহরণ করাকে ফৌজদারি অপরাধ হিসেবে বর্ণনা করে সেগুলোর শাস্তি বিধান করা আছে। নির্দিষ্ট শাস্তিগুলো অত্যন্ত কঠিন।

সুতরাং বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকারের প্রধানমন্ত্রীসহ সকল নেতাদের বক্তব্য অনুযায়ী সন্ত্রাসী কাজকর্ম বন্ধ করার মতো আইনের স্বল্পতার কথা সঠিক নয়। নতুন আইন সৃষ্টি না করে সরকার এসব অপরাধ বন্ধের জন্য পেনাল কোডের প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনতে পারত। এছাড়া ১৯৭৪-এ প্রণীত বিশেষ ক্ষমতা আইনেও এসব অনেক অপরাধের জন্য শাস্তির মাত্রা বাড়িয়ে

Dhaka University Institutional Repository

দেয়ার ব্যবস্থা নেয়া আছে। জামিন ও বিচার প্রক্রিয়া সম্পর্কেও প্রচলিত আইনের সংশোধনী প্রস্তাবই যথেষ্ট ছিল বলে অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ মনে করেন।

খালেদা জিয়ার বিএনপি সরকারের সন্ত্রাস দমন আইন নিয়েও এরূপ বিরূপ সমালোচনা হয়েছিল। তৎকালীন বিরোধী দল আওয়ামী লীগও তখন সেই স্বল্পমেয়াদী আইনের কঠোর সমালোচনা করেছিল। জননিরাপত্তা আইন করার পেছনে সরকারের সন্ত্রাস দমন ছাড়াও নিজস্ব কেনো স্বার্থসিদ্ধির অভিযোগ বিভিন্ন মহল থেকে উত্থাপিত হয়েছে। সংসদের বেসরকারি দিবসে সরকারি বিল আনা অস্বাভাবিক এবং এ জননিরাপত্তা আইন ওইদিন তাড়াহুড়া করে পাস করা হয়েছে। ১৯৭৫-এর বাকশাল গঠনের ক্ষেত্রেও এরূপ তড়িঘড়ি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছিল। জননিরাপত্তা বিল ২০০০ নামে অভিহিত এ নতুন সন্ত্রাসবিরোধী আইনের মধ্যে কিছুটা অস্পষ্টতা রয়ে গেছে বলে মনে করা হয়। কারণ সন্ত্রাসের গোড়ায় আঘাত করার জন্য এ আইনে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি।

শেখ হাসিনা সরকার ও পার্বত্য শান্তিচুক্তি (Sheikh Hasina's Government and Hill Tracts Peace Treaty): পার্বত্য অঞ্চলের সমস্যা বাংলাদেশ সৃষ্টির পূর্ব থেকেই এ অঞ্চলে বিদ্যমান ছিল। স্বাধীনতাত্তোর বাংলাদেশে এ সমস্যা আরো ঘনীভূত হয়। ১৯৭২-এর ফেব্রুয়ারিতে চাকমা রাজার প্রতিনিধি তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমানের কাছে পার্বত্য চট্টগ্রামের স্বায়ত্তশাসনের দাবি সম্বলিত চারদফা প্রস্তাব উত্থাপন করেন। শেখ মুজিব তাঁদের এ দাবি প্রত্যাখ্যান করে তাদেরকে বাঙালিকরণের কথা বলেন, প্রকৃতপক্ষে তখন থেকেই শুরু হয় বাংলাদেশ পার্বত্য চট্টগ্রাম সংক্রান্ত সমস্যা। চাকমা নেতা সন্তু লারমার নেতৃত্বে ১৯৭২ সালে জনসংহতি সমিতি এবং ১৯৭৩ সালে তাদের সামরিক শাখা শান্তিবাহিনী গঠিত হয়। শেখ মুজিবের জীবদ্দশা পর্যন্ত পার্বত্য চট্রগ্রামের উপজাতীয় সমস্যাটি এভাবেই চলছিল কিন্তু জেনারেল জিয়া ক্ষমতাসীন হবার পর পাবর্ত্য চট্টগ্রাম সংক্রান্ত যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন তা পরিস্থিতিকে আরও ভয়াবহ ও সংঘাতময় করে তোলে।

জেনারেল এরশাদ ক্ষমতা গ্রহণের পর পার্বত্য চট্টগ্রাম নীতির কিছুটা পরিবর্তন করেন। ১৯৮৯ সালে এরশাদ সরকার তিনটি পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ গঠন করে তাদের হাতে কিছুটা রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রদান করে। এরপরেও তারা সশস্ত্র আন্দোলন বন্ধ করেনি। উপজাতীয়রা কখনও স্বায়ত্তশাসন, কখনও বাঙালি খেদাও প্রবৃতি দাবিতে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের

Dhaka University Institutional Repository

অবতারণা করে। খালেদা জিয়ার সরকারের আমলে ১৯৯২-এর জুলাই মাসে তৎকালীন যোগাযোগ মন্ত্রী অলি আহম্মদের নেতৃত্বে 'পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক কমিটি' গঠন করা হয়। এ কমিটির সাথে ৫ নভেম্বর ১৯৯২ থেকে জনসংহতি সমিতির ৭ দফা এবং উপকমিটির ৬ দফা মোট ১৩ দফা আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে মূল সমস্যার কোনো সমাধানই হয়নি।

আওয়ামী লীগ সরকার গঠনের পর পার্বত্য সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে দৃঢ় পদক্ষেপ গ্রহণ করে। চীপ হুইপ আবুল হাসানাত আব্দুল্লাহকে প্রধান করে জাতীয় কমিটি গঠন করে উপজাতীয় প্রধানের সাথে আলোচনার পদক্ষেপ নেয়া হয়। এ লক্ষ্যে ২১ ডিসেম্বর থেকে ২৪ নভেম্বর পর্যন্ত খাগড়াছড়িতে প্রথম দফা আলোচনা অনুষ্ঠিত হয় এবং ২৬ নভেম্বর শান্তিচুক্তির খসড়া প্রণয়ন করা হয়। ১৯৯৭-এর ২ ডিসেম্বর শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে আবুল হাসানাত আব্দুল্লাহ এবং জনসংহতি সমিতির পক্ষ থেকে জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা ওরফে সন্তু লারমা দীর্ঘ কাঙ্ক্ষিত শান্তিচুক্তিতে স্বাক্ষর করেন।

শান্তিচুক্তি শেখ হাসিনার সরকারের একটি গুরুত্বপূর্ণ সাফল্য। দীর্ঘদিনের লালিত সঙ্কটের সমাধানের লক্ষ্যে হাসিনা সরকার শান্তিচুক্তি সম্পাদন ও বাস্তবায়নের দৃঢ় পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। পার্বত্য চট্টগ্রামের জনসংহতি সমিতি এবং তার সামরিক শাখা 'শান্তিবাহিনী' সাংবিধানিক স্বীকৃতির দাবিতে দীর্ঘকাল ধরে রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম করে আসছিল। ইতঃপূর্বে কোনো সরকারই এ সমস্যা সমাধানে সাফল্য লাভ করতে পারেনি। হাসিনা সরকার এ দীর্ঘ সংঘাতময় পরিস্থিতির শান্তিপূর্ণ সমাধানের লক্ষ্যে যে পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন তা প্রায় সর্বমহলেই প্রশংসিত হয়েছে।

পার্বত্য শান্তিচুক্তিতে মোট চারটি অংশে নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্য লক্ষ্যণীয় :

১। শান্তিচুক্তি স্বীকার করে যে, পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতীয়রা সেখানকার বাসিন্দা এবং তাদের Distinct characteristics বজায় রাখা প্রয়োজন।

২। ওই শান্তিচুক্তির নীতিমালা বাস্তবায়ন কার্যক্রম দেখার জন্য প্রধানমন্ত্রী তিন সদস্যবিশিষ্ট কমিটি গঠন করেন।

Dhaka University Institutional Repository

৩। ওই চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার দিন থেকেই কার্যকরী হবে।

দ্বিতীয়ত. জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদের লক্ষ্যণীয় বৈশিষ্ট্যগুলো নিম্নরূপ :

১। উভয়পক্ষই ১৯৮৯ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলা পরিষদের বিল সংশোধন করতে সম্মত হয়।

২। "পার্বত্য জেলা পরিষদ স্থানীয় সরকার পরিষদ (Hill District Local Government Council) নাম পরিবর্তন করে 'পার্বত্য জেলা পরিষদ' করা হবে (Hill District Council)।

৩। ৩ বছরের পরিবর্তে পরিষদের মেয়াদ ৫ বছর হবে।

৪। হস্তান্তরিত বিষয়গুলোতে পরিষদ পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করতে পারবে এবং সরকার খরচ বহন করবে।

৫। যদি জাতীয় সংসদ কোনো আইন পাস করে যা পার্বত্য জেলা পরিষদের নিকট অগ্রহণযোগ্যতা সংশোধনের জন্য বাংলাদেশ সরকারের নিকট পরিষদ আবেদন করতে পারবে। তখন সরকার যথাযথ ব্যবস্থা করবে।

তৃতীয়তা. পার্বত্য চট্টগ্রামের বিভাগীয় পরিষদের বৈশিষ্ট্যগুলো নিম্নরূপ :

১। পার্বত্য চট্টগ্রামের বিভাগীয় চেয়ারম্যান পরোক্ষভাবে জেলা পরিষদের নির্বাচিত সদস্যদের দ্বারা নির্বাচিত হবেন। তিনি একজন উপজাতীয় হবেন এবং তার পদমর্যাদা সরকারের প্রতিমন্ত্রীর সমান।

২। এর সদস্য সংখ্যা হবে ২৫ জন। ১ জন চেয়ারম্যান, ১২ জন পুরুষ (উপজাতীয়), ২ জন মহিলা (উপজাতীয়), ৬ জন পুরুষ (অ-উপজাতীয়) এবং ১ জন মহিলা (অউপজাতীয়)। এছাড়া তিনটি পার্বত্য জেলা পরিষদের চেয়ারম্যানবৃন্দ পদাধিকারবলে বিভাগীয় পরিষদের সদস্য হবেন এবং তাদের ভোটাধিকার থাকবে।

৩। বিভাগীয় পরিষদের সদস্যবৃন্দ ৩টি জেলা পরিষদের সদস্য কর্তৃক নির্বাচিত হবেন।

Dhaka University Institutional Repository

৪। পরিষদের মেয়াদ হবে ৫ বছর।

৫। এ পরিষদের একজন প্রধান নির্বাহী অফিসার থাকবেন যার পদমর্যাদা বাংলাদেশ সরকারের যুগ্ম সচিবের সমান। নিয়োগের সময় উপজাতীয় প্রার্থী প্রাধান্য পাবে।

৬। ওই পরিষদের দায়িত্ব হবে তিনটি জেলার আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা করা এবং উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডকে সমন্বয় করা।

৭। পার্বত্য চট্টগ্রামের জেলাসমূহ সংক্রান্ত যখন কোনো আইন করা হবে তখন সরকার বিভাগীয় পরিষদের সাথে আগে আলোচনা করবে। ওই পরিষদ সরকারকে যথাযথ পরামর্শ দিবে।

চতুর্থত. পুনর্বাসন, সাধারণ ক্ষমা ও অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে নিম্নলিখিতগুলো উল্লেখযোগ্য :

১। উপজাতীয় উদ্বাস্তু নেতা ও সরকারের মধ্যে ১৯৯৭-এর ৯ মার্চ আগরতলায় স্বাক্ষরিত চুক্তি অনুযায়ী উপজাতীয় উদ্বাস্তুদের প্রত্যাবর্তন ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হবে।

২। পার্বত্য চট্টগ্রামের অবস্থা স্বাভাবিককরণের জন্য সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা দেয়া হবে এবং প্রত্যেক উপজাতীয় পরিবারকে ৫০ হাজার টাকা পুনর্বাসনের জন্য দেয়া হবে।

৩। একটি ৫ সদস্যবিশিষ্ট কমিশন গঠন করা হবে যার প্রধান হবেন একজন অবসরপ্রাপ্ত বিচারক। এর মূল কাজ হবে ভূমি সংক্রান্ত সকল মামলার নিষ্পত্তি।

৪। পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি এ চুক্তি স্বাক্ষরের ৪৫ দিনের মধ্যে যাদের কাছে অস্ত্রশস্ত্র রয়েছে তাদের নাম ও অস্ত্রের বিবরণ পেশ করবে।

৫। স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে আসার সাথে সাথে সামরিক, আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষাবাহিনী পার্বত্য চট্টগ্রাম তুলে নেয়া হবে তবে বিডিআর থাকবে।

৬। পার্বত্য চট্টগ্রামের জন্য একটি পৃথক মন্ত্রণালয় স্থাপন করা হবে এবং মন্ত্রী হবেন একজন উপজাতীয়।

উপরোক্ত বিষয়গুলো মূলত. পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তিচুক্তির অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এ চুক্তি স্বাক্ষর দেশের ভেতরে ও বাইরে মিশ্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। অনেকে মনে করেন যে, এটা হাসিনা

Dhaka University Institutional Repository

সরকারের চরম সাফল্য। কারণ ওই অঞ্চলে চির শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য এটার প্রয়োজন ছিল। দেশের অর্থনৈতিক সম্পদ এটার পিছনে অপচয় হচ্ছিল। দীর্ঘদিন ধরে সেখানে সামরিক বাহিনীকে রাখা হয়েছিল। উভয়পক্ষের প্রচুর লোক মৃত্যুবরণ করেছে। ওই অঞ্চলে সব সময় উত্তেজনা বিরাজ করছিল। এ চুক্তির ফলে এখন আশা করা যাচ্ছে শান্তি বিরাজ করবে। এটাই হাসিনা সরকার বিশ্বাস করে।

কিন্তু বাংলাদেশের অন্যান্য রাজনৈতিক দল বিশেষ করে বিএনপি ও জামায়াতে ইসলাম এ চুক্তির বিরোধী। তদের পেছনে বাংলাদেশের সাধারণ জনগণও সমর্থন দিয়েছে। শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত হবার পর থেকেই বিরোধী দলসমূহ সমালোচনামুখর হয়ে উঠে। তারা বিশ্বাস করে যে, এটা বাংলাদেশের স্বাধীনতার ও সার্বভৌম ক্ষমতার পরিপন্থী। বিএনপি দাবি তোলে যে ওই চুক্তি সংবিধান পরিপন্থী যা সংসদকে উপক্ষো করা হয়েছে। জাতীয় অখণ্ডতা রক্ষায় এ চুক্তি কোনো সহায়ক হবে না।

যাহোক, পার্বত্য চট্টগ্রামের শান্তিচুক্তি সম্পাদিত হবার পর চুক্তি মোতাবেক বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। যেমন :

প্রথমত- ভারতের ত্রিপুরা রাজ্য থেকে ১২,২২২টি পরিবারের ৪৫,৫৩৩ জন শরণার্থী ১৯৯৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের মধ্যে প্রত্যাবর্তন করেছে। তাদের পুনর্বাসন প্রক্রিয়াও সমাপ্ত প্রায়। চুক্তি মোতাবেক নির্দিষ্ট সময়ে শান্তিবাহিনীর সশস্ত্র সদস্যদের তালিকা প্রদান এবং ১০ ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৮ থেকে ৫ মার্চ ১৯৯৮ পর্যন্ত ৪ দফায় ১৯৪৭ জন সশস্ত্র সদস্য আত্মসমর্পণ করেছে। ৮৭৫টি অস্ত্রসহ ২ লাখের অধিক গোলাবারুদ জমা পড়েছে। ১৯৯৮-এর ৫ মার্চ সর্বশেষ দলের আত্মসমর্পণের মধ্যদিয়ে শান্তিবাহিনী বিলুপ্ত হয়েছে।

দ্বিতীয়ত-শান্তিচুক্তি মোতাবেক পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন জাতীয় সংসদে পাস হয়েছে।

সবশেষে বলা যায় যে, বাংলাদেশের ইতিহাসে হাসিনা সরকারই পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যা সমাধানের সাফল্যের দাবিদার। তবে সকল সমস্যার সমাধান ঘটেছে ধারণা করা সমীচীন নয়। কারণ সমস্যা সমাধানের শেষ বলতে কিছুই নেই। এটি একটি চলমান প্রক্রিয়া এবং এ

Dhaka University Institutional Repository

প্রক্রিয়াকে অব্যাহত রাখার জন্য সার্বিক সহযোগিতা প্রয়োজন। পার্বত্য চট্টগ্রামের সংঘাতময় পরিস্থিতির স্থায়ী অবসান সকলের কাম্য। একথা স্বীকার করতেই হবে যে, পার্বত্য চট্টগ্রামের স্বকীয় সত্তা সম্বলিত বিভিন্ন উপজাতীয়দেরকে বাঙালিকরণের প্রচেষ্টা সঠিক হবে না- তারা বাঙালিও হবে না আবার নিজ ভূমি থেকে উচ্ছেদও হবে না। সুতরাং সমঝোতার মাধ্যমে ঐক্য স্থাপন করে সকল শ্রেণীর স্ব স্ব অস্তিত্ব বজায় রেখে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের লক্ষ্যেই ভবিষ্যতের পদক্ষেপ হওয়া উচিত।

শেখ হাসিনা সরকারের মূল্যায়নঃ

১৯৯৬ সালের ১২ জুনের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ সংখ্যাগরিষ্ঠ আসন পেয়ে ২৩ জনু সরকার গঠন করে। আওয়ামী লীগ সরকারের প্রধান হিসেবে শেখ হাসিনা পুরো পাঁচ বছর বাংলাদেশ শাসন করেন। ১৯৯৬-২০০১ পর্যন্ত সরকার গঙ্গার পানি সমস্যঅর সমাধান, সার সঙ্কটের সমাধান, মুদ্রাস্ফীতি রোধ, কৃষ্টি উৎপাদন বৃদ্ধি, মানব সম্পদ উন্নয়নের ক্ষেত্রে বয়স্ক ও বিধবা ভাতা, ভিজিএফ, শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য সহায়তা, অবকাঠামোগত উন্নয়ন এর প্রধান দৃষ্টান্ত যমুনা সেতুর সমাপ্তি, আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নয়নও বিচার বিভাগের নিরপেক্ষতা নিশ্চিতকরণ, সরকারের জবাবদিহিতা যেমন মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত স্থায়ী কমিটিগুলোতে মন্ত্রীর পরিবর্তে সংসদ সদস্যদের সভাপতি নির্বাচিত করে কার্যপ্রণালী বিধি সংশোধন। সংসদের অধিবেশন চলাকালে প্রতি সপ্তাহে একদিন প্রধানমন্ত্রীর সরাসরি প্রশ্নের উত্তর দান এবং সচিবদের পরিবর্তে মন্ত্রীদের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের নির্বাহী প্রধান করে "রুলস অব বিজনেস" পরিবর্তন করা ইত্যাদি সাফল্য যেমন আছে তেমিন প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে মন্থরতা, অবিরাম বিদ্যুৎ বিভ্রাট, নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি, আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি, প্রশাসনের দলীয়করণ, শেয়ার বাজারের মহাসংকটসহ অর্থনৈতিক বিপর্যয়, অবমাননাকর পররাষ্ট্রনীতি, অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে সমঝোতার অভাব দেশকে স্থবিরতার মধ্যে ঠেলে দেয়। জনগণের আস্থা হারাতে থাকে সরকার। যার প্রতিফলন লক্ষ্য করা গেছে ২০০১ সালে জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের ভরাডুবির মধ্যে।

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়

বাংলাদেশে নেতৃত্বের সংকটের কারণ

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়

বাংলাদেশে নেতৃত্বের সংকটের কারণ

ভূমিকা:

সংকট দীর্ঘ ১৯০ বছরের ঔপনিবেশিক শাসন ও শোষণের কবলে পড়ে বাংলাদেশ তার আপন ঐতিহ্য হারিয়েছে। খণ্ডিত হয়েছে বঙ্গের ভৌগোলিক মানচিত্র। এমনকি খণ্ডিত হয়েছে বাংলা পূর্ববাংলা ও পশ্চিম বাংলা নামে। স্মরণাতীতকালের সম্প্রীতির শেকড়ে আগুন জ্বালিয়ে হীন স্বার্থসিদ্ধির হাতিয়ার হিসেবে শাশ্বতকালের বাংলাকে খণ্ডিত করা হয়েছে। ১৯৪৭ সালের বৃটিশ শাসনের পতনের পূর্বে সমগ্র ভারতবর্ষকে ধর্মের ভিত্তিতে বিভক্ত করে ভারত ও পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্ম দিয়েছে। পূর্ববঙ্গ মুসলিম অধ্যুষিত বলে সঙ্গত কারণেই পাকিস্তান রাষ্ট্রের অঙ্গীভূত হয়। কিন্তু অচিরেই দেখা গেল বৃটিশ শাসনের ভূত পাকিস্তানি শাসকদের ঘাড়ে চেপে বসেছে। পুনরায় শুরু হলো নব্য উপনিবেশিক শাসন, শোষণ, নির্যাতন ও নিপীড়ন। পাকিস্তানি শাসকরা যখন পূর্ববাংলার মানুষের ধন-ঐশ্বর্যের সঙ্গে মাতৃভাষা কেড়ে নিতে চাইলো তখন মহাসংকট দেখা দিল। স্বপ্নভঙ্গের পর পূর্ববাংলার মানুষ শুরু করল স্বাধীকার আন্দোলন। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন, ১৯৬২ সালের ছাত্র আন্দোলন, ১৯৬৬ সালের ৬ দফা আন্দোলন, ১৯৬৯ সালের গণ অভ্যুত্থান, ১৯৭১ সালের মহান স্বাধীনতাযুদ্ধের মাধ্যমে এদেশ স্বাধীন হলো। স্বাধীনতার দীর্ঘ ৩৯ বছর পরও মানুষের মুক্তি ঘটেনি। সর্বত্র সংকট কিন্তু সর্বোচ্চ সংকট নেতৃত্বের সংকট বলে মনে হয়। নিম্নে বিভিন্ন সরকারের আমলে নেতৃত্বের সংকটকে কতগুলো কারণ তুলে ধরা হলো।

ক. প্রশাসনিক দুর্বলতা

১. প্রশাসনিক রাজনৈতিক নেতৃত্বে ব্যর্থতা (Crisis of administrative leadership): ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশ স্বাধীন হলো। ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি স্বাধীন বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমান ঢাকায় প্রত্যাবর্তন করেন। যুদ্ধাবিধ্বস্ত, নব্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত বাংলাদেশে মুজিব সরকার অতিসত্বর একটি সংবিধান দিয়েছিল এবং আরো কয়েকটি ক্ষেত্রে স্বার্থকথার পরিচয় দিয়েছিল কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই মুজিব "জমিদার প্রভূর

Dhaka University Institutional Repository

মতো একচ্ছত্র অধিপতি হয়ে দাঁড়ালেন"। তাঁর authoritariasm এর প্রথম প্রকাশ পেল ১৯৭২ সালের একটি রাষ্ট্রপতির আদেশে। এ আদেশে বলা হয়, সাংসদের কোনো সদস্য দলত্যাগ করলে তাঁর সদস্যপদ বাতিল বলে গণ্য হবে। এভাবে প্রায় ৪৩ জন সংসদ সদস্য পদ হারাল। সুতরাং যারা এক সময় মুজিবের অনুরাগী ছিলেন তাঁরা তাঁর বিরাগভাজন হয়ে গেল। ১৯৭৩ সালের পর দেখা গেল প্রকৃত রাজনৈতিক সংকট "সমাজতন্ত্রের" ব্যাখ্যা ও প্রতিষ্ঠা নিয়ে আওয়ামী লীগ ছাত্রফ্রন্ট ছাত্রলীগের নেতাগণের মধ্যে মতবিরোধের সৃষ্টি হয় এবং শেষ পর্যন্ত এ সংগঠনটি দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়ে, এর অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হিসেবে জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ) নামে একটি নতুন রাজনৈতিক দল জন্মলাভ করে। এভাবে আওয়ামী লীগের ভাঙ্গন সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। একক দল হিসেবে কাজ করার সমর্থন হারায়। কিন্তু ১৯৭৩ এর নির্বাচনের পর আওয়ামী লীগ সরকার আরও authoritarian হয়ে গেল। সংসদে ৯ জন বিরোধীদলীয় সদস্য পদে বাকি সকলেই ছিল আওয়ামী লীগের। মুজিব সরকারের authoritarianism এবং ওই সঙ্গে রাজনৈতিক সংকট চরম আকার ধারণ করে ১৯৭৪ সালে। অর্থমন্ত্রী তাজউদ্দিন দেশে পূর্ণসমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। অন্যদিকে শিল্পমন্ত্রী নজরুল ইসলাম চেয়েছিল একটি মিশ্রব্যবস্থা। প্রথম থেকেই তাদের মধ্যে বিতর্ক চলছিল। কিন্তু ১৯৭৪ সালে দেশে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি দেখা দিলে তাজউদ্দিন সরকারি নীতিকে এজন্য দায়ী করেন। ফলে মুজিব তাজউদ্দিনসহ আরো ৬ জন মন্ত্রীকে ক্ষমতাচ্যুত করেন। এতে দলীয় ভাঙ্গন প্রকটভাবে দেখা দেয়।

"মুজিববাদ" ও "সমাজতন্ত্রের" ব্যাখ্যা নিয়ে বিতর্ক চলার ফলে যখন আওয়ামী লীগের মধ্যে অভ্যন্তরীণ কোন্দল দেখা দেয় তখন ১৯৭৪ সালের শেষেরদিকে মুজিবের মাধ্যমে দেশে একটি Second Revolution ঘটালেন। ফলে মুজিবের ক্ষমতা একনায়কতন্ত্রে পৌছাল। দেশে সংসদীয় গণতন্ত্র বাতিল করে রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার ও একদলীয় শাসনব্যবস্থা কায়েম করা হলো। দ্বিতীয় বিপবের ফলে অনেকের মতে, রাজনৈতিক সংকট আরো বৃদ্ধি পেল। মানুষের মনে আতঙ্কের সৃষ্টি হলো যে মুজিব Sheikh dynasty প্রতিষ্ঠা করতে চান। বামপন্থী দলগুলো প্রথম থেকেই আওয়ামী লীগের শাসনের প্রতি বীতশ্রদ্ধ ছিল। তারা আওয়ামী লীগের নেতৃত্ব ও ভারতের সহায়তায় স্বাধীনতা লাভকে Unfinished Revolution হিসেবে চিহ্নিত করেন। আওয়ামী লীগ যখন দিনে দিনে দুর্বল হয়ে যাচ্ছিল তখন এ সমস্ত বামপন্থী দলগুলো তাদের গুপ্ত কাজকর্ম যেমন আওয়ামী লীগের কর্মিদের হত্যা করা ও তাদের সম্পত্তি লুট করা

Dhaka University Institutional Repository

প্রভৃতি জোরে সোরে চালাতে থাকে। এ সমস্ত চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করা আওয়ামী সরকারের পক্ষে দুষ্কর হয়ে পড়ে।[১]

২. হত্যাযজ্ঞ ও ষড়যন্ত্রেও মাধ্যমে ক্ষমতা দখল করে শাসন পরিচালনা: খন্দকার মোশতাক, জেনারেল জিয়াউর রহমান ও ঘাতক চক্র একের পর এক ক্যু ও পাল্টা ক্যু এর মাধ্যমে ১৯৭৫ এর ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধুকে স্বপরিবারে হত্যা করেই ক্ষান্ত হননি। তারা পরবর্তীতে জেলখানায় জাতীয় চার নেতাকে হত্যা করেছে। এবং সেনাবাহিনীতে অসংখ্য অফিসারকে হত্যা করেছে। জিয়ার আমলেই কর্ণেল আবু তাহের প্রাণ দিয়েছে ফাঁসিকাষ্ঠে। অথচ ব্যক্তিগত জীবনে জিয়া ও তাহের বন্ধু ছিলেন পরস্পর।[২] এভাবেই বাংলাদেশের রাজনীতিতে হত্যা ও ষড়যন্ত্রের অনুপ্রবেশ ঘটে যা দক্ষ ও যোগ্য নেতৃত্ব তৈরির পথে অন্তরতায় হয়ে দেখা দেয়।

৩. শাসন ক্ষমতায় অত্যধিক কেন্দ্রীকরণ (Excessive centralization of Executive powers): ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে রাষ্ট্রপতি জিয়া ও এরশাদ স্বল্পকালের মধ্যেই শাসন ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণে সচেষ্ট হন–তারা সীমাহীন ও নিয়ন্ত্রণবিহীন ক্ষমতা প্রয়োগ করতে শুরু করেন এবং তা ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছিল। বিচার ব্যবস্থা এবং শিক্ষানীতির ক্ষেত্রে তারা তাদের ইচ্ছা চাপিয়ে দেন। প্রশাসনিক বিকেন্দ্রিকরণের নামে সত্যিকার অর্থে প্রশাসনকে বিকেন্দ্রীকরণ করেননি। প্রশাসনের সর্বস্তরে তারা অযাচিত হস্তক্ষেপ করেছেন। ফলে ক্ষমতায় অপব্যবহার প্রশাসনের সর্বস্তরে পরিলক্ষিত হয়।[৩]

৪. হ্রাসকৃত উৎপাদন, মুদ্রাস্ফীতি ও নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির মূল্যবৃদ্ধি (Reduced Production, Inflation and Rise in the Prices of Essentials): এরশাদ সরকারের আমলে দেশের বিভিন্ন সেক্টরে মোট উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি পেলেও প্রান্তিক উৎপাদন (Marginal Productivity)হ্রাস পায়। উপকরণের লাগামহীন মূল্যের প্রেক্ষাপটে এরূপ অবস্থার সৃষ্টি হয়। অপরদিকে কালো টাকার (Black money) ছড়াছড়িতে দেশে মুদ্রাস্ফীতি এক ব্যাপক আকার ধারণ করে। নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির মূল্য সাধারণ মানুষের ক্রয়ক্ষমতার বাইরে চলে যায়। ফলশ্রুতিতে জনগণ হয়ে পড়ে দিশেহারা। এর পাশাপাশি প্রতি বছরই প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ করের বোঝা জনজীবনকে অতিষ্ঠ করে তোলে। আবার কৃষি

১। ইসলাম, ড. সৈয়দ সিরাজুল : স্নাতক রাষ্ট্রবিজ্ঞান, হাসান বুক হাউস, জুলাই-১৯৯০, পৃষ্ঠা-৩৫২-৩৫৩।
২। চৌধুরী সিরাজুল ইসলাম, নির্বাচিত রাজনৈতিক প্রবন্ধ, অন্যপ্রকাশ একুশে বইমেলা ২০০০ পৃষ্ঠা-৭৩।
৩। ভূঁইয়া ড. মোঃ আবদুল ওদুদ, বাংলাদেশের রাজনৈতিক উন্নয়ন, আজিজিয়া বুক ডিপো জানুয়ারী ২০০৮, পৃষ্ঠা-৫৫১।

Dhaka University Institutional Repository

উপকরণের ব্যক্তিকরণ ও শ্রমিকস্বার্থ বিরোধী আইন কানুন পাসের ফলে সাধারণ মানুষের অর্থনৈতিক জীবনে নেমে আসে কালো ছায়া। এর বিপরীতে স্বল্পসংখ্যক ব্যক্তির হাতে সকল সম্পদ স্তূপীকৃত হয়।[৪]

৫. সার সংকট ও খাদ্য পরিস্থিতি: বিএনপি (খালেদা জিয়ার) শাসনামলে সব চাইতে দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা সার সংকট এবং এ সংকটকে কেন্দ্র করে কৃষকদের প্রাণহানি। বিএনপি আমলে কৃষির সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান সারের মূল্য স্মরণকালের সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌছায়। ফলে কৃষককুল বিপর্যস্ত ও বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠে। তারা মন্ত্রী ও প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের ঘেরাও করে। দেশের বেশ কয়েকটি স্থানে সার লুটের খবর পাওয়া যায়। জেলা ও থানাসহ বিভিন্ন স্থানে সারের দাবিতে সভা ও মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। সার কালোবাজারে বিক্রি সম্পর্কে প্রশাসনসহ দলীয় সদস্যদের সম্পর্কে বিভিন্ন স্থানে অভিযোগ উত্থাপন করা হয়েছে। ক্ষুব্ধ প্রতিবাদী বেপরোয়া কৃষকদের নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য পুলিশ কৃষকদের ওপর নির্মমভাবে গুলি চালিয়েছে। ফলে বেশকিছু সংখ্যক কৃষক প্রাণ হারিয়েছে।

খালেদা জিয়া পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার লক্ষ্যে উচ্চপর্যায়ে কয়েকটি বৈঠক করেছেন কিন্তু সার সংকট পরিস্থিতির কোনো উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধন করতে সরকার ব্যর্থ হয়। সার সংকটের ফলে দেশে স্বাভাবিক কারণেই কৃষিকর্ম ব্যাহত হয় এবং উৎপাদন হ্রাস পায়। ফলে সার সংকটের সাথে সাথে চালের মূল্যও বাড়তে থাকে যা রোধ করতে সরকার ব্যর্থ হয়। রাজধানী ঢাকায় ন্যায্যমূল্যে চাল বিতরণের লক্ষ্যে ট্রাকে চাল আনার ব্যবস্থা করা হয় এবং ওই সব চালের ট্রাক হামলার মুখে পড়ে এবং সমুদয় চাল লুট হয়ে যায়। সার সংকটের ফলে ধানের উৎপাদন দারুণভাবে ব্যাহত হওয়ায় ১৯৯৫ সালে প্রায় ২৫ লাখ মেট্রিক টন খাদ্যশস্যের ঘাটতি পড়ে বলে বিশেষজ্ঞ মহল অভিমত পোষণ করেন।

৬. সেচ সংকট: খালেদা জিয়া সরকারের আমলে সার সঙ্কটের পাশাপাশি সেচ সংকটও প্রকট আকার ধারণ করে। ফারাক্কা বাঁধের পানির স্তর নিচে নেমে যাওয়ার ফলে দেশের সর্বত্র পানির সংকট তীব্র থেকে তীব্রতর আকার ধারণ করে। বিএনপি সরকারের পক্ষে এ সমস্যা সমাধান করা মোটেই সম্ভব হয়নি বিধায় বিষয়টি সরকারের চরম ব্যর্থতা হিসেবে চিহ্নিত হয়। দেশের এ চরম সংকটময় পরিস্থিতি সরকার বিশ্বের দরবারে সঠিকভাবে তুলে ধরতে ব্যর্থ হয়। সরকারি

৪। প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৫৫৩-৫৫৪।

Dhaka University Institutional Repository

দল কিংবা বিরোধী দল কোনো পক্ষই এ বিষয়ে বিশ্বের দৃষ্টিকে বাংলাদেশের প্রতি আকৃষ্ট করতে সক্ষম হয়নি। বিশ্ববিবেকের কাছে প্রতিবেশী রাষ্ট্রের আচরণ তুলে ধরতে বিএনপি সরকারের ব্যর্থতা সমগ্র দেশবাসীকে ক্ষুব্ধ করে তোলে।[৫]

৭. প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের মন্থরতা: আওয়ামী লীগ সরকার পরিচালনার প্রথম থেকেই প্রশাসনের সর্বস্তরে কঠোর নিয়ন্ত্রণ ও তদারকিতে ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়। যার জন্য সরকারের গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপ বাস্তবায়নও বিলম্বিত হয়। বিশেষ করে এ অবস্থাটি প্রকট হয়ে দেখা দেয় পুলিশ প্রশাসনে। ফলে দেখা দেয়, বিগত দিনের চিহ্নিত সন্ত্রাসী, চাঁদাবাজ ও দুর্নীতিবাজদের বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট মামলা থাকা সত্ত্বেও গ্রেফতার হয় না। আবার এমনি ত্রুটিপূর্ণভাবে মামলার পত্র তৈরি করা হয় যাতে মূল বিচারের বিষয়গুলোই নষ্ট হয়ে যায়। ফলে আইনের দুর্বলতার ফাঁক গলিয়ে চরম অপরাধীও পার পেয়ে যায়। এ রকম বিভিন্ন ঘটনাবলীর প্রেক্ষিতে বলা যায় যে সর্বস্তরে প্রশাসনের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে বিগত বছরে সরকার বিভিন্ন ব্যর্থতার পরিচয় দেয়।

৮. অবিরাম বিদ্যুৎ বিভ্রাট: শেখ হাসিনার সরকার ক্ষমতাসীন হওয়ার পর থেকেই বিদ্যুৎ বিভ্রাটের জন্য পরবর্তী সরকারকে দোষারোপ করতে থাকে। কিন্তু ক্ষমতাসীন হওয়ার পর থেকেই বিদ্যুতের এ ঘাটতি পূরণের কোনো চেষ্টাই সরকার গ্রহণ করেনি। প্রতিদিন বিদ্যুৎ ঘাটতির পরিমাণ ছিল প্রায় এক হাজার মেগাওয়াট। লোডশেডিংয়ের ফলে জনজীবন অতিষ্ঠ হয়ে উঠে। জনগণ ভেবেছিল শেখ হাসিনার সরকার ক্ষমতাসীন হয়ে বিদ্যুতের ঘাটতি পূরণ করবে। কিন্তু সরকারের শাসনকালের প্রায় অর্ধেক সময় অতিক্রান্ত হওয়ার পরও এক্ষেত্রে কোনো উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ গৃহীত হয়নি।

৯. নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি: নিত্যাপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির দাম পূর্বের তুলনায় অনেক গুণ বৃদ্ধি পায় এ সরকারের শাসনামলে। ক্রমেই তা মানুষের ক্রয় ক্ষমতার বাইরে চলে যেতে থাকে। ফলে সাধারণ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর জীবনধারণ প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠে। দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণের কোনো প্রচেষ্টা বা উদ্যোগ সরকার গ্রহণ করতে ব্যর্থ হয়।[৬]

৫। ১৯৭২ সাল থেকেই বাংলাদেশের স্বাধীন অস্তিত্বের প্রশ্নে ভারত ফ্যাক্টরের অযাচিত হস্তক্ষেপ ও একতরফা স্বার্থ উদ্ধারের বিষয়ে পক্ষ-বিপক্ষ নির্বিশেষে রাজনৈতিক দলগুলির ব্যর্থতা বাংলাদেশের রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার অন্যতম কারণ, এখানে নেতৃত্বের ব্যর্থতাই বস্তুত মৌলিক বিষয়।

৬। অসম্ভব ভাবে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির মূল্যের-উর্দ্ধগতিতে মানুষের দূর্ভোগ সিমাহীন মাত্রায় পৌছেছে। এখানে বাজার নিয়ন্ত্রণ ও মনিটরিং-এ নেতৃত্বের ব্যর্থতাই জনদূর্ভোগের কারণ বলে প্রতীয়মান হয়।

Dhaka University Institutional Repository

১০. অর্থনৈতিক দুরাবস্থাঃ শেখ হাসিনার শাসনামলে দেশ অর্থনৈতিক বিপর্যয়ে ছিল। এ আমলে বাংলাদেশে অর্থনীতি ধসে পড়ার কয়েকটি নমুনা নিম্নরূপ :

ক. টাকার অবমূল্যায়নঃ টাকার অবমূল্যায়ন করা হয় ১৮ বার যার ফলে টাকার মূল্য কমে যায় ডলার প্রতি ১৭ টাকা।

খ. শেয়ার মার্কেটঃ শেয়ার মার্কেট ধ্বংস করা হয় অর্থমন্ত্রীর পুত্রবধু, আওয়ামী লীগ ফায়দাভোগকারী ও ভারতীয় মাড়োয়ারী বেনিয়াদের ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে। শখের ফকির হয়ে যায় লক্ষ লক্ষ মানুষ।

গ. রাজস্ব আয়ঃ রাজস্ব আয় বাড়াতে চরমভাবে ব্যর্থ আওয়ামী সরকার শুধুমাত্র (১৯৯৯-২০০০) অর্থ বছরে দেশের ব্যাংকগুলো থেকে ঋণ নেয় চার হাজার কোটি টাকা। এ হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংকের। চাটার্ড ব্যাংকের মতে, এ অঙ্ক ৯ হাজার কোটি টাকা। পানি, গ্যাস ও বিদ্যুতের দাম বেড়েছে দফায় দফায়, নিত্য ব্যবহার্য পণ্যের ওপর বসেছে উচ্চহারে শুল্ক। বীজ, সার, কীটনাশক, ডিজেল এবং অন্যান্য কৃষি উপকরণের দাম বৃদ্ধি পাওয়ায় ফসলের উৎপাদন খরচ বেড়েছে অস্বাভাবিক মাত্রায় অথচ উৎপাদিন ফসলের ন্যায্যমূল্য পায়নি কৃষক।

ঘ. চোরাচালানঃ বিদেশি পণ্যের অবাদ চোরাচালানের কারণে দেশীয় পণ্য প্রচণ্ডভাবে মার খেয়েছে, বন্ধ হয়ে গেছে শত শত শিল্পকারখানা। বৈধ-অবৈধ পথে আসা হাজার হাজার কোটি টাকার ভারতীয় পণ্য বাংলাদেশকে পরিণত করেছে ভারতের একটি বৃহৎ একচেটিয়া বাজারে।

ঙ. প্রবৃদ্ধি হারঃ জনগণের আয় বৃদ্ধি পায়নি অথচ দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি এবং দফায় দফায় বিদ্যুৎ পানি ও গ্যাসের দাম বাড়াতে ব্যয়ের বোঝা বেড়েছে অনেক। বেকার সমস্যা হয়েছে প্রকট। এতদসত্ত্বেও মিথ্যার আশ্রয় দিয়ে প্রবৃদ্ধির হার বৃদ্ধি দেখিয়ে জনগণকে বোকা বানানোর অপচেষ্টা করেছে সরকার।[৭]

১১. আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতিঃ হাসিনা সরকারের আমলে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির চরম অবনতি ঘটে। ওই আমলে গড়ে প্রতিদিন ৩ জন করে লোক খুন হয়েছে। অর্থাৎ বছরে গড়ে খুন হয়েছে ১১০০ লোক। আর ৫ বছরে খুন হয়েছে সাড়ে ৫ হাজার লোক। তার ওপর একাধিক স্থানে ভয়াবহ বোমা বিস্ফোরণের ঘটনা ছিল সারা জাতির জন্য সত্যিই আতঙ্কজনক।

৭। এখানেও নেতৃত্বের ব্যর্থতা এবং সার্ভিস ডেলিভারীতে অক্ষমতা এবং পরিনামে জনদূর্ভোগ সংঘটন লক্ষ্যনীয়।

Dhaka University Institutional Repository

যেমন ঃ যশোরে উদীচীর সম্মেলনে বোমা বিস্ফোরণ, পল্টন ময়দানে সিপিবির সমাবেশে ও তারপর রমনা বটমূলে বোমা বিস্ফোরণ, গোপালগঞ্জের গির্জায় বোমা বিস্ফোরণ, এসব বোমা বিস্ফোরণের ঘটনায় জড়িতদের তদন্ত এবং বিচার কাজে সংশ্লিষ্টরা সফলতা দেখাতে পারেনি।

পরিশেষে বলা যায়, আওয়ামী লীগ সরকার গঠনের সময় দেশের মানুষ আশা করেছিল বিএনপি সরকারের ব্যর্থতাগুলো দীর্ঘ ২০ বছর পর ক্ষমতায় ফিরে আসা আওয়ামী লীগ দূর করতে সক্ষম হবে। আওয়ামী লীগ সম্পর্কে মানুষের পূর্ববর্তী ভুল ধারণা দূর করতে সম্ভব হবে। কিন্তু দেশ পরিচালনায় বিদ্যুতের অভাব, প্রশাসনিক অব্যবস্থা, দ্রব্যমূল্যের অস্থিরতা, আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ইত্যাদি মানুষের আশার আলোতে চির ধরিয়েছে। তারপরও সার সঙ্কটের সঠিক সমাধান, গঙ্গা-পানি, পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তি, লোকাল গভর্নমেন্টে মহিলাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ ইত্যাদি উদ্যোগ সাধারণ জনগণের মধ্যে উৎসাহের সৃষ্টি করে।[৮]

খ রাজনৈতিক জ্ঞান ও দক্ষতার অভাব ঃ

১. বৈদেশিক নীতির ক্ষেত্রে সংকট ও বৈদেশিক শক্তির প্রভাবঃ যেকোনো বেসামরিক সরকারের পতন ও সামরিক সরকারের অভ্যুত্থানের পেছনে বৈদেশিক শক্তির প্রভাব প্রমাণ করা কঠিন। কিন্তু এটা অনস্বীকার্য, এ ব্যাপারে বৈদেশিক শক্তির বিশেষ ভূমিকা থাকে। বাংলাদেশের ক্ষেত্রেও Lifschultz প্রমাণ করার চেষ্টা করেন, এক্ষেত্রে আওয়ামী লীগের মধ্যে ডানপন্থীগণ সি. আই, এর সহায়তায় মুজিবের পতন ডেকে এনেছিল। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে আমেরিকার ভূমিকা বিভিন্নভাবে লক্ষ্য করা যায় প্রথমত: স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় ভারত ও সোভিয়েট ইউনিয়ন মুক্তিযোদ্ধাদের সাহায্য করেছিল কিন্তু আমেরিকা স্বাধীনতা যুদ্ধের ব্যাপারে কোনো সমর্থন দেয়নি। বরং পাকিস্তানের পক্ষ নিয়ে স্বাধীনতা যুদ্ধের সময়ে মিটমাটের চেষ্টা করেছিল। এ মিটমাটের নেতা ছিলেন খন্দকার মোস্তাক আহম্মদ যিনি মুজিবের মৃত্যুর পর বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট হন। দ্বিতীয়ত: আমেরিকার পক্ষ থেকে এটা মনে করা হয়েছিল যে স্বাধীনতার পর ভারত ও সোভিয়েট ইউনিয়ন বাংলাদেশে প্রচণ্ড প্রভাব বিস্তার করেছিল। মুজিব ভারতের সাথে ২৫ বছরের এক মৈত্রীচুক্তি স্বাক্ষর করেন। সোভিয়েট ইউনিয়নও বাংলাদেশের সঙ্গে সাংস্কৃতিক চুক্তি সাক্ষর করেন। এসব কারণে বাংলাদেশে আমেরিকার গুরুত্ব কমে যায়। তৃতীয়ত: জাতীয়করণ নীতির ফলে বাংলাদেশে বহুজাতিক কর্পোরেশনগুলোর ব্যবসা মোটামুটি বন্ধ হয়ে

৮। প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৩৬৬।

Dhaka University Institutional Repository

যায়। এসব কারণে বলা যেতে পারে যে শেখ মুজিব সরকারের পতনের প্রতি আমেরিকার নৈতিক সমর্থন ছিল।[৯]

২. বাকশাল গঠন (Forming the BKSAL): বাকশাল মানে একদলীয় ব্যবস্থা। বাংলাদেশে একদলীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ সরকার কি ভুল করেছিলেন এবং এর দোষগুণ ত্রুটিই বা কি ছিল কিংবা এ ব্যবস্থার কোনো গুণাগুণ ছিল কিনা তা এখনো আমরা পরীক্ষা করে দেখবো। আমরা জানি, একদলীয় পদ্ধতি এমন একটি রাজনৈতিক ব্যবস্থা যেখানে প্রতিযোগিতামূলক আদর্শের ভিত্তিতে অন্য কোনো রাজনৈতিক দলের অস্তিত্ব থাকে না। অর্থাৎ একটিমাত্র রাজনৈতিক দলই দেশের সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। একদলীয় ব্যবস্থার উদ্ভব ঘটে সে সম্পর্কে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের যুক্তিপূর্ণ তথ্যের অভাব নেই। বাংলাদেশে একদলীয় ব্যবস্থা প্রবর্তন করার পূর্বে সরকার ঘোষণা করেছিলেন, এখানে সংসদীয় পদ্ধতির সরকার ব্যর্থ হয়েছে। কিন্তু প্রশ্ন থেকে যায় বাংলাদেশে কি সংসদীয় সরকার ব্যর্থ হয়েছিল না তাকে সঠিকভাবে কার্যকর করার জন্য যথাযথ সুযোগ সৃষ্টি করা হয়নি। পাশাপাশি আর একটি প্রশ্ন থাকে, একদলীয় ব্যবস্থা (বাকশাল) প্রবর্তন করা কি তখন অবশ্যম্ভাবী ছিল; এর কি কোনো বিকল্প ছিল না? আবার, বাকশাল গঠন করে কি আওয়ামী লীগ সরকার প্রকৃতপক্ষে সংসদীয় গণতন্ত্রের সমাধি রচনা করেছিলেন? আওয়ামী লীগ কি এর মাধ্যমে গণতন্ত্রকে হত্যা করেছিলেন? বাকশাল গঠন করে কি শেখ মুজিবুর রহমান ভুল করেছিলেন? এরূপ হাজারো প্রশ্ন আমাদের সামনে এসে ভিড় করে। এখন আমরা এসব প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে সচেষ্ট হবো।

বাকশালের স্বপক্ষে বলা হয়েছে, আমাদের দেশের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ না-খাওয়া, আধা, ভুখা-নাঙ্গা, দারিদ্র, ক্ষুধা ও ব্যধিতে আক্রান্ত বিধায় তাদের কাছে গণতান্ত্রিক অধিকার হলো- কর্মের অধিকার, খাদ্য, বস্ত্র, আশ্রয়, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের অধিকার। এরূপ দরিদ্রতম জনগোষ্ঠীর কাছে গণতান্ত্রিক অধিকার হলো মৌলিক চাহিদার অধিকার প্রাথমিকভাবে এবং দ্বিতীয়: মৌলিক অধিকার। মৌলিক চাহিদার ন্যূনতম পূরণ করা ছাড়া তথাকথিত মৌলিক অধিকা অবাস্তব তথা অগণতান্ত্রিক এবং শোষকদের শোষণের হাতিয়ার। শেখ মুজিবুর রহমান বাকশাল গঠন করে

৯। দেখুন, লরেন্স লিফাসুজ, বাংলাদেশ: দি আনফিনিসড রিভালিউশন।

Dhaka University Institutional Repository

তাই মৌলিক চাহিদার এ প্রাথমিক গণতান্ত্রিক অধিকারকে কার্যকরী করতে প্রয়াসী হন।১০[১০] এতদসত্ত্বেও বাস্তবে তা জনগণের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়নি।

বাকশাল গঠনের মাধ্যমে শেখ মুজিবুর রহমান যে উদ্দেশ্য সাধন করতে চেয়েছিলেন তা ভালো কি মন্দ, তা সফল হতে যাচ্ছিল কিনা কিংবা তার মাধ্যমে দেশে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি কতদূর কার্যকরী হতো আমরা বঙ্গবন্ধু এবং তাঁর দলীয় সদস্যগণ বাকশালের কর্মসূচি বাস্তবায়িত করতে সক্ষম হলেন কিনা এতসব প্রশ্নে না গিয়ে একথা জোর দিয়ে বলা যায়, তাঁর নতুন পদক্ষেপসমূহ জনগণকে বিভ্রান্ত করেছিল বহুগুণে এবং শক্তিশালী সামাজিক গোষ্ঠীসমূহের অধিকাংশের মনে ভীতির সঞ্চার করেছিল। এ প্রসঙ্গে মওদুদ আহমেদ তাঁর সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থে লিখেছেন : "...As a matter of fact, his proposed reforms were going to affect almost all the influencieal classes of society. The landowners who constitute the rural elite and dominate rural life were in fear of losing their share-interest in compulsory comperatives, the civil servants were now brought under complete political control which they never liked. The army was pushed into the background of national activities against their wishes, the judiciary was made subservient to the executive annoying both the Bench and the Bar and lastly his own partymen, the Awami League and the members of parliament had now become redundant institutions under the proposed new system."[১১]

একথা সর্বজনস্বীকৃত যে, যেকোনো শাসন ব্যবস্থাকে কার্যকরী করে তোলার জন্য রাজনৈতিক ইচ্ছা ছাড়াও আরো প্রয়োজন হয় যারা এ ব্যবস্থাকে কার্যকরী করার কাজে নিয়োজিত তাদের সদিচ্ছা ও সৎ কর্মতৎপরতা। আওয়ামী লীগের বেলায়ও তা ঘটে। বলা যেতে পারে, আওয়ামী লীগ নেতাদের শ্রেণী চরিত্র এবং তাঁদের সামাজিক অর্থনৈতিক পটভূমির প্রতি দৃষ্টিপাত করলে এটা স্পষ্ট হয়ে উঠে, যে আওয়ামী লীগ নেতারা সংসদীয় ব্যবস্থাকে বাস্তবে কার্যকর করতে সক্ষম হয়নি তারাই আবার কিভাবে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে সফল করবে এটা একটা বিরাট প্রশ্ন থেকে যায়। অবস্থাদৃষ্টে মনে হয় এবং শেখ মুজিব নিজেও এটা অনুধাবন করতে পেরেছিলেন তাঁর দল নতুন স্বাধীনতাপ্রাপ্ত দেশের বিভিন্ন সমস্যা ও চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় ব্যর্থ

১০। সাইদ দিলরুবা, বাকশাল কি এবং কেন ১৯৭৯, ষষ্ঠ অধ্যায় পৃষ্ঠা-৪৫।
১১। Ahmed Moudud, Bangladesh: Era of Sheikh Mujibur Rahman, UPL, Dhaka, 1983, P-250)।

Dhaka University Institutional Repository

হয়েছেন। দলের অভ্যন্তরে নানা ধরনের মতানৈক্য ও কোন্দল বিরাজমান ছিল। তাঁর দলের সদস্যগণ ক্ষুদ্র ব্যক্তিগত স্বার্থরক্ষায় নিয়ত ব্যস্ত ছিলেন। সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির উদ্দেশ্যসমূহ বাস্তবায়নের জন্য নয়। অভ্যন্তরীণ দলীয় কোন্দলের ফলে আওয়ামী লীগের অনেক কর্মিকে জীবন দিতে হয়েছে। এসব শেখ মুজিবকে ব্যথিত করে এবং শেষ পর্যন্ত হতাশ হয়ে তিনি তাঁর দল থেকে মুক্তি পেতে চেয়েছিলেন যে দলকে তিনি সুদীর্ঘ ৩৫ বছর ধরে লালন করে আসছিলেন।

শেখ মুজিব একক দল (বাকশাল) গঠন করলেন ঠিকই কিন্তু সেই পুরনো ব্যক্তিদের নিয়েই আবার তাঁর নতুন যাত্রা শুরু করলেন। তিনি তাঁর দলকে প্রত্যাখ্যান করলেন কিন্তু দলের লোকদের প্রত্যাখ্যান করতে পারলেন না। তিনি দলীয় সদস্যদের কর্মকাণ্ডে বীতশ্রদ্ধ হয়েছিলেন কিন্তু তাদের বাদ দিতে পারেননি। ফলে তারাই আবার নতুন দলের কর্ণধার হয়ে শেখ মুজিবের কাছাকাছি তাদের অবস্থানকে সুদৃঢ় করতে থাকেন। কেবলমাত্র ন্যাপ (মোজাফফর) ও সিপিবি থেকে মুষ্ঠিমেয় কয়েকজনকে গ্রহণ করা ব্যতীত বাকি সবাই ছিলেন পুরাতন। কেবিনেটে সবাই স্থান পেয়েছিলেন। কেবলমাত্র দু'জনকে ডক্টর এ আর মলিক এবং ডক্টর মোজাফফর আহমদ চৌধুরীকে উক্ত কেবিনেটে নতুন করে নেয়া হয়েছিল। বাকশালের কেন্দ্রীয় কমিটি এবং নির্বাহী কমিটিতেও আওয়ামী লীগেরই প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়। বাকশালের ৫টি ফ্রন্টের মধ্যে চারটির নেতৃত্ব প্রদান করা হয় আওয়ামী লীগের সদস্যদের হাতে এবং একটি ফ্রন্ট কৃষকফ্রন্টের নেতৃত্বে অধিষ্ঠিত হয় সিপিবি নেতা মনি সিং এর হাতে। সঙ্গত কারণে এসব ফ্রন্টের ঘোষণা জনমনে তেমন কোনো উৎসাহের সঞ্চার করেনি বরং তা জনগণকে সরকারের উদ্দেশ্য সম্পর্কে হতাশ ও ভীত সন্ত্রস্ত করে তোলে। রাজনৈতিক স্বাধীনতা ও মৌলিক অধিকারের অনুপস্থিতিতে এবং সে সঙ্গে রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধকরণ ও খবরের কাগজ বাজেয়াপ্তকরণ কেবল জনমনে নিরাপত্তাহীনতাই এনে দেয়।

সতর্কতার সঙ্গে পরীক্ষা করলেও কোনো বিশেষ কারণে শেখ মুজিবুর রহমান বাকশাল গঠন করেছিলেন তা বড় একটা সুস্পষ্ট হয় না। এক্ষেত্রে কোনো একটি কারণকে সুনির্দিষ্টভাবে দায়ী করা চলে না। বরং এর জন্য কতগুলো কারণকে সমন্বিতভাবে দায়ী করা যায়। তবে একথা বলা চলে, রাষ্ট্রীয় বিষয়াদি সুষ্ঠু সমাধান করতে সক্ষম না হয়ে শেখ মুজিবুর রহমান পদ্ধতিতে পরিবর্তন সাধনে অগ্রসর হন এবং তার মাধ্যমে অবস্থার উন্নতি করতে চেয়েছিলেন, কিংবা তিনি ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব হারাবার ভয়ে কিভাবে ক্ষমতায় টিকে থাকা যায় তার সুদৃঢ় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে

Dhaka University Institutional Repository

চেয়েছিলেন অথবা তিনি আন্তরিকতার সঙ্গে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির মাধ্যমে জাতিগঠনের দিকে অগ্রসর হতে সচেষ্ট ছিলেন। কারণ যেটাই হোক ভাগ্যের এমনই পরিহাস, বাকশাল গঠনের পরও কিন্তু পরিস্থিতির তেমন কোনো উন্নতি হয়নি। সরকারের মনোভাব, প্রশাসনিক স্টাইল এবং প্রশাসন ব্যবস্থায় পুরনো ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্তি এসব কিছুই শাসক এলিটদের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি করতে ব্যর্থ হয়েছিল। দেশের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির কোনো উন্নতি হয়নি। ২৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৫ মুজিব তাঁর একজন সংসদ সদস্যকে হারান যাকে দুস্কৃতিকারীরা গুলি করে হত্যা করে। মুজিব যদিও জাতীয় সংসদ সদস্যদেরকে তাঁদের সম্পত্তির হিসেব দিতে নির্দেশ দেন কিন্তু বাস্তবে তাঁদের কারোরই বিরুদ্ধে কোনোরূপ আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি। এসব বিষয় পর্যালোচনা করে আমরা এ সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি, বাকশাল প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে শেখ মুজিব যে তার জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন তা বাস্তবে কার্যকর হতে পারেনি বরং তা এক প্রকার রাজনৈতিক স্লোগানে পরিণত হয়েছিল এবং একদলীয় শাসন প্রতিষ্ঠার মধ্যে নিহিত ছিল রাজনৈতিক ক্ষমতাকে সম্পূর্ণরূপে কুক্ষিগত করে ক্ষমতায় টিকে থাকা।[১২]

(৩) প্রশাসন ব্যবস্থার সামরিকীকরণ (Militarization of Administration): রাষ্ট্রপতি এরশাদ প্রশাসন ব্যবস্থাকে যথেষ্ট পরিমাণে সামরিকীকরণ করেন। যার ফলে প্রশাসনের সর্বত্রই সামরিক বাহিনীর কর্মকর্তাদের উপস্থিতি ও প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও সেক্টর কর্পোরেশনগুলোতে তিনি সামরিক কর্মকর্তাদের নিয়োগ দান করেন। এমনকি জেলা পরিষদেও তিনি সেনাবাহিনীর সদস্যদের নিয়োগদানের কথা ভেবেছিলেন যদিও শেষ অবধি তা কার্যকর হয়নি।

এছাড়া তিনি সিভিল সার্ভিসের বিভিন্ন পদে ১০% সামরিক বাহিনীর কর্মকর্তাদের নিয়োগের কথা বলেন যদিও শেষ পর্যন্ত তা বাস্তবায়ন করা হয়নি। এ থেকে স্পষ্ট হয়ে উঠে রাষ্ট্রপতি এরশাদ প্রশাসন ব্যবস্থাকে সামরিকীকরণ করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন।[১৩]

৪. বিরাষ্ট্রীয়করণের নামে জাতীয় সম্পদ লুণ্ঠন (Looting of National Resources in the Name of Denationalization): বাংলাদেশে মুজিব শাসনামলে দেশের অর্থনীতিতে গতিশীলতা আনয়নের জন্য ক্ষমতাসীন সরকার বৃহৎ শিল্প ও কলকারখানা

১২। দেখুন, চৌধুরী, ড. হাসানুজ্জামান, আওয়ামী লীগ ও বাকশাল ১৯৭২-৭৫।
১৩। দেখুন, চৌধুরী, ড. হাসানুজ্জামান, বাংলাদেশ: রাষ্ট্র ও সরকারের শামরিকীকরণ, ঢাকা; ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, (ইউ.পি.এল), ১৯৭১।

Dhaka University Institutional Repository

জাতীয়করণ বা রাষ্ট্রীয়করণ করেন। কিন্তু এর ফলাফল মোটেই দেশের অর্থনীতির জন্য শুভ হয়নি। পরবর্তীতে জিয়াউর রহমান সরকার এ জাতীয়করণ নীতির পরিবর্তে ধীরে ধীরে বিরাষ্ট্রীয়করণ বা বিজাতীয়করণ চালু করেন। ফলশ্রুতিতে দেশের অর্থনীতিতে কিছুটা হলেও চাঙা হয়ে উঠেছিল। কিন্তু এরশাদ সরকার বেশকিছু জাতীয় প্রতিষ্ঠান, ব্যাংক-বীমা ও শিল্পপ্রতিষ্ঠান নামমাত্র মূল্যে ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর হাতে বিক্রি করে দেন। এতে করে কতিপয় নব্য কোটিপতি সৃষ্টি হয়।

গ দুর্নীতিগ্রস্ত নেতৃত্ব

১. সন্ত্রাস ও দুর্নীতি দমনে ব্যর্থতা : মূলত রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের হাত ধরেই জিয়ার উত্থান। তিনি প্রত্যক্ষভাবে না হলেও পরোক্ষভাবে এ সন্ত্রাসের সমর্থন করেছেন, মদদ দিয়েছেন, হত্যাকারীদের Indeminity দিয়েছেন, পুরস্কৃত করেছেন। আওয়ামী লীগ মনে করে শেখ মুজিবের হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত না হলেও পরোক্ষ একটা যোগ ছিল জিয়ার। শেখ মুজিবের মৃত্যুতে তিনিই লাভবান হয়েছেন সবচেয়ে বেশি, রাষ্ট্রপতি হয়েছেন এবং সেই সঙ্গে সংবিধান বদল করেছেন, বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদ চালু করেছেন আওয়ামী লীগের রাজনীতি করা তিনি কঠিন করে তুলেছেন।[১৪] রাজনীতিতে টাকার দৌরাত্ম আগে যে ছিল না তা নয়, জিয়া প্রায়ই বলতেন, Money is no problem. নিজে তিনি দুর্নীতি থেকে দূরে থাকতেন। কিন্তু দলের লোকদেরকে দুর্নীতিতে তিনি উৎসাহিত করতেন। আর বিরোধী দলকে যখন রণধ্বনি দিয়ে কাছে আনা যেত না তখন তিনি টাকা দিয়ে ডাক দিতেন, কিংবা টাকা রোজগার করার সুযোগ করে দিতেন। মন্ত্রীত্ব সেবার জন্যও ইশারা দিতেন। তিনি টাকার শক্তিতে বিশ্বাসী ছিলেন। মেধা বা বিরোধিতা যাই দেখতেন, কিনতে চাইতেন।[১৫] এভাবে সন্ত্রাস আর দুর্নীতিতে দেশ আছন্ন করে ফেলেন সামরিক শাসন জেনারেল জিয়াউর রহমান।

২. ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠান ব্যর্থতা: মহান মুক্তিযুদ্ধ ও এক সাগর রক্তের বিনিময়ে অর্জিত বাংলাদেশের চলার পাথেয় ও পথের বিপরীতমুখী বাক বদল হলো। একজন মুক্তিযোদ্ধার নেতৃত্বে ১৯৭৫ এর ১৫ আগস্টের পর শুরু হলো গুপ্ত হত্যা, অভ্যুত্থান, পাল্টা ও অভ্যুত্থান। মারা পড়তে লাগল দেশপ্রেমিক মুক্তিযোদ্ধা ও সৈনিক। রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ পদে প্রতিষ্ঠিত হতে

১৪। চৌধুরী সিরাজুল ইসলাম, গণতন্ত্রের পক্ষে বিপক্ষে, বিদ্যা প্রকাশ, ফেব্রুয়ারী-১৯৯০ পৃষ্ঠা-৭২।
১৫। প্রাগুক্ত, পৃ-৭৪।

Dhaka University Institutional Repository

লাগল স্বাধীনতা বিরোধী, যুদ্ধাপরাধী, রাজাকার আলবদর আল শামস ও সামরিক শাসনের যাতাকলে বিচারালয়। সিভিল সোসাইটির কণ্ঠরোধ হতে লাগল। বন্দুকের নল হয়ে উঠল সকল ক্ষমতার উৎস। কালোটাকা আর অস্ত্রের কাছে দেশ জিম্মি হতে লাগল। ছাত্র সমাজকেও অস্ত্র, অর্থ আর প্রলোভনের বশবর্তী করে আপন রাজত্ব কায়েমের নীল নকশা তৈরি করা হলো। অর্থ আর ক্ষমতা হয়ে উঠল ন্যায় বিচারের মানদণ্ড যা অবিচারের নামান্তর।

৩. মুজিব হত্যার সুষ্ঠু বিচার করনের ব্যর্থতা : মহিউদ্দিনকে একপাশে সরিয়ে দিয়ে নুর চিৎকার করে আবোল তাবোল বকতে বকতে তার স্টেনগান থেকে মুজিবের প্রতি "ব্রাশ ফায়ার" করে। শেখ মুজিব তাকে কিছু বলার আর সুযোগ পেল না। স্টেনগানের গুলি তার বুকের ডানদিকে একটি বিরাট ছিদ্র করে বেরিয়ে গেল। গুলির আঘাতে তার দেহ কিছুটা পিছিয়ে গেলো। তারপর নিস্তেজ হয়ে তার দেহ মুখ থুবড়ে সিঁড়ির মাথায় পড়ে গেল। বাঙালি জাতীয়তাবাদের মহান নেতার প্রাণহীন দেহ সিঁড়ি দিয়ে কিছু দূর গড়িয়ে গিয়ে রইলো। তাঁর ধূমপানের প্রিয় পাইপটি তখনো তিনি শক্তভাবে ডানহাত দিয়ে ধরে রেখেছিলেন।

সময় তখন সকাল ৫টা ৪০ মিনিট। বাঙালি জাতির সঙ্গে শেখ মুজিবের প্রচণ্ড ভালোবাসার চিরতরে অবসান ঘটলো।[১৬] জেনারেল জিয়াউর রহমান ক্ষমতা গ্রহণের পর সদইচ্ছা থাকলে উল্লিখিত মর্মান্তিক হত্যাকাণ্ডের বিচার করতে পারতেন। কিন্তু তা না করে এসব হত্যাকারীদের প্রশয় দিয়েছেন, পুস্কৃত করেছেন যা বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রের নৈতিক ভিত্তিক একেবারে দুর্বল করে ফেলেছিল। যার মাশুল আজো গুণতে হচ্ছে।

৪. মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বিনষ্ট : জেনারেল জিয়াউর রহমান ক্ষমতার মোহে ও কর্তৃত্ব নিরঙ্কুশ করার জন্য একজন মুক্তিযোদ্ধা হয়েও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ধ্বংশে প্রধান কুশিলবের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন। তিনি ১৯৭৬ সালের গোড়া থেকেই মুজিব শাসনামলে বিশেষ ক্ষমতা আইন ও জরুরি ক্ষমতা বিধি অনুসারে আটককৃত ব্যক্তিদেরকে মুক্তি এবং তাদের বিরুদ্ধে আনীত মামলাসমূহের পুনর্বিবেচনা শুরু করেন। ক্ষমতা কুক্ষিগত করার প্রচেষ্টা হিসেবে জেনারেল জিয়া ১৯৭৬ সালে প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী এয়ার ভাইস মার্শাল তওয়াবকে বলপূর্বক ক্ষমতা থেকে অপসারণ এবং অপর যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বী মুক্তিযোদ্ধা কর্নেল তাহেরকে এবং অপর মহান মুক্তিযোদ্ধা ৯ নম্বর সেক্টরের কমান্ডার মেজর এমএ জলিলকে মৃত্যুদণ্ড দান করেন। যদিও

১৬। ম্যাসকারেনহার্স, বাংলাদেশ: এ লিগ্যাসি অব ব্লাড, ভাষান্তর বাংলাদেশ: রক্তের ঋণ ঃ অনুবাদক মোহাম্মদ শাহাজাহান, হাক্কানী পাবলিশার্স ফেব্রুয়ারী-২০০২, পৃষ্ঠা-৮৯।

Dhaka University Institutional Repository

মেজর এমএ জলিলের মৃত্যুদণ্ড পরবর্তীতে রহিত করে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড প্রদান করেন কিন্তু বাংলার অপর কীর্তিমান সন্তান বীর মুক্তিযোদ্ধা কর্নেল তাহেরকে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করা হয়।[১৭] অপরদিকে কুখ্যাত রাজাকার যুদ্ধাপরাধী, গোলাম আযমকে বাংলাদেশে ফিরিয়ে আনা হয়। অপর রাজাকার শাহ আজিজুর রহমানকে রক্তস্নাত ও সম্ভ্রমহানীর দেশের প্রধানমন্ত্রী পর্যন্ত নিয়োগ করা হয়। সর্বোপরি স্বাধীনতা বিরোধীদের সর্বক্ষেত্রে পুনর্বাসনের মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে ধূলায় মিশিয়ে দেয়া হয়।

৫. উপজাতীয় সংঘাত ও সংঘর্ষ বৃদ্ধি : ইংরেজ শাসন আমলে ১৯২০ সালে জনৈক কামিনী মোহন দেওয়ানের নেতৃত্বে "পাবর্ত্য চট্টগ্রাম জনসমিতি" গঠিত হয় "যা ১৯৩৯ সালে সর্বপ্রথম রাজনৈতিক তৎপরতা শুরু করে। কালান্তরে ও ঘটনান্তরের ধারাবাহিকতায় ১৯৭২ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি পার্বত্য রাঙামাটিতে এমএন লারমার উদ্যোগে "পার্বত্য জনসমিতি" চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি নামে আত্মপ্রকাশ করে। এরপর জনসংহতি সমিতির সামরিক শাখা হিসেবে ১৯৭৩ সালের ০৭ জানুয়ারি "শান্তিবাহিনী" নামক সশস্ত্র দল গঠন করে। ১৯৭৬ সাল থেকেই শান্তিবাহিনী পার্বত্যাঞ্চলে পরিকল্পিত সামরিক তৎপরতা শুরু করে। এদিকে প্রেসিডন্ট জিয়াউর রহমান পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা সমাধানের কৌশল হিসেবে ১৯৭৯ সাল থেকে পার্বত্যাঞ্চলে ব্যাপকভাবে বাঙালি অভিবাসন শুরু করেন। সমতল ভূমি হতে প্রতিটি বাঙালি পরিবারকে ০৫ একর জমি ও নগদ ০৩ হাজার টাকা দিয়ে পার্বত্যাঞ্চলে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হয়। এরই ধারাবাহিকতায় ১৯৮১ সালের শেষেরদিকে পার্বত্য চট্টগ্রামে পুনর্বাসিত বাঙালির সংখ্যা দাঁড়ায় অনুমানিক ২ লক্ষাধিক। গুচ্ছগ্রামে পুনর্বাসনের নামে পার্বত্যাঞ্চলে বাঙালি অভিবাসনের মাধ্যমে পাহাড়ি বাঙালি জনসংখ্যানুপাতে অনুকূলে আনার প্রচেষ্টা পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যাকে তীব্রতর করে তোলে।[১৮] সংঘাত সুরাহার বদলে সঙ্কটে রূপান্তরিত হয়। বেড়েই চলে সম্পদ ও প্রাণহানির পরিমাণ।

৬. দুর্নীতির প্রশ্রয় ও নীতি বোধের ধ্বংস সাধন : জেনারেল জিয়া প্রায়ই বলতেন, "Money is no problem" তিনি আরো একবার এক সাক্ষাতকারে বলেছিলেন, রাজনীতিকদের জন্য আমি রাজনীতি করা কঠিন করে তুলবো। উপরিউক্ত উদ্ধৃতি দ্বারা জেনারেল জিয়ার নীতি আদর্শের চরম দেউলিয়া অবস্থাটিই প্রকটিত হয়ে উঠে। জিয়ার আমলে রাজনীতিতে টাকার

১৭। ভূঁইয়া, ড. মোঃ আবদুল ওদুদ, বাংলাদেশের রাজনৈতিক উন্নয়ন, পৃষ্ঠা-৩৯০।
১৮। রহমান হাবিবুর, পার্বত্য চুক্তি ও পাহাড় শান্তির সম্ভাবনা, অ্যাডর্ন পাবলিকেশন, একুশে গ্রন্থমেলা-২০০৫, পৃষ্ঠা-১০৪-১০৬।

Dhaka University Institutional Repository

দৌরাত্ম পূর্বাপেক্ষা অনেক বেশি বেড়ে যায়। নিজে তিনি দুর্নীতি থেকে দূরে থাকতেন কিন্তু দলের লোকদেরকে দুর্নীতিতে উৎসাহিত করতেন। রাজনীতি ও রাজনীতিবিদদেরকে তিনি বাজারের পণ্যে পরিণত করেছিলেন। তিনি কাউকে পরাস্ত করেছেন প্রলোভন দেখিয়ে, কাউকে নির্যাতন করে। তার নিজের কোনো দল ছিল না। নানা দল থেকে লোক টেনে এনেছেন। তাঁদেরকে নিজ নিজ আদর্শে টিকে থাকতে দেননি।[১৯] তিনি টাকার শক্তিতে বিশ্বাসী ছিলেন। রাজনীতিবিদদেরকে তার কাছে পেতে তিনি টাকা দিতেন বা টাকা সৃষ্টি করার সুযোগ করে দিতেন। তার আমলে রাষ্ট্রযন্ত্রের রন্ধ্রে রন্ধ্রে দুর্নীতি অনুপ্রবেশ করে যা বাংলাদেশকে এক ভয়াবহ অস্তিত্বের সংকটে নিপতিত করে।

৭. দুর্নীতির ব্যাপক প্রসার (Execessive Corruption and Malpractices): এরশাদ শাসনামলে দেশ যদিও এক সর্বগ্রাসী অর্থনৈতিক সংকটে নিপতিত হয় তবুও রাষ্ট্রপতি এরশাদ ও তাঁর পত্নী রওশন এরশাদ এবং মন্ত্রীদের ঘিরে থাকা এক ক্ষুদ্র অশুভ চক্র অতি দ্রুত তাঁদের ভাগ্য পরিবর্তন করে নেয়। ঢাকাভিত্তিক উন্নয়নের নামে তাঁরা দুর্নীতির পাহাড় গড়ে তোলেন। ঢাকা শহরে এখানে ওখানে বিভিন্ন মার্কেট নির্মাণ, পান্থপথ, রোকেয়া সরণী, বিজয় সরণী ইত্যাদি নির্মাণ করে তিলোত্তমা ঢাকা বানাবার পেছনে মূলত কমিশন হিসেবে অর্থ সম্পদ উপার্জন করাই ছিল আসল উদ্দেশ্য। তাছাড়া সোডিয়াম লাইট লাগানোর ক্ষেত্রেও ব্যাপক দুর্নীতি ধরা পড়ে। রাষ্ট্রপতির বিশেষ তহবিল, ফার্স্ট লেডির তহবিল, ত্রাণ তহবিল, পথকলি ট্রাস্ট এর তহবিলের হিসাব কখনো প্রকাশ করা হয়নি। কিন্তু দেশে বিদেশে বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় তাঁদের দুর্নীতির কাহিনী প্রকাশিত হয়। শাসকগোষ্ঠীর এ ধরনের দুর্নীতি ও পুনর্গঠনের সংবাদ জনজীবনে হতাশার সৃষ্টি করে। এ হতাশা থেকে জন্ম নেয় প্রতিশোধের আগুন।[২০]

৮. দলীয়করণ নীতির প্রভাব: অনুন্নত বা উন্নয়নশীল রাষ্ট্রে প্রকৃত গণতন্ত্র চর্চা অদ্যাবধি পরিলক্ষিত হয়নি। ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হবার পর ক্ষমতার অপব্যবহার উন্নয়নশীল রাষ্ট্রের সরকারের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। একনায়কতান্ত্রিক বা গণতান্ত্রিক যেরূপ সরকারই হোক না কেন, সঠিক সাংবিধানিক প্রক্রিয়ায় গণতন্ত্র চর্চা অনুন্নত দেশে প্রত্যক্ষ করা যায় না। বাংলাদেশে বিএনপি (খালেদা) সরকারের ক্ষেত্রে এ বিষয়টি লক্ষ্য করা গেছে। এ সরকারের শাসনামলে দেশের রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে দলীয়করণের নীতির বিশেষ প্রভাব দেখা

১৯। চৌধুরী সিরাজুল ইসলাম, নির্বাচিত রাজনৈতিক প্রবন্ধ, অন্যপ্রকাশ একুশে বইমেলা ২০০০ পৃষ্ঠা-৭৪।
২০। ভূঁইয়া ড. মোঃ আবদুল ওদুদ, বাংলাদেশের রাজনৈতিক উন্নয়ন, পৃষ্ঠা-৫৫৪।

Dhaka University Institutional Repository

গেছে। দলীয় সদস্য বা সমর্থক কোনো ব্যক্তি সে অদক্ষ বা আনাড়ি যাই হোক না কেন, তাকে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব অর্পণের ফলে ওই সকল কর্মকাণ্ডের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়েছে। ফলে দেশের উন্নয়নেও সংকট সৃষ্টি হয়েছে।

৯. সামাজিক দুর্নীতি ও অপরাধ নিরসনে ব্যর্থতা : সব সরকারের আমলেই ছাত্র-তরুণগণ রাজনীতিতে একটি বিশেষ স্থান অধিকার করে থাকে। এ সকল তরুণ যুবক ছাত্র তাদের সাহসিকতা ও বেপরোয়া চরিত্রের জন্য নিজ দলের নানাবিধ স্বার্থ হাসিলে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। দলীয় নেতারা নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখা এবং স্বার্থসিদ্ধি করার জন্য এ তরুণ সমাজের ওপর নির্ভরশীল থাকে বিধায় সরকারি ছত্রছায়ায় এরাও নানা ধরনের সন্ত্রাসী ও অসামাজিক কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হয়ে পড়ে। বিএনপি আমলে ছাত্রসমাজ ও তাদের সমর্থিত তরুণ যুবক শ্রেণী তাদের রাজনৈতিক দলের এবং নিজেদের স্বার্থ হাসিলের জন্য নানা ধরনের উচ্ছৃঙ্খলতা ও সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড করে। বিএনপি সরকার এসব অসামাজিক অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডের প্রতিবিধান ও প্রতিকার করতে ব্যর্থ হয়। সরকার সন্ত্রাস দমন আইন প্রণয়ন করে দেশে শান্তি শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার কথা বললেও বাস্তবে তা কার্যকরী করতে প্রায়শই ব্যর্থ হয়েছে।

১০. প্রশাসনিক দুর্নীতি উচ্ছেদে ব্যর্থতা : বাংলাদেশের পূর্ববর্তী সরকারসমূহের প্রশাসনিক দুর্নীতি গতিধারা খালেদা জিয়ার শাসনামলে পরিপূর্ণরূপে বন্ধ হয়ে যায়নি। সরকারের সমর্থক এবং সরকার সমর্থিত এক শ্রেণীর সরকারি আমলা ও পদস্থ কর্মকর্তা বিভিন্ন কৌশল অবলম্বনে জনগণকে নানাভাবে বঞ্চিত ও অপদস্থ করে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি করছে। প্রশাসনে দুর্নীতি ও নৈরাজ্য বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও দফতরের কর্মকাণ্ডকে বিপর্যস্ত করে দিয়েছে। প্রশাসনের অভ্যন্তরে অন্যান্য সরকারের মতো ও সরকারের আমলেও কর্মচারী কর্মকর্তাদের দুর্নীতি ও ঘুষ ব্যবস্থার মূল উৎপাটন করতে ব্যর্থ হয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে জনসাধারণের মৌলিক মানবাধিকারও লঙ্ঘিত হয়েছে যা নিশ্চিত করতে সরকার প্রায়ই ব্যর্থ হয়েছে।

১১. কর্মসংস্থান বৃদ্ধিতে ব্যর্থতা ও বেকারের সংখ্যা বৃদ্ধি: অর্থনৈতিক উন্নয়ন প্রবৃদ্ধি প্রভৃতি সম্পর্কে যথেষ্ট আশাব্যঞ্জক কথা বলা হলেও প্রকৃত প্রস্তাবে হাজার হাজার শিক্ষিত ও দক্ষ বেকারের পাশাপাশি নিরক্ষর ও অদক্ষ বেকারের সংখ্যা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছিল। এ সমস্যার সুষ্ঠু সমাধানে সরকার সফল হতে পারেনি। তাছাড়া এ সরকারের আমলে দেশ শিল্পায়নে সমৃদ্ধশালী

Dhaka University Institutional Repository

হতে পারেনি। কোনো নতুন কলকারখানা বা কর্মসংস্থানের পথ সৃষ্টি হয়নি বরং আদমজির মত মিল বন্ধ হয়েছে যা বেকার সমস্যার হার বাড়িয়ে দিয়েছে।

১২. দুর্নীতির অভিযোগ উত্থাপন: বিএনপি নেত্রী ও প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া নিজের দলের নেতা মন্ত্রী সাংসদদের বিরুদ্ধে আনীত বিরোধী দলের দুর্নীতির অভিযোগের সন্তোষজনক জবাব প্রদানে ব্যর্থ হয়েছেন। আওয়ামী লীগের উচ্চপর্যায়ের কয়েকজন সাংসদ বিএনপি সরকারের তিনজন মন্ত্রীর বিরুদ্ধে দুর্নীতির গুরুতর অভিযোগ সংসদে উত্থাপন করে। এছাড়া স্বয়ং প্রধানমন্ত্রীর ভাই, বোন ও পুত্রদের সম্পর্কে নানা ধরনের দুর্নীতির অভিযোগও বিভিন্ন মহল থেকে সময় সময় উত্থাপিত হয়। বিএনপি প্রতিষ্ঠাতা জিয়াউর রহমানের শাসনামলে স্বজন পরিজনের সম্পর্কে এরূপ দুর্নীতির অভিযোগ রীতিমত অকল্পনীয় বিষয় ছিল। কিন্তু খালেদা জিয়া বিএনপি সরকারের আমলে স্বজনপ্রীতি এবং স্বজনদের বিরুদ্ধে নানা ধরনের দুর্নীতির অভিযোগ জনগণের মনে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে।[২১]

ঘ প্রাতিষ্ঠানিক জ্ঞানের অভাব

(১) জাতিগঠন প্রক্রিয়ায় নেতৃত্বের ব্যর্থতা: ১৯৭১ সালে বিশ্বের মানচিত্রে বাংলাদেশের আবির্ভাব যেমন একদিকে সমগ্র বিশ্বের সহানুভূতি লাভ ও জনমনে আশার সঞ্চার করে ঠিক তেমনি অপরদিকে বাংলাদেশ তার অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখতে পারবে কিনা সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ থেকে যায়। নিউইয়র্ক টাইমস (The New York Times)-এর এক সম্পাদকীয়তে বাংলাদেশকে আন্তর্জাতিক ঝুড়ি (International Basket Case) বলে চিহ্নিত করেছেন। ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১ চূড়ান্ত বিজয় সূচিত হবার পর বাংলাদেশ প্রবাসী সরকার (Bangladesh Government in Exile) ঢাকায় প্রত্যাবর্তন করেন এবং সরকার গঠন করেন। কিন্তু শেখ মুজিবুর রহমান তখনো ছিলেন পাকিস্তানি কারাগারে বন্দি। তাঁর অনুপস্থিতিতে মনে হচ্ছিল যেন বাংলাদেশের স্বাধীনতা পূর্ণতা লাভ করেনি। তখনো একটি সুসংগঠিত প্রশাসনিক রাজনৈতিক সংগঠনের অভাব তীব্রভাবে অনুভূত হয়। জনমনে প্রশ্ন দানা বেঁধে উঠে, আওয়ামী লীগ সরকার কি সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত দেশটিকে সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর দাঁড় করাতে পারবে। পারবে কি বাঙালি জাতিকে নতুন দিক নির্দেশনা প্রদান করতে? স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণকারী বিভিন্ন দল ও গোষ্ঠীকে ঐক্যসূত্রে আবদ্ধ করাতে আওয়ামী লীগ নেতারা

২১। আহমেদ ইয়াসমীন, ঘর্ষণ রাখী, বাংলাদেশের রাজনৈতিক উন্নয়ন, পৃষ্ঠা-৩৩২-৩৩৪।

Dhaka University Institutional Repository

কতদুর সক্ষম হবেন? এমনি হাজারো প্রশ্ন তখন মাথাচাড়া দিয়ে উঠে। ধারণা করা হয়েছিল , স্বাধীনতা সংগ্রামের অব্যবহিত, পরেই গোলযোগ, দ্বন্দ্ব ও কলহ মাথাচাড়া দিয় উঠবে এবং পুনরায় দেশে রক্তের বন্যা বয়ে যাবে। ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি শেখ মুজিবুর রহমানের স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের পর থেকে জনমনে শক্তি ও সাহসের সঞ্চার হয়। ক্রমে তাদের শত সন্দেহ দূর হতে শুরু করে। যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশের অর্থনীতি ধীরে ধীরে চাঙা হতে থাকে। আওয়ামী লীগ এলিটরা তাঁদের রাজনৈতিক ক্ষমতা ও কর্তৃত্বকে সুদৃঢ় করতে সচেষ্ট হন। আর সেই উদ্দেশ্যে তারা রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার (Political Institution Building) কাজে আত্মনিয়োগ করেন।

বিশ্বের অন্যান্য সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত উন্নয়নশীল রাষ্ট্রের ন্যায় বাংলাদেশও তার জন্মলগ্নে একটি সুকঠিন সমস্যায় নিপতিত হয়েছিল। সমস্যাটি ছিল একই সময়ে ইনপুট এবং আউটপুট সেক্টর (Input and Output Sector) গড়ে তোলা। স্বাধীনতার পর এ উভয় সেক্টরই দারুন বিশৃঙ্খলার সম্মুখীন হয়। ইনপুট সেক্টরে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ সরকার একটি রাষ্ট্রীয় প্রশাসনযন্ত্র তথা রাজনৈতিক সংগঠন এবং আউটপুট সেক্টরে একটি রাজনৈতিক সম্প্রদায় গড়ে তোলার কাজে মনোনিবেশ করেন এবং তা সুষ্ঠুভাবে করতে গিয়ে নানাবিধ সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিলেন। প্রশাসন ব্যবস্থাকে পরিচালনার জন্য যে দুটো হাতিয়ার বেসামরিক আমলাতন্ত্র (civil bureaucracy) এবং সামরিক আমলাতন্ত্র (military bureaucracy) সরকারের হাতে থাকে, বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার সময় তা ছিল নিতান্তই দুর্বল ও অসংগঠিত। স্বাধীনতা চলাকালে অনেক সিনিয়র ও অভিজ্ঞ আমলা, সামিরক কর্মকতা পশ্চিম পাকিস্তানে আটকা পড়েন। স্বাধীনতা লাভের পর বাংলাদেশ এসব সিনিয়র ও অভিজ্ঞ আমলাদের সেবা থেকে বঞ্চিত হয়। সামরিক ও বেসামরিক আমলাদের মধ্যে দলাদলি, মুজিবনগরীয় ও অমুজিবনগরীয় আমলা ও কর্মচারীদের মধ্যে মন কষাকষি ও কোন্দল বৃদ্ধি পায়। যারা পাকিস্তানে আটক পড়েছিলেন তারা কোলাবরেটর এবং যারা ভারতে গিয়ে স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণ করেন তারা দেশপ্রেমিক বলে আখ্যায়িত হন। আওয়ামী লীগ সরকার দেশপ্রেমিকদেরই প্রাধান্য দেন। ফলে তাদের মধ্যে মন কষাকষি সৃষ্ট হয়।

দলীয় সংগঠনের ক্ষেত্রেও অনুরূপ অবস্থা দেখা যায়। স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় বিভিন্ন কারণে আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক কাঠামো অনেকটা দুর্বল হয়ে পড়ে এবং মুজিববাহিনী নামক একটি সাহায্যকারী সংগঠন গড়ে তোলা হয়। অবশ্য মুক্তিবাহিনী শেষ পর্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে স্বাধীনতা

Dhaka University Institutional Repository

যুদ্ধ পরিচালনা করে এবং বাংলাদেশ স্বাধীন হয়। শেখ মুজিবুর রহমানের স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের পর পরই তিনি রাজনৈতিক ব্যবস্থার সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য একটি সুসংহত রাজনৈতিক কাঠামো দাঁড় করাতে সচেষ্ট হন। যথা শিগগিরই তিনি অস্থায়ী সাংবিধানিক আদেশ জারি করে সংসদীয় শাসন ব্যবস্থা ও রাষ্ট্রীয় চার মূলনীতি ঘোষণা করেন। এভাবে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান গঠনের মাধ্যমে তিনি জাতি গঠনের কাজে হাত দেন।

আওয়ামী লীগ সরকার রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান গঠনের মাধ্যমে যে জাতি গঠনের কাজে হাত দেন তা ছিল মূলত ভারতীয় মডেলের অনুরূপ। এ মডেলের চারটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য লক্ষ্যণীয়- সংসদীয় গণতন্ত্র (Parliamentary Democracy), সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি (Socialist Economy), প্রভাবশালী একদলীয় ব্যবস্থা (A Single Dominant Party System) এবং ধর্ম নিরপেক্ষতার আদর্শ (A Secular Ideology)। এখন আমরা এ চারটি বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করব। প্রথমত: সংসদীয় গণতন্ত্র সম্পর্কে বলতে হয়, আওয়ামী লীগ জন্মলগ্ন থেকেই সংসদীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার ওপর আস্থা আরোপ করে। দলীয় কর্মসূচি, নির্বাচনী ঘোষণাপত্র এবং বিভিন্ন সময়ে বক্তৃতা-বিবৃতি সব কিছুতেই সংসদীয় ব্যবস্থা মূল দাবি হিসেবে কাজ করে। পাকিস্তানের শাসকশ্রেণী গোড়া থেকেই "Vice Regal Systems" পৃষ্ঠপোষকতা করতে থাকে এবং ১৯৭১ সাল পর্যন্ত মূলত এ পদ্ধতিকেই আকড়ে ধরে থাকে। পক্ষান্তরে আওয়ামী লীগ নেতারা ক্ষমতাসীন পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর কর্মকাণ্ডের বিপরীতে সংসদীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার দাবি জানায়। প্রকৃতপক্ষে এটাই ছিল আওয়ামী লীগের মূল দাবি (key demand। একাত্তরে মুক্তি সংগ্রাম চলাকালে সংসদীয় গণতন্ত্রে আওয়ামী লীগের বিশ্বাসের ফলেই ইহার নেতৃত্বে পরিচালিত মুক্তি সংগ্রামের প্রতি আন্তর্জাতিক সহানুভূতি ও সমর্থন লাভ করতে দলটি সক্ষম হয়েছিল। মুক্তি বাহিনীতে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের কর্মি ও ব্যক্তিবর্গ থাকা সত্ত্বেও সংসদীয় গণতন্ত্রের প্রতি কেউ অনীহা প্রকাশ করেনি। এটা ছিল দলমত নির্বিশেষে সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য একটা দাবি। স্বাধীনতা লাভের পর আওয়ামী লীগের ছাত্র সংগঠন ছাত্রলীগের একটি অংশ (রব-সিরাজ গ্রুপ) শেখ মুজিবুর রহমানের ব্যক্তিগত শাসন (Personal rule) প্রতিষ্ঠার দাবি জানায় কিন্তু তাতে কোনো ফলোদয় হয়নি। অতঃপর ১৯৭২ সালের অক্টোবর মাসে মেজর জলিল ও আবদুর রবের নেতৃত্বে জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ) গঠন করা হয়। যদিও আওয়ামী লীগের বিভিন্ন উপদল (Factions) স্বাধীনতা সংগ্রাম চলাকালে ও তার পূর্বে সংসদীয় গণতন্ত্রকে মডেল হিসেবে গ্রহণ করে তথাপি স্বাধীনতার

Dhaka University Institutional Repository

পর সেই ঐক্যমত ভেঙ্গে যায় এবং দলের অপেক্ষাকৃত তরুণ সমর্থনগণ এর বিরুপ সমালোচনা করতে থাকেন। শেখ ফজলুল হক মনিও ১৯৭৪ সালের শেষদিকে বিপ্লবী সরকার গঠনের জন্য শেখ মুজিবুর রহমানের ওপর প্রভাব বিস্তার করতে সচেষ্ট হন। এমনকি তিনি শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে একটি দ্বিতীয় বিপ্লবের (Second revolution) ডাক দিতে শেখ মুজিবুর রহমানকে অনুরোধ করেন। তখন শেখ ফজলুল হক মনি বিভিন্ন বক্তৃতা বিবৃতিতে দ্বিতীয় বিপ্লবের ধারণাকে জনসমক্ষে প্রচার করতে শুরু করেন।

দ্বিতীয়তঃ সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির প্রতি আওয়ামী লীগের প্রতিশ্রুতি খুব বেশি দিনের নয়। দলের কর্মসূচিতে সমাজতন্ত্র সংক্রান্ত কোনো বিষয় অন্তর্ভুক্ত ছিল না। এ কারণেই প্রধানত ১৯৬৬ সালে আওয়ামী লীগ থেকে বামপন্থীরা বের হয়ে আসেন। এমনকি প্রধানত ১৯৬৬ সালে ঘোষিত আওয়ামী লীগের ছয়দফা কর্মসূচিতেও সমাজতান্ত্রিক কোনো বিধান ছিল না। তবে ১৯৬৮ সালে ঘোষিত ছাত্রসমাজের ১১ দফা দাবির মধ্যে কতিপয় সমাজতান্ত্রিক দাবি অন্তর্ভুক্ত ছিল। ১৯৭০ সালের নির্বাচনী ঘোষণাপত্র (ইলেকশন মেনিফেস্টো) আওয়ামী লীগ ছাত্রসমাজের ১১ দফা দাবি থেকে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির ধারণা সংক্রান্ত কতিপয় দাবি অন্তর্ভুক্ত করে নেয়। তারপর মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও অন্যান্য পূর্ব ইউরোপীয় সমাজতান্ত্রিক দেশগুলো বাংলাদেশ প্রবাসী সরকারকে সমর্থন প্রদানের পর সমাজতন্ত্রের প্রতি আওয়ামী লীগের সমর্থন আরো সুদৃঢ় হয়। স্বাধীনতার পর ১৯৭২ সালের সংবিধানে সমাজতান্ত্রিক বিধি বিধান সংযুক্ত করা হয় এবং সমাজতন্ত্রকে চারটি রাষ্ট্রীয় মৌলনীতির একটি অন্যতম মৌলনীতি বলে ঘোষণা করা হয়।

তৃতীয়তঃ প্রভাবশালী একদলীয় ব্যবস্থার প্রতি আওয়ামী লীগের সমর্থন ভারথীয় মডেলের বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে ধার করে নেয়া হয়েছে। ভারতের প্রভাবশালী একদলীয় ব্যবস্থা সেদেশের রাজনীতিতে স্থিতিশীলতা এনে দিয়েছে। পাকিস্তানের প্রথম দশকের রাজনীতিতে সংসদীয় গণতন্ত্রের কার্যকারিতা ও বহুদলীয় ব্যবস্থার অস্তিত্ব সেখানে স্থিতিশীলতা আনয়ন করতে ব্যর্থ হয়েছিল। এটা প্রত্যক্ষ করে আওয়ামী লীগ বহুদলীয় ব্যবস্থার প্রতি কিছুটা সন্দিহান হয়ে পড়ে। ১৯৭২ সালের সংবিধানের মাধ্যমে সংসদীয় ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করে প্রভাবশালী একদলীয় ব্যবস্থা কায়েম করে দেশে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা আনয়ন করতে আওয়ামী লীগ সরকার সচেষ্ট হন। আর তার জন্য একটা বলিষ্ঠ পদক্ষেপ সরকার গ্রহণ করেন। আর তা হলো কোনো জাতীয় সংসদ সদস্য যদি দলীয় সদস্য পদ ত্যাগ করেন তাহলে তিনি তার সংসদ সদস্য পদও

Dhaka University Institutional Repository

হারাবেন। ১৯৭৩ সালের সাধারণ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ জাতীয় সংসদের সবকটি আসনই লাভ করার জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করে এবং তাতে কৃতকার্য হয়।

চতুর্থতঃ ধর্ম নিরপেক্ষ আদর্শে আওয়ামী লীগের বিশ্বাসের জন্মলগ্ন থেকেই। ১৯৫৫ সালে আওয়ামী মুসলিম লীগ থেকে 'মুসলিম' শব্দটি বাদ দেয়াই প্রমাণ করে, আওয়ামী লীগ ছিল গোড়া থেকেই ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শে বিশ্বাসী। ১৯৫৪ সালের পূর্বেই কিছুসংখ্যক বামপন্থী আওয়ামী লীগে যোগদান করেন এবং ফলে আওয়ামী লীগ অপেক্ষাকৃত অধিক ধর্মনিরপেক্ষ নীতি অনুসরণ করে। স্বাধীনতা যুদ্ধেও ধর্মনিরপেক্ষতার ধারণাই জনগণকে স্বাধীনতায় উদ্বুদ্ধ করেছিল পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে। পরবর্তীতে ১৯৭২ সালের সংবিধানে ধর্মনিরপেক্ষতাকে একটি অন্যতম রাষ্ট্রীয় মৌলনীতি হিসেবে গ্রহণ করা হয়।

এভাবে ভারতীয় মডেলের অনুকরণে আওয়ামী লীগ সরকারের জাতি গঠনের কাজে সচেষ্ট হন। এর সঙ্গে আরেকটি উপাদান সংযোজন করা হয় আর তা হলো শেখ মুজিবের সম্মোহনী শক্তি (Charisma of Sheikh Mujib) স্বাধীনতা লাভের প্রথম কয়েক মাস শেখ মুজিব তাঁর সম্মোহনী শক্তির মাধ্যমেই দেশ শাসন করেন। অতঃপর তিনি রাজনৈতিক কাঠামো গড়ে তুলতে সচেষ্ট হন। এবং পশ্চাতে তাঁর সম্মোহনি শক্তিকে কাজে লাগান। সংবিধান রচিত হয়ে যাবার পরই তিনি ১৯৭৩ সালের মার্চ মাসে জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তারিখ নির্ধারণ করেন। এ নির্বাচন বাংলাদেশের রাজনৈতিক কাঠামোকে সুদৃঢ় ও স্থিতিশীল করেছিল নিঃসন্দেহে।

সর্বোপরি আওয়ামী সরকারের দল গঠনের ওপর অত্যধিক গুরুত্বারোপ প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক কাঠামোকে অধিকতর শক্তিশালী করে তোলে। দলের নেতারা সর্বদাই দলীয় সংগঠনকে সুদৃঢ় রাখতে বদ্ধপরিকর ছিলেন। এমনকি স্বাধীনতা সংগ্রাম চলাকালেও বাংলাদেশ প্রবাসী সরকার দলীয় স্বার্থের প্রতি সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখেন এবং মুক্তি সংগ্রামের ওপর দলের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখতে সচেষ্ট ছিলেন। স্বাধীনতা উত্তরকালেও আওয়ামী লীগ দলীয় সরকার গঠন করেন এবং দল গঠনের কাজকে সর্বাধিক গুরুত্ব দেন। দলকে পুনর্গঠন ও সক্রিয় করার জন্য আওয়ামী লীগ দুটো উপাদানের ওপর জোর দেয়। একটি হচ্ছে দলের যুবফ্রন্টকে শক্তিশালী করা (Strengthening the Youth Front) এবং অপরটি হচ্ছে পৃষ্ঠপোষকতার ব্যবহার (Use of patronage)। শেখ ফজলুল হক মনির নেতৃত্বে ১৯৭২ সালের নভেম্বর আওয়ামী যুব লীগ গঠিত হয় এবং তাতে মুক্তিবাহিনীর সদস্যদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। নবগঠিত জাতীয় সমাজতান্ত্রিক

Dhaka University Institutional Repository

দলের কর্মকাণ্ডকে প্রতিহত করা ছিল এর একটি বিশেষ লক্ষ্য। এছাড়া এ দলের আরো দুটো ফ্রন্ট ছিল- একটি ছাত্রফ্রন্ট (Student front) এবং অপরটি শ্রমিক ফ্রন্ট (Labour front)। এ উভয় ফ্রন্টই আওয়ামী লীগের সমর্থনের ভিত্তিকে বাড়াতে ও সুদৃঢ় করতে আত্মনিয়োগ করে।

পাশাপাশি দলীয় পৃষ্ঠপোষকতা বিতরণের পুরনো পদ্ধতি ও দল গঠনের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ ব্যবহার করা হয়। ক্ষমতাসীন দল হিসেবে আওয়ামী লীগের পৃষ্ঠপোষকতার সুযোগও ছিল যথেষ্ট। দলীয় সমর্থক ও কর্মিদের মধ্যে লাইসেন্স ও পারমিট বিতরণের মাধ্যমে আওয়ামী লীগ শুধুমাত্র তার বুর্জোয়া সমর্থনের ভিত্তিকে সুদৃঢ় রাখেনি বরং তা আরো বহুগুণে প্রশস্ত করে। সেই সঙ্গে "মুজিববাদ" নামে একটি আদর্শকে জনপ্রিয় করে তোলার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। উদ্দেশ্য ছিল শেখ মুজিবুর রহমানের ভাবমূর্তিকে অক্ষুণ্ন ও সুদৃঢ় রাখা।[২২] কিন্তু মুজিবের সকল প্রচেষ্টাই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছিল বলে প্রতীয়মান হয়।

২। সংসদীয় নেতৃত্বের ব্যর্থতা (Failure of Parliamentary System): স্বাধীনতার পর আওয়ামী লীগ রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ও সরকার গঠনের পর জনমনে নতুন আশা ও উদ্দীপনার সঞ্চার হয়। জনগণ মনে করেন, এখন থেকে দেশ দ্রুত পরিপূর্ণ স্বাধীনতা ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে অগ্রসর হবে, সুরক্ষিত হবে জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার। সে সঙ্গে গড়ে উঠবে আওয়ামী লীগ প্রতিশ্রুত সোনার বাংলা এবং পাকিস্তানি ২২ পরিবারের স্থলে শোষণমুক্ত বাংলাদেশে দ্রুত দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফুটে উঠবে।

ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে শেখ মুজিবুর রহমান যুদ্ধবিধ্বস্ত অর্থনীতির পুনর্গঠনে এবং গণতান্ত্রিক বিধি ব্যবস্থা কায়েমে মনোনিবেশ করেন। জাতীয় সংসদ সদস্যগণ দশ মাসের মধ্যে দেশের জন্য একটা গণতান্ত্রিক সংবিধান রচনা করতে সক্ষম হন যা ১৯৭৩ সালের মার্চ মাসে দেশে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ বিজয়ও অর্জন করে। কিন্তু বিজয়কে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সুসংহত করতে আওয়ামী লীগ সক্ষম হয়নি। আপাতঃ স্থিতিশীল রাজনৈতিক অবস্থার আড়ালে যে বাস্তবতা লুকিয়ে ছিল তাকে 'গৃহযুদ্ধ' (Civil war) বললেও অত্যুক্তি হয় না। দুর্নীতি, মুদ্রাস্ফীতি, চোরাচালান, দুর্ভিক্ষ, অরাজতকা প্রভৃতিতে দেশ ছেয়ে গেল। এসব রোধকল্পে আওয়ামী লীগ সরকার যে ব্যবস্থা গ্রহণ করেন তা ছিল প্রয়োজনের তুলনায় নিতান্তই অপ্রতুল। আর এ সুযোগে বিরোধীদলগুলো চাঙ্গা হয়ে উঠে এবং প্রকাশ্যে ও

২২। দ্রষ্টব্যঃ বদরুদ্দিন উমর, যুদ্ধোত্তর বাংলাদেশ।

Dhaka University Institutional Repository

গোপনে সরকার বিরোধী তৎপরতা চালাতে থাকে। ন্যাপ ও ভাসানী, নবগঠিত জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ) যা ছিল বাংলাদেশের কমিউনিস্ট লীগের (BCL) সমর্থক শক্তি, বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি লেনিনবাদী (BCL-L), পূর্ব বাংলা কমিউনিস্ট পার্টি মার্কসবাদী লেনিন বাদী (EBCP-ML), বাংলার কমিউনিস্ট পর্টি (BCP), সর্বহারা পার্টি, পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টি মার্কসবাদী লেনিনবাদী (EPCP-ML) এসব রাজনৈতিক দল সরকার বিরোধী তৎপরতায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। সরকারের বিরোধিতা করতে গিয়ে এসব দল যুক্তির ভাষা ব্যবহারের স্থলে "উৎখাত", 'খতম' প্রভৃতি শব্দকে ব্যাপকভাবে প্রয়োগ করতে থাকে। সে সঙ্গে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বাংলাদেশ "তলাবিহীন ঝুঁড়ি" (Bottomless Basket) বলে বদনাম আর উপহাসের পাত্রে পরিণত হয়। এভাবে দেশে ও বিদেশে আওয়ামী লীগ বিরোধিতা এক চরম পর্যায়ে উপনীত হয়।

১৯৭৩ সালের সাধারণ নির্বাচনে বিজয়ী হয়ে আওয়ামী লীগ কেবল অধিক পরিমাণ রাজনৈতিক শক্তি অর্জন করেনি। এবং দেশে একচেটিয়াভাবে ক্ষমতা ব্যবহার ও প্রয়োগ করতে শুরু করেন। দলীয় কর্মকর্তা ও সমর্থকদের কর্মকাণ্ডেও তা প্রতিভাত হয়ে উঠে। নির্বাচনে যে কারচুপি হয়েছে তার জন্য এতটুকু দুঃখ প্রকাশ না করে দলীয় নেতারা বিপরীত দিকে ধাবিত হতে থাকে এবং পূর্বের চেয়ে অনেক বেশি শক্তিশালী ও দাম্ভিক হয়ে ওঠেন। নির্বাচন শেষে এক মাসেরও কম সময়ের মধ্যে আওয়ামী লীগের শ্রমিকের ফ্রন্ট দেশের শিল্প এলাকাগুলো থেকে ট্রেড ইউনিয়ন নেতারা ও শ্রমিকদের বিতাড়িত করার জন্য এক অভিযান চালায়। তাদের মতে, আওয়ামী লীগ যেহেতু ১৯৭৩ সালের নির্বাচনে অভূতপূর্ব বিজয় অর্জন করেছে এবং যেহেতু আওয়ামী লীগ সরকার শ্রমিকদের কল্যাণার্থে শিল্পসমূহ জাতীয়করণ করেছে এবং যেহেতু সরকার সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি প্রতিষ্ঠা করতে বদ্ধপরিকর কাজেই বাংলাদেশে কোনো প্রকার ট্রেড ইউনিয়নের প্রয়োজন নেই। ৫ এপ্রিল (১৯৭৩) টঙ্গি শিল্প এলাকায় তারা বামপন্থী জাতীয় ট্রেড ইউনিয়ন বাংলা শ্রমিক ফেডারেশনের ওপর তাদের প্রথম আক্রমণ পরিচালনা করেন যার ফলে কয়েকজন শ্রমিক প্রাণ হারায়। ক্ষতিগ্রস্ত শ্রমিকদের প্রতিনিধি দল প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে এ ব্যাপারে সাক্ষাত করে তাদের প্রতিবাদ জানালে তিনি এ ব্যাপারে 'ন্যায় বিচার' করা হবে বলে তাদের আশ্বাস দেন কিন্তু পরবর্তীতে কিছুই করা হয়নি। বরং এর বিপরীতে শ্রমিক লীগের (আওয়ামী লীগের শ্রমিক ফ্রন্ট) এক সভায় প্রস্তাব গৃহীত হয় যে, যেকোনো উপায় বিপথগামী ট্রেড ইউনিয়ন সদস্যদের কবল থেকে মুক্ত হয়ে তারা দলীয় কর্মসূচির প্রতি অবিচল আস্থা

Dhaka University Institutional Repository

জ্ঞাপন করবেন এবং সমাজতন্ত্রের পথ প্রশস্ত করবেন। আওয়ামী লীগ নেতা আব্দুল মান্নানের নেতৃত্বে লাল বাহিনী (Lal Bahini) নামে একটি বাহিনী গঠন করা হয়। উদ্দেশ্য শ্রমিক শ্রেণীর অর্থনৈতিক মুক্তি ও সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় সরকারকে সাহায্য সহযোগিতা করা। কিন্তু বাস্তবে দেখা গেল সম্পূর্ণ বিপরীত অবস্থা। শাসক এলিটদের পৃষ্ঠপোষকতারয় লাল বাহিনীরা সদ্যরা অত্যাধিক শক্তিশালী হয়ে উঠলো এর ফলে শিল্পক্ষেত্রে তাদের অযাচিত হস্তক্ষেপ দেখা দিল। এতে করে উৎপাদন ও মুনাফার ওপর আঘাত আসতে শুরু করলো। বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানে 'স্থানীয়' ও 'অস্থানীয়' এ বিষয়টি প্রাধান্য পাবার ফলে শৃঙ্খলা সম্পূর্ণ বিনষ্ট হতে থাকে। এমনকি এ সুযোগে কতিপয় শিল্প প্রতিষ্ঠান শ্রমিক লীগ নেতাদের হস্তগত হয়ে যায়।

আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির ক্রমাবনতির পাশাপাশি উৎপাদনের নিম্নগতি ও খাদ্য ঘাটতির পরিমাণ বৃদ্ধির ফলে দেশ অর্থনৈতিক মন্দায় (Economic Depression) নিপতিত হলো। জনগণ আশা করেছিল, নির্বাচনের পর পরিস্থিতির উন্নতি হবে কিন্তু তাদের সে আশায় পড়লো বালি। লাল বাহিনী, স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী ও রক্ষিবাহিনীর বাড়াবাড়ি জনমনে ভয় ও হতাশার সৃষ্টি করলো। এমনি পরিস্থিতিতে কতিপয় শুন্য আসনে উপনির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এ নির্বাচনে জনগণের ক্ষুব্ধ মনে বহিঃপ্রকাশ ঘটে। সরকারি দলের দুজন প্রার্থী পরাজিত হন- রাজশাহীর জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের মঈনউদ্দীন আহমেদ এবং সিলেটে একজন স্বতন্ত্র প্রার্থী বিজয়ী হন। সাধারণ নির্বাচন হয়ে যাওয়ার তিন মাসেরও কম সময়ের মধ্যে নির্বাচনের এ ফলাফল নিঃসন্দেহে সরকারের প্রতি জনগণের বিক্ষুব্ধ মনেরই পরিচায়ক। অবশ্য আওয়ামী লীগ সরকার জাতীয় সংসদে তার সুদৃঢ় আসন বজায় থাকায় এ বিষয়টির ওপর তেমন কোনো গুরুত্ব দেননি।

ইতিমধ্যে পূর্বে জারিকৃত রাষ্ট্রপতির আদেশ নং ৫০-ক (President Order 50-A) ১১ এপ্রিল (১৯৭৩) আরো কিছুটা সংশোধন করে এ আইনের অধীনে আরো কতিপয় বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করা হয় এবং সেগুলোর সংক্ষিপ্ত বিচারেরও ব্যবস্থা নেয়া হয়। খুন, রাহাজানি, ছিনতাই, চোরাচালানি, সীমান্ত পাচার, খাদ্যদ্রব্য মজদু প্রভৃতি ছিল এগুলোর মধ্যে অন্যতম। এসব কাজের জন্য ৩ থেকে ১৪ বছর সশ্রম কারাদণ্ডের শাস্তি ঘোষণা করা হয়। এভাবে ক্ষমতাসীন সরকার দুটো পথে অগ্রসর হন- একদিকে সরকার কঠিন আইন প্রণয়ন করেন এবং তা প্রয়োগের জন্য রক্ষীবাহিনীকে নির্দেশ দেন। অপরদিকে সরকার তার রাজনৈতিক সংগঠনকে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনয়ন করার জন্য ব্যবহার করেন। কিন্তু তবুও পরিস্থিতির তেমন কোনো

Dhaka University Institutional Repository

উন্নতি পরিলক্ষিত হয়নি। এমতাবস্থায় সরকার অধিকতর কঠিন বিধি বিধান জারি করতে থাকেন এবং দমন নীতির আশ্রয় গ্রহণ করেন। আর তা করতে গিয়ে সরকার ১৯৭২ সালের সংবিধানের আদর্শকে জলাঞ্জলি দিয়ে সংবিধানের আটকাদেশ (Preventive Detention) এবং জরুরি অবস্থা জারির (Proclamation of Emergency) প্রয়োজনীয় বিধান অন্তর্ভুক্ত করার প্রয়োজন অনুভব করেন। এ মর্মে ১৯৭৩ সালের সেপ্টেম্বরে সংবিধানের দ্বিতীয় সংশোধনী বিল আনয়ন করেন এবং সংবিধানের ৩৩ নং অনুচ্ছেদের পরিবর্তে একটি নতুন আটকাদেশ সংক্রান্ত বিল তাতে জুড়ে দেন। সে সঙ্গে সংবিধানের একটি নতুন অংশ (৯ক) জুড়ে দিয়ে জরুরি বিধি বিধানকে সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করে নেন। এ উভয় বিলই জাতীয় সংসদে অতি সহজেই পাস হয়ে যায়। আতাউর রহমান খান সংবিধানের এ নতুন দুটো ধারা সংযোজনের কঠোর সমালোচনা করে বলেন। "Awami League over the last twenty five years was opposed to this kind of law because they were always used against the political opponents; and the same would be used against the political opponents in Bangladesh also." (দেখুন, Proceedings of the Jatio Sangsad, September 1973).

সংবিধানের সংশোধন বিলের একই অধিবেশনে অপর একটি গুরুত্বপূর্ণ আইন পাস করা হয় আর তা হলো প্রেস এ্যান্ড পাবলিকেশন অর্ডিন্যস, ১৯৭৩ (Press and publication Ordinance, 1973) এ অর্ডিন্যন্স প্রিন্টিং প্রেসের সংখ্যা ও খবরের কাগজের সংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করতে সচেষ্ট হয়। শুধু তাই নয় এ আইন উত্থাপনকালে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সংসদ ঘোষণা করেন, দেশে এক প্রকার দায়িত্বহীন সাংবাদিকতা অব্যাহত রয়েছে। কোনো কোনো সংবাদপত্র দেশের সার্বভৌমত্বকে প্রশ্ন করে সংবাদ পরিবেশন করছে বলে তিনি অভিযোগ করেন এবং তা কিছুতেই সহ্য করা হবে না বলে দ্ব্যর্থহীনকণ্ঠে ঘোষণা করেন। (দেখুন, The Bangladesh Observer, September 20, 1973).

এভাবে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ সরকার নিয়মতান্ত্রিক বিরোধী রাজনীতির বিকাশে তেমন কোনো সহায়ক ভূমিকা গ্রহণ করলেন না কিংবা বিরোধী শক্তিগুলোর সঙ্গে আলোচনা ও সমঝোতার মধ্যে উদ্ভূত পরিস্থিতির মোকাবেলা করতে অগ্রসর হননি। বরং জেল, জুলুম, অত্যাচার ও নিপীড়নের পথ বেছে নিলেন সরকার। শুরু হলো জনগণের অধিকার হরণের পালা। ১৯৭৪ সালের ফ্রেব্রুয়ারি মাসে জাতীয় সংসদ বিশেষ ক্ষমতা আইন (Special

Dhaka University Institutional Repository

Powers Act) পাস করে। অতঃপর ১৯৭৪ সালের ২২ ডিসেম্বর সরকার দেশে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করেন। ১৯৭৫ সালের ৩ জানুয়ারি জরুরি ক্ষমতাবিধি জারি করে সরকারের হাতে পর্যাপ্ত ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করা হয়। একই সালের ২৫ জানুয়ারি জাতীয় সংসদের এক বিতর্কহীন অধিবেশনে সংবিধানের ওপর চতুর্থ সংশোধনী (Fourth Amendement) আনয়ন করা হয়। এর ফলে সরকারের চরিত্রে সুচিত হয়-এক মৌলিক পরিবর্তন এক পদ্ধতিগত পরিবর্তন (Systemic change)-সংসদীয় সরকার ব্যবস্থার পরিবর্তে কায়েম করা হয় রাষ্ট্রপতি শাসিত শাসন ব্যবস্থা। সে সঙ্গে বহুদলীয় ব্যবস্থার পরিবর্তে প্রবর্তন করা হয় একদলীয় ব্যবস্থা। পাশাপাশি বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতা হরণ করা হয়; টুটি চেপে হত্যা করা হয় গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা ও মূলবোধকে। সঙ্গত কারণেই ১৯৭২ সালের সংবিধানের অধীনে প্রবর্তিত সংসদীয় শাসন ব্যবস্থা সুষ্ঠুভাবে কাজ করে যেতে সক্ষম হয়নি। স্বভাবতই এ ব্যবস্থা ব্যর্থ হয়েছে বলা চলে।[২৩]

৩. ছাত্ররাজনীতির নামে যুবকদের ধ্বংসসাধন ঃ জেনারেল জিয়া বেসামরিকীকরণ প্রক্রিয়ায় বিএনপির নামে রাজনৈতিক দল গঠন করেন। এরই ছাত্রফ্রন্ট হিসেবে "জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল" গঠন করেন। এর শক্তি বৃদ্ধির জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ সারাদেশের বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজসমূহে ছাত্র সংগঠন জোরদার করার চেষ্টা করেন। এরই অংশ হিসেবে কিছুসংখ্যক ছাত্রদের অর্থ, অস্ত্রসহ নানাবিধ অবৈধ সুযোগ সুবিধা প্রদানের ঘটনা ঘটেছে। ছাত্রদেরকে "হিজবুল বাহার" নামক প্রমোদতরিতে সিঙ্গাপুর ভ্রমণ ও বৈদেশিক পণ্য আমদানি বাণিজ্যের মাধ্যমে লাভবান হওয়ার সুযোগ করে দিয়ে ছাত্র রাজনীতি জোরদার করার প্রক্রিয়া হাতে নয়। ক্ষমতা পাকাপোক্ত করার এ প্রক্রিয়া ছাত্রদের আদর্শ, উদ্দেশ্য, নৈতিকতার অধঃপতনের যে বীজ বপন হয়েছিল, চরদখল প্রক্রিয়ার মতো হল দখলের যে রীতি চালু হয়েছিল, ছাত্র রাজনীতির মাঝে অস্ত্র রাজনীতির যে ধারা সূচিত হয়েছিল তার মারাত্মক কুফল আজো আমাদের রাজনীতিতে ভয়াবহ পরিস্থিতি সৃষ্টি করে রেখেছে। শিক্ষার পরিবেশ আজ মারাত্মকভাবে বিঘ্নিত। হত্যা, সন্ত্রাস, খুন, যখম ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নিত্যদিনের ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। মূল দলের রাজনৈতিক লেজুড়বৃত্তি করার ফলে, সন্ত্রাস, চাঁদাবাজি ও টেন্ডারবাজিতে ব্যতিব্যস্ত ছাত্র নেতারা তাদের মূল পরিচয় ভুলেই গিয়েছে। তারা রাজনৈতিক দলের লাঠিয়াল বাহিনীতে পরিণত হয়েছে। দলীয় ছাত্র-নেতারা লেখাপড়া তো করেনই না বরং সাধারণ

২৩। প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষাজীবনকে চরম আতঙ্ক, সংশয় ও অনিশ্চয়তার মধ্যে ঠেলে দিয়েছে। দেশের সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার মান, পরিবেশ, আজ তথা কতিথ ছাত্ররাজনীতির কবলে পড়ে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে। ছাত্র শিক্ষকের সম্পর্কও নিঃশেষ হতে বসেছে। আজ শিক্ষক নয় ছাত্রই মাঝে মাঝে শিক্ষককে চোখরাঙানি দেয়, শিক্ষকের করণীয় নির্ধারণ করে দেয়। উপদেশ দিয়ে বেড়ায়। এমনকি তথাকথিত ছাত্র রাজনীতির ও ছাত্র নেতাদের খপ্পড়ে পড়ে অনেক মহান শিক্ষকদেরকে প্রাণ পর্যন্ত দিতে হয়েছে। শিক্ষাক্ষেত্রে এ ভয়াবহ অবস্থার কারণে জাতির মাঝে শ্রেষ্ঠ সন্তানদের আবির্ভাব হচ্ছে না। সামর্থবান ও মেধাবীরা দেশান্তরিতও হচ্ছে। জাতির অস্তিত্ব বিনাশী এ খেলা অতি দ্রুত বন্ধ করা দরকার। এ এক মহাসংকট, এ এক মারাত্মক ক্রান্তিকাল।

৪. গণতান্ত্রিক পদ্ধতি ও প্রতিষ্ঠান ধ্বংসাধন (Destruction of Democratic Institution and System): গণতন্ত্রের প্রতি বরাবরই এদেশের মানুষ ছিল অনুরাগী। তারা গণতন্ত্র রক্ষার জন্য বার বার বুকের রক্ত দিয়েছে। কিন্তু এরশাদ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা ধ্বংস করেই দেশের শাসন ক্ষমতা দখল করেন। ক্ষমতা দখল করেই তিনি বলেছিলেন, দেশে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা চালু করবেন। কিন্তু তার প্রতিশ্রুতির সাথে কাজের কোনো মিল ছিল না। মূলত: তার শাসনব্যবস্থা ছিল অগণতান্ত্রিক ও স্বৈরাচারমূলক। তার শাসনামলে যে কয়টি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছিল তা ছিল মূলত ঃ প্রহসনমূলক। জাতীয় সংসদ, মন্ত্রিপরিষদ, বিচার বিভাগ সব কিছুই ছিল তার নিয়ন্ত্রণে এবং তিনি সকল ক্ষেত্রে হস্তপ্রসারিত করে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে ধ্বংস করেন। ফলে দেশের সর্বস্তরের জনগণ এরশাদ সরকারের ওপর হতে আস্থা হারিয়ে ফেলে। এছাড়া রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখলের পর থেকেই সামরিক শাসক এরশাদ দেশের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমুহের ধ্বংস সাধনে তৎপর হয়। রাজনৈতিক দলগুলোকে বিভিন্ন রকম প্রলোভন দেখিয়ে তাদের মধ্যে ভাঙ্গনের সৃষ্টি করেন। ফলে বেশ কয়েকটি দল ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে যায়; আর এ সুযোগে সরকার তাদের ওপর পুরোমাত্রায় নিয়ন্ত্রণ আরোপ করার সুযোগ পান। অনেক সময় বৃহৎ দলগুলোর নেতারা ও কর্মিদের ওপর নির্যাতন চালানো হয়। তাঁদের ওপর হুলিয়া ও গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করা ছিল নিত্যনিমিত্তিক ব্যাপার। এরশাদ সরকারের দীর্ঘ নয় বছরের শাসনকালে দেশে অবাধ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়নি। ফলে রাজনৈতিক

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিষ্ঠানসমূহ সুসংহত ও সুদৃঢ় হওয়াতো দূরের কথা, এগুলো বরং ধ্বংসের দিকে ধাবিত হয়।[২৪]

৫. বিচার বিভাগের ওপর হস্তক্ষেপ ও চাপ সৃষ্টি : শেখ হাসিনার আমলে মন্ত্রীর নেতৃত্বে বিচারপতিদের বিরুদ্ধে রাজপথে লাঠিমিছিল, তাদের আত্মীয়স্বজনের বাড়িতে হামলা, জাতীয় সংসদে ও সাংবাদিক সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী ও অন্য মন্ত্রী কর্তৃক বিচারপতিদের উদ্দেশে অশালীন ভাষায় কটুক্তি এবং সুপ্রিমকোর্ট প্রাঙ্গণে রাতের অন্ধকারে বস্তি বসিয়ে আওয়ামী লীগ এক ন্যক্কারজনক অধ্যায় রচনা করে। সুপ্রিমকোর্ট শেখ হাসিনাকে বিচারকদের সম্পর্কে অশালীন মন্তব্যের জন্য দুবার কঠোরভাবে সতর্ক করে দেয়।

৬. কুক্ষিগত রেডিও-টিভি : আওয়ামী লীগ আমলে সরকারি রেডিও-টিভি শতকরা ১০০ ভাগ দলীয় প্রচার মাধ্যমে পরিণত হয়। বিটিভিতে শেখ হাসিনা, শেখ মুজিব ও আওয়ামী নেতাকর্মিদের প্রচার এত অধিক হারে ও নগ্নভাবে হয় যে, জনগণ বিভিটিরর নতুন নামকরণ করে 'বাপ বেটির টিভি', আটটার সংবাদের নাম দেয় 'ঠাট্টার সংবাদ'। পদিচ্যুতি হওয়ার পূর্ব মুহূর্তে আওয়ামী সরকার রেডিও টিভির স্বায়ত্তশাসনের নামে যে আইন পাস করেছে তাকে রেডিও-টিভির স্বায়ত্তশাসন না বলে বলা যায় 'অস্বায়ত্তশাসন'। অথচ আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ওয়াদা ছিল রেডিও-টিভির পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন প্রদান।[২৫]

ঙ. মনস্তাত্ত্বিক ও সাংস্কৃতিক সংকট

১. রাজনৈতিক সংস্কৃতি গড়ে তুলতে ব্যর্থতা : সাধারণত রাজনৈতিক ব্যবস্থায় রাষ্ট্রের শাসকবৃন্দ, নেতারা ও নাগরিকদের রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ ও আচার আচরণের সমষ্টিই রাজনৈতিক সংস্কৃতি বলে পরিচিত। এদিক থেকে বিচার করলে রাজনৈতিক সংস্কৃতির ক্ষেত্র বেশ ব্যাপক। আবার লুসিয়ান ডব্লিউ পাই (Lucian W. Pye) বলেন, "রাজনৈতিক কৃষ্টি হচ্ছে ধ্যান-ধারণা, বিশ্বাস ও অনুভূতির এমন এক সমষ্টি যা রাজনৈতিক কার্যাবলীকে অর্থপূর্ণ করে তোলে এবং এদের মধ্যে এক প্রকার শৃঙ্খলভাবের অভিব্যক্তি ঘটায়। রাজনৈতিক কৃষ্টিকেই

২৪। এই ২০১০ সালে এসেও বাংলাদেশের রাজনৈতিক নেতৃত্ব ব্যর্থ হয়েছেন রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান নির্মাণ ও এর গণতন্ত্রায়নে প্রকৃত অবদান রাখতে।

২৫। ২০১০ সালে পৌঁছেও বর্তমান মহাজোট সরকারের আমলে রেডিও-টিভি স্বায়ত্বশাসন পাইনি এবং চূড়ান্তভাবে দলীয়করণ অবস্থায় রয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

এদের অন্তর্নিহিত ও মনস্তাত্ত্বিক দিকে সার্বিক প্রকাশ ঘটে।[২৬] আবার হেগেল তার "The Philosophy of Right" (1821) গ্রন্থে রাষ্ট্রকে এমন একটি নৈয়ায়িক (Ethical) প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিবেচনা করেছেন যা সমাজের সামগ্রিক আকাঙ্ক্ষা ও অভিপ্সার প্রতীক। তিনি তার রাষ্ট্র সংক্রান্ত এমন ধারণাকে আরো বিস্তৃত করে বলেছেন, আসলে রাষ্ট্র হলো মতে বিধাতার বিচরণ (March of God on Earth)। কিন্তু আমরা দেখি জেনারেল জিয়াউর রহমানের আমলে বাংলাদেশের রাজনীতিতে দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি, স্বাধীনতা বিরোধীদের পুনরুত্থান বন্দুকের নলের সমর্থন জানায়, শাসনের স্থলে অপশাসন রাজনৈতিক দলে কেনাবেচা, গুপ্ত হত্যা, জনজীবনকে আতঙ্কিত করে তোলে। রাষ্ট্র হয়ে উঠেছে জনবৈরী এক ভয়াবহ প্রতিষ্ঠান। ১৯৭১ এর স্বপ্নের রাষ্ট্র হয়ে গেল উধাও, মানুষগুলো হচ্ছিল নানাভাবে বিপন্ন।

২. একনায়কসুলভ আচরণ ও প্রহসনের নির্বাচন : একটি গভীর সংকট ও ষড়যন্ত্রের মধ্য দিয়ে ক্ষমতায় আসীন হয়ে জেনারেল জিয়া চরম ও পরম একনায়কের পরিণত হয়। সকল ক্ষেত্রে তার একনায়কসুলভ আচরণ সংহার মূর্তি ধারণ করলো। ক্ষমতাকে চিরস্থায়ী আমলে ১৯৭৭ সালের ১৩ জানুয়ারি প্রহসনের ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন অনুষ্ঠান করা হয়। এ নির্বাচন অনেক পুরাতন স্থানীয় রাজনীতিবিদ জয়ী হয় অথবা তারা মুজিবআমলে জনগণ কর্তৃক পরিত্যক্ত হয়েছিলেন। পাকবাহিনীর সঙ্গে সহযোগিতা করেন। এদের মধ্যে শতরা ২৩ ভাগ নির্বাচিত গ্রামীণ নেতারা মুসলিম লীগ ও অন্যান্য ডানপন্থী দলের সমর্থক ছিলেন।[২৭] মূলত এ নির্বাচন ছিল কারচুপির নির্বাচন, প্রভাব খাটানোর নির্বাচন। ক্ষমতাসীনদের একচেটিয়া প্রভাবে কলুষিত নির্বাচন। এ নির্বাচনে জনরায়ের প্রতিফলন না ঘটাই ছিল স্বাভাবিক। নির্বাচনের ফলাফলে ডানপন্থীকে প্রভাব প্রতিভা বৃদ্ধির বিষয়টি স্পষ্টতর হয়ে ওঠে।

৩. প্রহসনের গণভোট ও রাষ্ট্রপতি নির্বাচন : রাষ্ট্রক্ষমতা কুক্ষিগত করে জেনারেল জিয়া ১৯৭৭ সালের ৩০ মে প্রহসনের গণভোট আয়োজন করেন। তাতে জনমতের প্রতিফলন ঘটার প্রয়োজন ও উপায় কোনোটাই ছিল না। পুরোদেশ সেনা সদস্যদের দখলে। প্রশ্রয়ে, আশ্রয়ে ও প্রণোদনায় গড়ে ওঠা যুদ্ধাপরাধী, রাজাকার, আলবদর, আল শামসের সদস্য ও নবোউত্থিত সুবিধাদি গোষ্ঠীর তৎপরতায় গড়ে উঠা সমর্থক শ্রেণী, সর্বোপরি ধর্মের দোহাই দিয়ে সাধারণ

২৬। Rashiduzzaman M, "Bangladesh in 1977; Dilemas of the Military Rules", Asian Survey, February 1978, Vol.-Xviii, No-2

২৭। দৈনিক বাংলা, ৯ মে, ১৯৭৮।

Dhaka University Institutional Repository

মানুষকে প্রভাবিত করে এবং রাষ্ট্রযন্ত্রকে প্রভাবিত করে যে নির্বাচন করা হলো তা কোনো অর্থে গণতান্ত্রিক নির্বাচন হলে গণ্য হতেই পারে না। তবুও নির্বাচনে প্রধান সামরিক আইনে প্রশাসকের বিরাট সাফল্য দেখানো হলো। তিনি শতকরা ৯৯% ভাগ ভোট লাভ করেছেন বলে প্রচার প্রক্রিয়া। এরপর ১৯৭৮ সালের ৩ জুন অনুষ্ঠিত হলো রাষ্ট্রপতি নির্বাচন। কোনো কোনো রাজনৈতিক দল আবার সামরিক আইনের অধীনে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন অনুষ্ঠান করাকে প্রহসন বলে চিহ্নিত করেছেন। মূলত সামরিক শাসনের ভয় ভীতির মধ্যে এ ধরনের নির্বাচনে প্রকৃতপক্ষে কোনো ব্যক্তিকে কোনো পদে সমাসীন করার নীল নকশা বাস্তবায়ন ভিন্ন অন্য কিছুই নয়। সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যে ঘোষিত এ নির্বাচন ছিল সামরিক শাসনকে বৈধ করার কৌশরমাত্র। এ নির্বাচনে জাতীয়তাবাদী ফ্রন্টের প্রার্থী ছিলেন মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান (প্রতীক ধানের শীষ)। অপরদিকে গণতান্ত্রিক ঐক্যজোট, জাতীয় জনতা পার্টি প্রধান ও মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক জেনারেল (অব.) এমএজি ওসমানীকে তাদের প্রার্থী হিসেবে মনোনীত করেন। (প্রতীক নৌকা)। সর্বমোট দশজন প্রার্থী এ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেন। উক্ত নির্বাচনে চূড়ান্ত ফলাফল অনুযায়ী মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান ১ কোটি ৫৭ লক্ষ ৩৩ হাজার ৬ শত ৭টি ভোট পেয়ে নির্বাচিত হয়েছিলেন। তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন জেনারেল (অব.) এমএজি ওসমানী।

চ. নেতৃত্বের ঐতিহ্যের সংকট

১. ঐতিহাসিক কারণ (Historical Causes): পাকিস্তানি শাসনামলে রাষ্ট্রীয় কাঠামোতে সামরিক বাহিনী অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। রাষ্ট্রগঠন ও জাতিগঠনমূলক কাজে সামরিক বাহিনী এক অগ্রণী ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিল। সুদীর্ঘ ২৩ বছর ধরে তাঁরা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা কুক্ষিগত করে রেখেছিল। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা হয়েছিল পদদলিত। রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানাদির সুষ্ঠু কার্যক্রম হয়েছিল দারুণভাবে ব্যাহত। বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর উত্তরাধিকার সূত্রে পাকিস্তান আমলের সে সামরিক বাহিনীকেই লাভ করে যারা পূর্ব থেকেই রাজনৈতিক ক্ষমতা সম্পর্কে সচেতন ছিল। আর এ পূর্ব সচেতনতার ফলেই স্বাধীন বাংলাদেশেও সামরিক বাহিনী রাজনৈতিক ক্ষমতার স্বাদ লাভে সচেষ্ট হয়।

২. সামরিক বাহিনীর মধ্যকার দ্বন্দ্ব (Conflict within Armed Forces) : ১৯৭১ সালের স্বাধীনতার সংগ্রামের পর সামরিক বাহিনী যেন দুটো পৃথক গ্রুপে বিভক্ত হয়ে পড়ে।

Dhaka University Institutional Repository

একদিকে ছিল স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশ গ্রহণকারী সেনাবাহিনীর সদস্যবৃন্দ এবং অপরদিকে ছিল পাকিস্তান প্রত্যাগত সামরিক সদস্যবৃন্দ। তারা মুক্তিযোদ্ধা ও অমুক্তিযোদ্ধা এ দুই অংশে বিভক্ত ছিল। এ কারণে পাকিস্তান প্রত্যাগত সেনাবাহিনীর সদস্যগণ সরকারের প্রতি ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন।

৩. সামরিক বাহিনীর প্রতি রাজনৈতিক এলিটদের অনীহা (Disinterestedness of the Political Elites towards the Armed Forces) : স্বাধীনতা লাভের অব্যবহিত পর থেকেই বাংলাদেশের সামরিক বাহিনীর বিশৃঙ্খলা বৃদ্ধি পেতে থাকে ক্রমবর্ধমানভাবে। স্বাধীনতা যুদ্ধ চলাকালে দেশের সামরিক প্রশিক্ষণের প্রতিষ্ঠানসমূহ ধ্বংস হয়ে যায়; অনেক সেনানিবাস হয়ে পড়ে সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত। আর এ কারণে সামরিক বাহিনীর পুনর্গঠন অত্যাবশ্যক হয়ে পড়ে। কিন্তু ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ এলিটগণ এসব সামরিক প্রতিষ্ঠান সমূহ পুনর্গঠনের তেমন কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি। তাছাড়া সামরিক খাতে ব্যয়ও ক্রমশ: হ্রাস করা হয়। ১৯৭৩-৭৪ সালে যেখানে সামরিক ব্যয় ছিল ১৬% সেখানে ১৯৭৪-৭৫ সালে তা নেমে দাঁড়ায় ১৫% এবং ১৯৭৫-৭৬ সালে তা ১৩% এর নিচে নেমে গিয়েছিল। এ কারণে সেনাবাহিনীর একটা বৃহৎ অংশ বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে।

৪. রক্ষিবাহিনীর ওপর ক্ষমতাসীন সরকারের অত্যাধিক নির্ভরতা (Too Much dependence on Rakkhi Bahini): আওয়ামী লীগ সরকারের সেনাবাহিনীর পাশাপাশি রক্ষীবাহিনী নামে অপর একটি স্বতন্ত্র বাহিনী গঠন করেন। সরকার এ বাহিনীকে সেনাবাহিনীর সমান্তরাল করে গড়ে তুলতে সচেষ্ট হন। রক্ষীবাহিনীকে বিশেষ সুযোগ-সুবিধে প্রদান করা হয়। আওয়ামী লীগ সরকারের নির্দেশেই রক্ষী বাহিনীর হাতে অত্যধিক ক্ষমতা আরোপ করা হয়। ফলে সেনাবাহিনীর মনোবল ভেঙ্গে পড়ে।

৫. সুষ্ঠু, রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের অভাব (lack of well-organized Political Organization): বাংলাদেশে সুষ্ঠু রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের নিদারুন অভাব পরিদৃষ্ট হয়। ব্রিটিশ আমল থেকে এ অঞ্চলে কোনো সুষ্ঠু রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেনি। অনেকটা ইচ্ছে করেই উপনিবেশিক সরকার এখনো সুষ্ঠু রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠার পরিবেশ সৃষ্টি করেনি। পাকিস্তান আমলেও ঠিক অনুরূপ অবস্থা বিরাজমান ছিল। তখন পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী সামরিক ও বেসামরিক আমলাতন্ত্রকে শক্তিশালী করে তুলে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের হাতকে দুর্বল করার চক্রান্তে সদা নিয়োজিত ছিল। রাষ্ট্রের প্রকৃত ক্ষমতা

Dhaka University Institutional Repository

সামরিক বাহিনীর হাতেই নিয়োজিত ছিল। বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পরও আওয়ামী লীগের শাসনামলে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠার সুষ্ঠু পরিবেশ সৃষ্টি হয়নি। আওয়ামী লীগ বিরোধী রাজনৈতিক তৎপরতাকে প্রথম থেকেই কঠোর হস্তে দমনে সচেষ্ট হয়। বিশেষ করে সদ্য প্রতিষ্ঠিত জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের ওপর ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ সরকারের দমনমূলক তৎপরতা এর সাক্ষ্য বহন করে। এছাড়া অন্যান্য মস্কোপন্থী ও পিকিং পন্থী দলগুলোর প্রতিও আওয়ামী লীগ অনুরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করে।

৬. যোগ্য নেতৃত্বের অভাব (Lack of Proper Leadership) : যোগ্য নেতৃত্বের অভাবে উন্নয়নশীল দেশগুলোতে সামরিক অভ্যুত্থান ঘটে। বাংলাদেশও এর ব্যতিক্রম নয়। স্বাধীনতা আন্দোলনে আওয়ামী লীগ ও এর অবিসংবাদিত নেতা শেখ মুজিবুর রহমান যেভাবে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন স্বাধীনতার পর সে নেতৃত্বে ভাটাপড়ে। নতুন দেশের ক্রমবর্ধমান সমস্যাদি সমাধানে শেখ মুজিবের নেতৃত্বে ক্রমশ : দুর্বলতার পরিচয় দেয়। গোড়াতেই শেখ মুজিব যে সম্মোহনি শক্তির অধিকারী ছিলেন তা ক্রমে নিঃশেষ হয়ে আসে।

৭. ব্যাপক দুর্নীতি ও অর্থনৈতিক অবনতি (Widespresd Corruption and Economic Depression): ১৯৭৪-৭৫ সালে বাংলাদেশে ব্যাপক দুর্নীতি ও অর্থনৈতিক অবনতি দেখা দেয়। স্বাধীনতার পর জাতীয়করণকৃত ৮৬% ভাগ শিল্পকারখানায় অদক্ষ দলীয় সদস্য এবং পৃষ্ঠপোষকদের নিয়োগের ফলে উৎপাদন যেমন হ্রাস পায়, তেমনি চরমভাবে দুর্নীতিও বেড়ে যায়। দলীয় সদস্যদের লাইসেন্স, পারমিট ও অন্যান্য আর্থিক সুবিধা দেযার ফলে দেশের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড ব্যাহত হয়, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পায় বহুগুণে। উপরন্তু ভারতের সঙ্গে সীমান্ত চুক্তির ফলে ব্যাপক দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পায়। পরিস্থিতির আরো অবনতি ঘটে এবং এর বিরুপ প্রভাব গিয়ে পড়ে দেশের অর্থনীতির ওপর। অর্থনীতির প্রায় ভেঙ্গে পড়ে। দেশে দেখা দেয় বন্যা ও দুর্ভিক্ষ। সে সঙ্গে আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির দারুণ অবনতি ঘটে। গুপ্ত রাজনৈতিক দলগুলোর সরকার বিরোধী তৎপরতা পরিস্থিতিকে অধিক পরিমাণে গুরুতর করে তোলে।

৮. ক্ষমতাসীন দলের অভ্যন্তরীণ কোন্দল (Internal Conflict Within the Ruling Party): ১৯৭৫ সালে বাংলাদেশে সামরিক শাসনের অপর একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ আওয়ামী লীগ নেতৃত্ব ও দলের অভ্যন্তরীণ কোন্দল ও দ্বন্দ্ব। তাজউদ্দীন আহমদ বনাম নজরুল ইসলাম, তোফায়েল আহমদ বনাম শেখ ফজলুল হক মনির দ্বন্দ্ব ও কোন্দল আওয়ামী লীগের দলীয়

Dhaka University Institutional Repository

সংহতিকে বহুলাংশে ব্যাহত করে। দলের অভ্যন্তরীণ উপদলীয় কোন্দলের ফলে একে সুষ্ঠু ও সুসংহত প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তির ওপর স্থাপন করা সম্ভবপর হয়নি। সঙ্গতকারণে দলীয় নেতৃত্বের পক্ষে ক্ষমতার অপব্যবহার, দুর্নীতি, আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয়নি। এ কারণেই শেখ মুজিব দলের ওপর নির্ভরশীলতা কমাতে চেয়েছিলেন এবং স্বহস্তে ক্ষমতা কুক্ষিগত করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন।

৯. সরকার ব্যবস্থার পরিবর্তন ও একদলীয় ব্যবস্থার প্রবর্তন (Change of Governmental System and Introduction of One Party System): দেশে বিদ্যমান হতাশা, অরাজকতা, দুর্নীতি ও আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি রোধকল্পে সেনাবাহিনী নিয়োগ করা হলেও দুর্নীতির দায়ে বহু আওয়ামী লীগ নেতা ও কর্মি অভিযুক্ত হওয়া সত্ত্বেও তাদের বিরুদ্ধে কোনোরূপ ব্যবস্থা নেয়া সম্ভবপর হয়নি। বরং বিভিন্ন অজুহাতে ৭ জন সামরিক অফিসারকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করা হয়। ইতিমধ্যে সংসদীয় ব্যবস্থার পরিবর্তে রাষ্ট্রপতি শাসিত ব্যবস্থা এবং একদলীয় ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়। ফলে সকল ক্ষমতা রাষ্ট্রপতি ও একটিমাত্র দলের হাতে কুক্ষিগত হয়ে পড়ে। এসব সেনাবাহিনীর মধ্যে হতাশার সৃষ্টি করে। আর এর ফলই হলো ১৫ আগস্টের ১৯৭৫ সামরিক অভ্যুত্থান।[২৮]

১০. অবৈধভাবে ক্ষমতা দখল (Usurpation of power): লেফটেন্যান্ট জেনারেল হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ ১৯৮২ সালের ২৪ মার্চ অস্ত্রেরমুখে ক্ষমতাসীন গণতান্ত্রিক সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করে দেশের শাসনভার স্বহস্তে গ্রহণ করেন। সেই সাথে তিনি সারাদেশে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করে সাত্তার সরকারের মন্ত্রিপরিষদ ভেঙ্গে দেন এবং জাতীয় সংসদ বাতিল করে দেন। বাংলাদেশে দ্বিতীয় বারের মতো সামরিক শাসনের করতলগত হয়। এরশাদ নিজেকে প্রধান সামরিক আইন প্রশাসকের পদে অধিষ্ঠিত করেন। সামরিক শাসন জারির যে সকল কারণ তিনি উল্লেখ করেন সেগুলোর একটিও দেশবাসীর কাছে গ্রহণযোগ্য হয়নি। বস্তুত, অস্ত্রের ভয় দেখিয়েই লে. জে. এরশাদ স্বীয় ক্ষমতা লিপ্সা চরিতার্থ করার উদ্দেশে অবৈধভাবে ক্ষমতা দখলে উদ্যোগী হন। নির্বাচিত সাত্তার সরকারকে বন্দুকের নলের মুখে পদত্যাগে বাধ্য করে জেনারেল এরশাদ গণতন্ত্র ও সংবিধানের পবিত্রতা নষ্ট করেন।[২৯]

২৮। দ্রষ্টব্য: আহমদ, বদরুদ্দিন উমর, তালুকদার মনিরুজ্জামান, জিল্লুর রহমান খান, আবুল কাশেম হক, হাসানুজ্জামান চৌধুরী।
২৯। প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

১১. বৈদেশিক ঋণের ওপর অত্যাধিক নির্ভরতা (Excessive dependence on Foreign Aid): দীর্ঘ নয় বছরের শাসনকালে প্রতি বছরই বার্ষিক বাজেটে বৈদেশিক ঋণের ওপর নির্ভরশীলতা বৃদ্ধি পেতে থাকে। কয়েক বছরের মধ্যেই দৈনিক সাহায্যের ওপর সরকারের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। এক হিসেবে দেখা যায়, এ বৈদেশিক সাহায্যের সিংহভাগ সামরিক ও বেসামরিক আমলা, একশ্রেণীর রাজনীতিবিদ, অসাধু ব্যবসায়ী আর শিল্পপতিদের জন্য ব্যয়িত হয়। ১৯৯০-৯১ সালে সরকারের রাজস্ব ব্যয় দেখানো হয় ৭৩০০ কোটি টাকা। সামরিক, আধা-সামরিক এবং সাধারণ প্রশাসন ক্ষেত্রে এ অর্থ অধিক মাত্রায় ব্যয় করা হয়। বিশ্ব ব্যাংকসহ অন্যান্য দাতা দেশগুলো বাংলাদেশের মতো একটি দেশে এ ধরনের ব্যয় বৃদ্ধিতে উৎকণ্ঠা প্রকাশ করে।

১২. আইন শৃঙ্খলার চরম অবনতি (Too Much Deterioration in Law and Order): এরশাদের শাসনকালে দেশের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির চরম অবনতি ঘটে। চুরি, ডাকাতি, খুন, রাহাজানি, ছিনতাই প্রভৃতি অসামাজিক ক্রিয়াকলাপ প্রকট আকার ধারণ করে। সমগ্র দেশব্যাপী শহরে-বন্দরে, ব্যবসা কেন্দ্রে চাঁদাবাজদের দৌরাত্ম্যে ব্যবসা বাণিজ্য বন্ধ হবার উপক্রম হয়।[৩০]

১৩. ধর্মকে রাজনীতির হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার (Religion used as an instrument of Politics): রাষ্ট্রপতি এরশাদ ধর্মকে রাজনীতির হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করেন। বাংলাদেশ সংবিধানের ৮ম সংশোধনীর মাধ্যমে ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে আখ্যায়িত করে তিনি দেশের অপরাপর ধর্মীয় সম্প্রদায়কে কোণঠাসা করে তোলেন। ইসলাম যদিও সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠীর ধর্ম তথাপি সংখ্যালঘু সম্প্রদায় একে তাঁদের ধর্মীয় স্বাধীনতার ওপর চরম আঘাত বলে মনে করেন। এর ফলে দেশে সাম্প্রদায়িকতার মনোভাব চাঙ্গা হয়ে উঠে।

১৪. সামাজিক ভারসাম্যহীনতা (Social Imbalance): এরশাদ সরকারের আমলে সমাজে এক ধরনের ভারসাম্যহীন অবস্থার সৃষ্টি হয়। কালোটাকার অঢেল সম্পদের মালিক ও সাধারণ মানুষের মধ্যে সৃষ্টি হয় এক বিরাট ব্যবধান ও বৈষম্য।

১৫. শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস (Violence in Educational Institutions): এরশাদ শাসনামলের একটি বিশেষ দুর্বলতা ছিল যে, তাঁর দল গ্রামীণ পর্যায়ে তেমন কোনো শক্ত ভিত

৩০। প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

গড়ে তুলতে সক্ষম হয়নি। ছাত্র মহলে এরশাদ যে সংগঠনটি বহু চেষ্টার পর গড়ে তুলেছিলেন, যার নামকরণ করা হয়েছিল নতুন বাংলা ছাত্রসমাজ, সেটিও সুদৃঢ় হতে পারেনি। অন্যান্য ছাত্র সংগঠনের দুর্বার আন্দোলনের মুখে নতুন বাংলা ছাত্র সমাজের মাঝে অর্থ ও অন্যান্য ধরনের প্রলোভন প্রদর্শন করেন। কিন্তু এতে কোনো কাজ হয়নি।

বলা বাহুল্য, এরশাদ শাসনামলেই দেশের শিক্ষাঙ্গনগুলোতে সর্বাধিক অস্থিরতা ও অস্ত্রবাজির ঘটনা ঘটে। দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন সময়ে হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়। এতে করে শিক্ষার পরিবেশ দারুণভাবে ব্যাহত হয়। প্রায় সময়ই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে অনির্ধারিত ছুটি প্রদান করা হত সরকারি নির্দেশে। ১৯৯০ সালে বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ জারির মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের স্বায়ত্তশাসনের ওপর চরম আঘাত হানা হয়।[৩১]

১৬. প্রহসনমূলক নির্বাচন (Mock Election): এরশাদ আমলে যতগুলো নির্বাচন হয়েছিল তার সবগুলোই ছিল প্রহসনমূলক নির্বাচন। স্বীয় শাসন আমলে বৈধকরণের লক্ষ্যে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন নির্বাচনের আশ্রয় গ্রহণ করেন রাষ্ট্রপতি এরশাদ। আর এ সকল নির্বাচন অনুষ্ঠিত করতে গিয়ে তিনি গণতান্ত্রিক মূল্যবোধকে উপেক্ষা করেন। ভোট কারচুপি হতে শুরু করে নিজস্ব দল জাতীয় পার্টি চর দখলের ন্যায় ভোট কেন্দ্রগুলোকে দখল করে নির্বাচনী ফলাফল তাদের অনুকূলে আনয়ন করে। এর ফলে নির্বাচনের প্রতি জনগণ বীতশ্রদ্ধ হয়ে উঠে। নির্বাচন এর গ্রহণযোগ্যতা হারায়।

১৭. জাতীয় প্রচার মাধ্যমগুলোর দলীয়করণ (Party Control over the National Media): যেকোনো গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় জাতীয় প্রচার মাধ্যমসমূহের নিরপেক্ষ ভূমিকা একান্তভাবে কাম্য। কিন্তু এরশাদ শাসনামলে এ মাধ্যমগুলোকে অত্যন্ত কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ ও দলীয়করণ করা হয়। কোনো কোনো দৈনিক পত্রিকা ও সাপ্তাহিকীর ওপর কঠোর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা হয়। এমনকি বিভিন্ন সময়ে সরকারের সমালোচনায় অতীব মুখর খবরের কাগজ ও সাপ্তাহিক ম্যাগাজিনের প্রকাশনা বন্ধ করে দেয়া হয়। এছাড়াও বেতার ও টেলিভিশনে একপেশে বক্তৃতা, বিবৃতি ও সরকারের গুণকীর্তন করা ছিল নিত্যদিনের ব্যাপার। কোনো প্রকার সমালোচনামূলক আলোচনা বা বক্তব্য এসব মাধ্যমে স্থান পায়নি। জাতীয় প্রচার মাধ্যমগুলোর এ অত্যধিক নিয়ন্ত্রণ ও দলীয়করণ জনমনে সরকারের প্রতি চরম ঘৃণারই উদ্রেক করেছিল।

৩১। প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

১৮. বিরোধী মতামতের প্রতি অসহিষ্ণুতা (Intolerant of the Opposition): এরশাদ সরকার ছিল বিরোধী মতামতের প্রতি নিতান্তই অসিহষ্ণু। বিরোধী দল ও জোটসমূহের প্রতি এ সরকার বরাবরই আক্রমণাত্মক মনোভাব পোষণ করতেন। বিরোধী দল ও জোটসমূহ কর্তৃক আহূত জনসভার ওপর সকারি দলের নগ্ন হামলা ছিল নিত্যদিনের ঘটনা। বিরোধীদলীয় প্রতিবাদ মিছিলের ওপর সরকারি দলের নগ্ন হামলা নিত্যদিনের ঘটনা। বিরোধীদলীয় প্রতিবাদ মিছিলের ওপর সরকারি মদদপুষ্ট গুন্ডাবাহিনীর সশস্ত্র হামলার ফলে অসংখ্য নেতা ও কর্মি আহত হন। যেকোনো বৃহৎ সিদ্ধান্ত গ্রহণের ব্যাপারে এরশাদ স্বীয় মতকেই প্রাধান্য দিতেন। তাঁর এ ধরনের অগণতান্ত্রিক আচরণ অনেক রাজনৈতিক নেতা ও প্রশাসকের মনে চাপা অসন্তোষ ও ক্ষোভের সঞ্চার করে।[৩২]

১৯. সরকারি ও বিরোধী দলের বৈরি সম্পর্ক ও রাজনৈতিক অস্থিরতা : খালেদা জিয়া সরকারের গুরুত্বপূর্ণ সংকট ও ব্যর্থতা হিসেবে সর্বপ্রথমে যে বিষয়টি উল্লেখ করা যায়, তাহলো ক্ষমতাসীন দল ও বিরোধী দলের সাথে সুসম্পর্কের অভাব। প্রধানমন্ত্রী হিসেবে খালেদা জিয়ার শাসনামলে বিএনপির সাথে বিরোধীদলসমূহের হৃদ্যতাপূর্ণ সম্পর্ক তো ছিলই না বরং বৈরি সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল বলা চলে। সরকারি দল ও বিরোধী দলের এ বৈরী সম্পর্ক গণতন্ত্রে সাফল্যের পথে সর্ববৃহৎ অন্তরায়। এ বিশাল অন্তরায় খালেদা সরকারের পূর্ণ শাসনামলে কাটিয়ে উঠা তাদের পক্ষে সম্ভব হয়নি। জাতীয় সংসদের অধিবেশন থেকে বিরোধী দলগুলো অধিকাংশ সময়ই 'ওয়াকআউট' করেছে। ভিন্ন মতের প্রতি শ্রদ্ধা ও সহিষ্ণুতার অভাবই এরূপ অসমঝোতাকে স্থায়ীরূপে প্রতিষ্ঠা করেছে অভিজ্ঞ মহল মনে করেন।

পরবর্তীকালে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে উপনির্বাচনকে কেন্দ্র করে সরকার ও বিরোধী দলের মধ্যে বিপুল বৈরিতার সৃষ্টি হয়। বিরোধী দলের সংসদ সদস্যগণ এক সময় স্থায়ীভাবে পার্লামেন্টের অধিবেশন বর্জন করলে দেশে চরম রাজনৈতিক অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়। বিরোধী দল কর্তৃক সংসদে ইনডেমনিটি বিল বাতিল উত্থাপন করা হলে সরকারি দল বিষয়টিকে এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করে। অনেকের মতে, বিএনপি সরকার চাপের মুখে গণতন্ত্রের কথা বললেও বাস্তবে গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয়। বিদ্যমান রাজনৈতিক অচলাবস্থা, অসন্তোষ ও বিরোধী দলের সংসদ থেকে পদত্যাগের পরেও সরকার শুধুমাত্র সরকারি দলের সদস্যদের দ্বারা সংসদ অধিবেশনে অর্থ বিলসহ অন্যান্য বিল উত্থাপন ও পাস করে নেয়। এরূপ

৩২। প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

আচরণ কোনো গনতান্ত্রিক সরকারের পক্ষে শোভন তো নয়ই বরং তা গণতন্ত্রের অবমাননার সামিল।[৩৩]

২০. জাতীয় সংসদকে দলীয় কার্যালয়ে পরিণতকরণঃ বিরোধী দলকে কথা বলার সুযোগ না দেয়া, অসত্য বক্তব্য ও ভুল তথ্য প্রদান করা, শেখ হাসিনা ও তার দলীয় সংসদ সদস্যদের অশালীন ও আক্রমণাত্মক ভাষা প্রয়োগ এবং স্পিকার কর্তৃক আওয়ামী কর্মিসুলভ আচরণ ও পক্ষপাতিত্ব বস্তুতপক্ষে জাতীয় সংসদকে আওয়ামী লীগের নিজস্ব কার্যালয়ে পরিণত করেছিল।

২১. প্রতিরক্ষাঃ প্রচলিত নিয়মনীতি ভঙ্গ করে শেখ হাসিনা তার ফুফা মেজর জেনারেল মুস্তাফিজুর রহমানকে এলপিআর থেকে ফিরিয়ে এনে দীর্ঘ চার বছরের জন্য সেনাবাহিনী প্রধান হিসেবে যোগদান করেন। পরে জেনারেল হিসেবে পদোন্নতি দিয়ে চাকরি শেষ হওয়ার আগেই রাজনীতিতে অংশগ্রহণের সুযোগ দেন। মিগ-২৯ ও ফ্রিগেট ক্রয়ে পর্বতপ্রমাণ দুর্নীতি, বড়াইবাড়ি ও পাদুয়ায় শেখ হাসিনার নতজানু বিদেশ নীতি, ভাওতাবাজির পার্বত্য চট্টগ্রাম সংক্রান্ত তথাকথিত শান্তিচুক্তি ও গঙ্গার পানি বন্টন চুক্তি শেখ হাসিনা ও তার সরকারের দুর্নীতি ও দেশের স্বার্থবিরোধী কার্যকলাপের প্রমাণ বহন করে।[৩৪] উপউরিল্লিখিত বিষয়াদি বাংলাদেশের নেতৃত্বের সঙ্কটের অন্যতম কারণ বলে চিহ্নিত করা যায়।

ছ সামরিক ও বেসামরিক দ্বন্দ্ব

১. সামরিক ও বেসামরিক আমলাদের ক্ষোভ : মুজিব সরকার প্রথম থেকেই সামরিক ও বেসামরিক আমলাদের প্রতি বৈরি মনোভাব দেখান। <u>প্রথমতঃ</u> পি.উ. অর্ডার নং ৮ এবং ৯ ঘোষণা করে বহু আমলাকে চাকরিচ্যুত করা হয়। তাদের বেতন ও সুযোগ সুবিধাও কমিয়ে দেয়া হয়। <u>দ্বিতীয়ত</u>: সামরিক অফিসারদের মধ্যে যারা পাকিস্তান থেকে ফিরে এসেছিলেন তারা ১৮ মাস কোনো বেতন পাননি। অন্যদিকে আওয়ামী লীগ সমর্থিত অফিসারদের পদোন্নতি ঘটে। তৃতীয়ত : সামরিকখাতে খরচ একেবারেই কমিয়ে দেয়া হয়। যেখানে ১৯৬৯ সামরিক খাতে খরচ হয়েছিল বাজেটের শতকরা ৫৬ ভাগ। সেখানে ১৯৭২-৭৩ সালে খরচ করা হয়েছিল বাজেটের মাত্র ৯ ভাগ। পরবর্তী বছরগুলোতে সামরিক খাতে খরচ আরো কমিয়ে দেয়া হয়। পরিশেষে, সামরিক বাহিনীর সবচেয়ে বড় ক্ষোভ ছিল, মুজিব সরকার সামরিক বাহিনীর

৩৩। আহমেদ ইয়াসমীন, বর্মণ রাখী, বাংলাদেশের রাজনৈতিক উন্নয়ন, পৃষ্ঠা-৩৩১-৩৩২।
৩৪। ঐ।

Dhaka University Institutional Repository

একটি পাল্টা সংগঠন 'রক্ষীবাহিনী' তৈরি করেছিল। রক্ষীবাহিনী মোটামুটি আওয়ামী লীগের মুজিব বাহিনী ও তাদের সমর্থকদের নিয়ে প্রতিষ্ঠা করা হয়। সামরিক বাহিনীর পরিবর্তে মুজিব সরকার রক্ষী বাহিনীকেই বেশি গুরুত্ব দেয় এবং তাদেরকে সকল প্রকার সুযোগ সুবিধা দেয় হয়। সামরিক বাহিনী স্বাভাবিকভাবেই সরকারের এ নীতিতে অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হয়ে উঠে।

দেশের জনগণ যখন মোটামুটিভাবে মুজিব সরকারের প্রতি ক্ষুব্ধ সেই সময় আসল সৈন্যদলের প্রত্যক্ষ ক্ষোভ। ১৯৭৪ সালে দেশে দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা ও চোরাচালানী বন্ধ করার জন্য সামরিক বাহিনীকে ডাকা হলো। সামরিক বাহিনী চোলাচালানীর ব্যাপারে যাদেরকে গ্রেফতার করতো তাদের অধিকাংশ ছিল আওয়ামী লীগ নেতা। ফলে সামরিক তৎপরতা বন্ধ করে দেয়া হলো এবং কয়েকজন যুবক সামরিক অফিসার চাকুরিচ্যুত হলো। এর কয়েকদিন পরে মেজর ডালিমের সঙ্গে এক হোটেলে বিয়ের অনুষ্ঠানে আওয়ামী লীগের অন্যতম নেতা গাজী গোলাম মোস্তফার একটা অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে। এর বিচার না করে মুজিব ডালিমকে চাকুরি থেকে বরখাস্ত করেন। এভাবে যুব অফিসার গণ চাকুরি হারালে মুজিবকে হত্যার পরিকল্পনা শুরু করে। কারণ তারা জনগণের মানসিকতা অনুভব করছিল যে, মুজিবকে হত্যা করলে জনগণ তেমন প্রতিবাদ করবে না। অবশেষে পরিকল্পনা মোতাবেক ছয়জন যুবক অফিসার ১৯৭৫ সালের ১৫ ই আগস্ট রাতে শেখ মুজিব ও তাঁর পরিবারবর্গকে তাঁর বাসভবনে হত্যা করে। জাতীয় বেতারে ঘোষণা করা হলো বাংলাদেশে স্বৈরাচারী শাসনের অবসান ঘটেছে।[৩৫]

২. নির্বিচারে সেনা নিধন : সপরিবারে মুজিব হত্যা ও জাতীয় চারনেতা সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দিন আহমদ, এম মনসুর আলী এবং এএইচএম কামরুজ্জামানকে ঢাকার কেন্দ্রীয় কারাগারে হত্যার করার মাধ্যমে সামরিক অভ্যুত্থান ও পাল্টা অভ্যুত্থানের মাধ্যমে জেনারেল জিয়া প্রধান সামরিক আইন প্রশাসকের আসনে অধিষ্ঠিত হওয়ার পূর্বেই ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফসহ বহু সেনাকর্মকর্তা নিহত হয়।[৩৬] অতঃপর মেজর জেনারেল জিয়ার নির্দেশেই তার জীবন রক্ষাকারী কর্নেল তাহেরসহ বহু উর্ধ্বতন সামরিক কর্মকর্তাকে নির্মমভাবে ফাঁসির দড়িতে জীবন দিতে হয়। জেনারেল জিয়া এ অভ্যুত্থানের সঙ্গে জড়িত সৈনিক আর এয়ারম্যানদের ওপর ইতিহাসের জঘন্যতম প্রতিশোধ নিয়ে তাঁর মনে প্রজ্জ্বলিত প্রতিহিংসার আগুন নির্বাপিত

৩৫। ইসলাম, ড. সৈয়দ সিরাজুল: স্নাতক রাষ্ট্রবিজ্ঞান, পৃষ্ঠা-৩৫৫-৩৫৬।

৩৬। দৈনিক বাংলা, ৯ মে, ১৯৭৮।

Dhaka University Institutional Repository

করেন। সরকারি হিসাব মতে তিনি ১৯৭৭ সালের ৯ অক্টোবর পর্যন্ত মাত্র দুমাসের মধ্যে ১১৪৩ (এগারশত তেতালিত) সৈনিককে ফাঁসির দড়িতে লটকিয়ে হত্যা করেন। তাছাড়া বহু সৈনিককে তিনি দশ বছর থেকে যাবজ্জীবন পর্যন্ত ক্রমশ কারাদণ্ডে দণ্ডিত করে জেলে পাঠিয়ে দেন। আইনগত পদ্ধতি আর ন্যায় বিচারের প্রতি বৃদ্ধাঙ্গুলি প্রদর্শন করে অত্যন্ত তড়িঘড়ি করে এ শাস্তির কাজ সমাপন করা হয়। বাংলাদেশের ইতিহাসে এর চেয়ে বড় পৈশাচিক সাজার আর কোনো নজির নেই। তিন/চারজনকে একবারে বিচারের জন্যে ডেকে ফাঁসির দণ্ডাদেশ দেয়া হলো। জেনারেল জিয়া বসে বসে সেগুলো অনুমোদন করতেন এবং তার পরপরই তাদেরকে ফাঁসির দড়িতে ঝুলিয়ে হত্যা করা হতো। উল্লিখিত পদ্ধতির সকল কাজ মাত্র ৪৮ ঘণ্টা সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করা হলো। তাঁর সহযোগীদের একজন আমাকে জানিয়েছিল, জেনারেল জিয়া, প্রেসিডেন্ট আর আর প্রধান সামরিক আইন প্রশাসকের দ্বৈত ক্ষমতা কুক্ষিগত করে তাঁর নিজের হাতে লিখে ওই সকল হতভাগা সৈনিকদের দণ্ডাদেশ অনুমোদন করতেন। বেসামরিক বন্দিরা স্মৃতিচারণ করে বলেন, 'কয়েক সপ্তাহ ধরে জেলখানার রাতগুলো সৈনিকদের আর্তচিৎকারে বিভীষিকাময় হয়ে উঠেছিল। তাদেরকে ফাঁসির মঞ্চে ঠেলে নিয়ে যাবার সময় তারা নির্দোষ বলে বুকফাটা চিৎকারে ভেঙ্গে পড়তো।

এরপরও সামরিক অফিসার ও জওয়ানদের জীবন দিতে হয়। এভাবে প্রতিটি বিদ্রোহ কঠোর হাতে দমনের নামে নির্বিচারে সেনা নিধন করা হয় মেজর জেনারেল জিয়ার শাসন আমলে। অবশেষে ২১তম বিদ্রোহে বহু ঘটনার নায়ক জেনারেল জিয়াকেই চট্টগ্রামের সার্কিট হাউসে মেজর জেনারেল আবুল মঞ্জুরসহ কতিপয় বিদ্রোহীদের হাতে প্রাণ হারাতে হয়েছিল। যা পরবর্তীতে আরো সেনাবাহিনীও জওয়ানদের মৃত্যুর কারণ হয়েছিল। স্বাধীনতাউত্তর বাংলাদেশে এভাবেই মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমানের আমলে বাংলাদেশের সেনাবাহিনী ও বিমান বাহিনীতে বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় এবং একের পর এক বিদ্রোহ ও পাল্টা বিদ্রোহে দেখা দেয় এবং চলতে থাকে নির্মম সেনাবাহিনীর প্রক্রিয়া যা সামরিক ও বেসামরিক প্রশাসনে নেতৃত্বের সংকটকেই প্রকট করে তোলে।

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়

বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতি ও নেতৃত্ব: প্রত্যাশা ও প্রাপ্তি

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়

বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতি ও নেতৃত্ব:

প্রত্যাশা ও প্রাপ্তি

স্বাধীনতাত্তোর বাংলাদেশে মানুষ বহু শতাব্দির বঞ্চনা ও শাসন ও শোষণের বিপরীতে প্রত্যাশা করেছিল সকল মানুষের কল্যাণে, সকল মানুষের জন্য নিবেদিত, সকল মানুষের উদ্দেশে পরিচালিত গণতান্ত্রিক সরকার, আদর্শ কল্যাণ রাষ্ট্র, যুগোপযোগী সংবিধান, গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান, ক্ষমতার স্বতন্ত্রীকরণ, রাজনীতির প্রভাবমুক্ত স্থানীয় সরকার, ক্ষমতার বিকেকিন্দ্রকরণ, উন্নয়ন, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়ন ও গণমানুষের মুক্তি। দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন। সকল মত ও পথের মানুষ যারা মুক্তিযুদ্ধের সময় বাংলাদেশের পতাকাতলে ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল তাদের সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় বাংলাদেশকে প্রকৃত সোনার বাংলায় পরিণত করতে হবে। যা ছিল এ পদ্মা, মেঘনা, যমুনা নদীবিধৌত মানুষের দীর্ঘ লালিত স্বপ্ন। নিম্নে তা তুলে ধরা হলো ঃ-

১। নব্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত বাংলাদেশ হবে একটি আদর্শ কল্যাণ রাষ্ট্র : একটি মহোত্তম চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে বাঙালি জাতি ১৯৭১-এর মহান মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। স্বাধীনতার মহাসমুদ্রে মিলনের জন্য পদ্মা, মেঘনা, যমুনা ও তাদের উপনদী শাখা নদীর মতো ছোটবড় সতত ধাবমান বহু চেতনার মহামিলন ক্ষেত্রে পরিণত হয়েছিল আমাদের মুক্তিযুদ্ধ। গোষ্ঠীর বা দলের চিন্তা চেতনা ছিল সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তানকে পাকিস্তানি শাসকদের হাত থেকে মুক্ত করে একটি উদার গণতান্ত্রিক কল্যাণ রাষ্ট্র গঠন। আবার অন্যকোন মতাদর্শীনেতৃত্বের চিন্তা চেতনায় সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তানকে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী থেকে মুক্ত করে এ অঞ্চলকে বাঙালির জন্য একটি স্বাধীন সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে তোলার স্বপ্ন ছিল তাদের লক্ষ্য। এছাড়া এর বাইরের মুক্তিযোদ্ধারা কেবল একটা কথাই জানত পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীসহ সকল অবাঙালিদেরকে পূর্ব পাকিস্তান থেকে তাড়িয়ে দেশকে মুক্ত করতে হবে, পুনরায় বাপ-দাদার ভিটায় স্বাধীনভাবে ফিরে যেতে হবে।[১] চেয়েছিলেন মাতৃভূমির স্বাধীনতা এবং সকল প্রকার শোষণ বঞ্চনার বিলোপ করে সকলের বাসযোগ্য একটি রাষ্ট্র যেখানে থাকবে না, শোষণ, বঞ্চনা, নির্যাতন, অবিচার মানুষ অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক স্বাধীনতার শতভাগ উপভোগ করবে। আগামী প্রজন্মের জন্য একটি সমৃদ্ধ

১। হোসেন, সৈয়দ আনোয়ার, বাংলাদেশের রাষ্ট্র রাজনীতি গণতন্ত্র ও সুশাসন, একুশে বাংলা প্রকাশন, একুশে বইমেলা ২০০৬ পৃষ্ঠা-৫৭।

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশ গড়ে তুলবে। যেন বাংলাদেশ হয়ে উঠবে জার্মান রাষ্ট্রচিন্তাবিদ ফ্রেডরিক হেগেলের "দ্য ফিলোসফি অব রাইট" (১৮২১) গ্রন্থের কল্পিত রাষ্ট্রের মতো। হেগেল তার গ্রন্থে রাষ্ট্রকে এমন একটি নৈয়ায়িক (Ethical) প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিবেচনা করেছেন যা সমাজের সামগ্রিক আকাঙ্ক্ষা ও অভীপ্সার প্রতীক, তিনি তার রাষ্ট্র সংক্রান্ত এমন ধারণাকে আরো বিস্তৃত করে বলেছেন, আসলে রাষ্ট্র হলো মর্তে বিধাতার বিচরণ (March of God on earth) অর্থাৎ হেগেলীয় দর্শনে রাষ্ট্রের পরিচিত এক কল্যাণকর প্রতিষ্ঠান হিসেবে। অবশ্য মার্ক্সীয় দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে বিরাজমান রাষ্ট্র এমন এক পুঁজিবাদী প্রতিষ্ঠান, যা শ্রেণী শোষণ জিইয়ে; রাখে আর সে কারণে শ্রেণী শোষণ বিলুপ্তির উদ্দেশে প্রয়োজন রাষ্ট্রেরই বিলুপ্তি। তবে এটা অনস্বীকার্য যে, ১৯৭১-এ আমরা যখন আমাদের স্বাধীন রাষ্ট্রীয় সত্তা অর্জনের জন্য লড়ছিলাম তখন আমাদের অন্তরীন চেতনায় রাষ্ট্রের যে কল্পিত ছবিটি ছিল তার সঙ্গে হেগেলীয় ধারণার সাদৃশ্য ছিল। আমাদের লড়াই ছিল এমন একটি রাষ্ট্রের লক্ষ্যে যা হবে জাতি হিসেবে আমাদের সব স্বপ্ন পূরণের একটি প্রতিষ্ঠান।[২] প্রকৃতপক্ষে বাংলাদেশের সকল ধর্ম, বর্ণ, শ্রেণীর মানুষের অপার আত্মত্যাগের, জীবন উৎসর্গের, মানসম্ভ্রম ও সম্পদ বিসর্জনের মাধ্যমে মানুষ সকল প্রকার শোষণ, বঞ্চনার উর্ধ্বে একটি সমৃদ্ধ, স্বর্গ রাষ্ট্র অর্জনের প্রত্যাশায় মহান মুক্তিযুদ্ধে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করেছিল। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের "সোনার বাংলা" আর দীনবন্ধু মিত্রের "নীলদর্পণ" নাটকে অঙ্কিত গোলাভরা ধান, গোয়াল ভরা গরু আর পুকুর ভরা মাছের বাংলাকেই পুনরুদ্ধারের সংগ্রামে গ্রামগঞ্জের মানুষ বুক বেঁধেছিল। আর শিক্ষিত, উঠতি ধনিক ও বনিক শ্রেণী এবং রাজনীতিবিদরা স্বাধীন সার্বভৌম বাংলায় চালকের আসন অলংকৃত করার স্বপ্নে বিভোর ছিল। এভাবেই সকলের সর্বাত্মক প্রয়াসের ফসল ছিল স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ।

২. বহুদলীয় গণতান্ত্রিক রাজনীতি ও সুশাসন : বাংলার আর বাঙালিদের ইতিহাস কম সমৃদ্ধ নয়। মহৎ শাসক আর সুশাসনের দৃষ্টান্ত যেমন বাংলার ইতিহাসে বিরল নয়। উল্লেখ্য ছয় শতকের মাঝামাঝি শশাঙ্কের মৃত্যুর পর প্রাচীন বাংলায় প্রায় একশ বছর যে অরাজকতা চলেছিল তাকে বলা হয় "মৎস্য ন্যায়" অর্থাৎ বড় মাছ ছোট মাছকে গিলে খাবার মতো পরিস্থিতি। ভাবার্থ হিসেবে দুর্বলের ওপর সবলের নিপীড়ন এবং তার ফলে সৃষ্ট অরাজতা, অনেকটা সাম্প্রতিক সময়ের মতো পরিস্থিতি। অতিষ্ঠ মানুষের প্রতিনিধি হিসেবে "প্রকৃতিপঞ্জ"

২। প্রাগুক্ত -পৃষ্টা- ৫৮।

Dhaka University Institutional Repository

(সমাজের অভাজন) নেতৃত্বের প্রমাণিত গুণাবলীসম্পন্ন সাধারণ মানুষ গোপালকে রাজা মনোনীত করেছিল। ইতিহাস বলে গোপাল প্রাচীন বাংলায় সুশাসন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। অর্থাৎ প্রকৃতিপুঞ্জের সিদ্ধান্ত সঠিক ছিল। তেমনি ১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধের পর নব্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত বাংলাদেশে একটি গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক সুশাসনের দাবি ছিল সর্বজনীন। প্রাচীন চীনের দার্শনিক কনফুসিয়াস (৫৫১-৪৭৯) শাসন কাজে শক্তি প্রয়োগের চেয়ে শাসনের সদর্থক গুণাবলীর প্রভাবের ওপর গুরুত্ব দিয়েছিলেন। তার শিষ্য মেনসিয়াস (খ্রিস্টপূর্ব ৪র্থ শতক) বিস্তৃত করে বলেছেন যে, শাসক জনগণের "পিতা ও মাতার" মতো এবং তার দায়িত্ব হলো জনগণের অন্ন, বস্ত্র ও বাসস্থান নিশ্চিত করা। তিনি তা না করতে পারলে শাসক হবার নৈতিক অধিকার হারাবেন। বলা বাহুল্য, "কম শাসনই ভাল শাসন" (Less government is the best government) ধারণার জন্মদাতা ছিলেন প্রাচীন চীনের লাওসে (৬০৭-৫১৭ খ্রিস্টপূর্ব)। ইসলামের ১ম খলিফা নির্বাচিত হবার পর হযরত আবু বকর (রা.) বলেছিলেন- " O people behold me charged with the cares of government, I am not the best among you: I need all your advice and all your help. If I do well support me, if I mistake counsel me. To tell the truth to a person commissioned to rule is faithful allegiance; to conceal it is treason. In my sight the powerful and the weak are alike; and to both if I neglect the laws of Allah and the prophet, I have no more right to your obedience." দায়বদ্ধতা ও স্বচ্ছতাভিত্তিক সুশাসনের চেয়ে উন্নত কোন দিক নির্দেশনা পাওয়া মুশকিল।[৩] গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম বাংলার মানুষের আজন্মের স্বপ্ন। আমেরিকার সাবেক রাষ্ট্রপতি আব্রাহাম লিঙ্কন যেমন বলেছেন- "of the people, by the people and for the people" এর যে শাসন তাই গণতান্ত্রিক শাসন। যে রাষ্ট্রে এমন শাসন বিদ্যমান তাই গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র। উপরন্তু, যেমন মার্কিন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী সিমুর মার্টিন লিপ-সট বলেন, রাজনীতির অঙ্গনে ক্রিয়াশীল দিনগুলোর মধ্যে থাকবে পারস্পরিক institutionalized competition, যা তার দৃষ্টিতে গণতন্ত্রের পূর্বশর্ত।[৪] স্বাধীনতাত্তোর বাংলাদেশের জনগণের প্রত্যাশা ছিল সর্বোত্তম গণতন্ত্র ও গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র। যা আপামর জনসাধারণকে পৌঁছে দেবে মুক্তির বন্দরে। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব রাজনৈতিক দলের

৩। প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৬১।
৪। প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৬১।

Dhaka University Institutional Repository

ওপর। এ প্রসঙ্গে রাষ্ট্রবিজ্ঞানী "এডমন্ড বার্ক" যথার্থ গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক দলের পরিচয় তুলে ধরেছেন তার লেখায়। তাঁর ভাষায় রাজনৈতিক দল হলো "A group of people united on the basis of principles to advance national interest." এই যে জাতীয় স্বার্থকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য নীতি ও আদর্শভিত্তিক সংগ্রামী জনতা যাদের প্রজ্ঞাময় নেতৃত্বে সাধারণ মানুষের মুক্তি সুনিশ্চিত হবে রাষ্ট্র উন্নতি ও সমৃদ্ধির শিখরে পৌঁছবে। জাতি হিসেবে পৃথিবীতে বাঙালিরা মাথা উঁচু করে দাঁড়াবে- এটাই ছিল বাংলার স্বাধীনতাকামী সংগ্রামী প্রতিটি মানুষের প্রত্যাশা। মুক্তির সোনালী উষাকে অভিলক্ষ্য করেই আপামর বাঙালিরা মরণ যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে স্বাধীনতাকে ছিনিয়ে এনেছিল।

৩. রাজনৈতিক দল, অবাধ নির্বাচন ও গণতন্ত্রঃ এক সাগর রক্তের বিনিময়ে বাংলার স্বাধীনতা আনল যারা তাদের প্রত্যাশা ছিল মানুষের অধিকার আদায়ের জন্য রাজনৈতিক দল দেশ প্রেমিক ও যোগ্য নেতৃত্ব, অবাধ নির্বাচন, যে নির্বাচনে ভোটারদের মতামত প্রকাশের অবাধ সুযোগ থাকবে। মানুষ স্বাধীনভাবে ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারবেন। স্বাধীনতা পূর্ব আন্দোলন সংগ্রামের সময় বাংলার মানুষ পশ্চিমা ধাঁচের বা ওয়েস্টমিনিস্টার রকমের সংসদীয় গণতন্ত্রের স্বপ্নে বুক বেঁধেছিল। কিন্তু দেশ স্বাধীন হবার পর দেখা গেল আমরা পশ্চিমা কাঠামো ধার করেছি কিন্তু, আত্মস্থ করিনি কাঠামোর অন্তর্নিহিত চেতনা এবং যে কারণে রাষ্ট্র, রাজনীতি, গণতন্ত্র ও সুশাসন সবই অপ্রক্রিয়াশীল (dysfunctional)। উপনিবেশবাদী ঐতিহ্যের শিকার হবার অভিন্ন অভিজ্ঞতা সত্ত্বেও তৃতীয় বিশ্বের অনেক দেশই এসব প্রতিষ্ঠান, প্রক্রিয়া ও পদ্ধতিকে দেশজ ঐতিহ্যের সঙ্গে মিথস্ক্রিয়া ঘটিয়ে তাদের নিজস্ব করে নিয়েছে। ফলে তাদের বর্তমান আলোকিত আর ভবিষ্যত নিশ্চিতভাবে উজ্জ্বল।[৫] আমাদের প্রত্যাশাও ছিল গণপ্রতিনিধিত্বশীল রাজনৈতিক দল, সর্বমহলে গ্রহণযোগ্য এবং নির্বাচকমণ্ডলীর মতামতের প্রতিফলন ঘটার উপায় সম্বলিত নির্বাচন ব্যবস্থা। জনপ্রতিনিধিত্বশীল সংসদ গণতান্ত্রিক চেতনায় উদ্ভাসিত বিজ্ঞ ও প্রাজ্ঞ দেশপ্রেমিক রাজনীতিবিদদের সংসদ। সরকার ও বিরোধী দলের প্রাণবন্ত সংসদ যেকোন মূল্যে কোটি কোটি মানুষের ভাগ্য পরিবর্তনে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে কাজ করে দরিদ্র, কুসংস্কার ও পশ্চাদপতদাকে পিছনে ফেলে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে তোলা। যেখানে দারিদ্র থাকবে না, অশিক্ষা থাকবেনা, মানুষ অন্ধকারের বুক ভেদ করে শিক্ষার আলো ছড়াবে, লালন করবে নিজস্ব সংস্কৃতির মূল চেতনা, ১৯৭১-এর

৫। প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৫৭-৫৮।

Dhaka University Institutional Repository

বিপ্লবের হাত ধরেই বৈপবিক পরিবর্তনের প্রত্যাশায় অধির ছিল যুদ্ধজয়ী বাঙালি। মহান মুক্তিযুদ্ধের পর মানুষ ভেবেছিল আমরা আমাদের অর্থনীতি গড়ে তুলব, রাজনীতি গড়ে তুলব "নির্বাচন হবে, সংসদ বসবে, দিক-নির্দেশনা দিবেন, মানুষ দেশ গড়ার কাজে আত্মনিয়োগ করবে। বাংলাদেশ আবার হয়ে উঠবে সোনার বাংলা। যে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বৈষম্যের ফলে মহান মুক্তিযুদ্ধ, স্বাধীনতা ও স্বাধীন বাংলাদেশ। এদেশের মাটিতে আর কোন বৈষম্য থাকবেনা। বাংলার মানুষ চিরকালের জন্য রাজনৈতিক বৈষম্যকে কবর দেবে। গণতন্ত্র, নির্বাচনও নাগরিকের মতামতই হয়ে উঠবে সকল কর্মকাণ্ডের নিয়ামক শক্তি। দলমত নির্বিশেষে সবার ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় দীর্ঘ লালিত স্বপ্নের বাংলাদেশ গড়ে উঠবে। দেশ প্রেমিক রাজনীতিবিদদের বিরুদ্ধে হয়রানিমূলক কর্মকাণ্ড পরিচালিত হবেনা। রাজপথে এদেশের দুঃখী মানুষের বুকের রক্ত ঝরবেনা, দেশপ্রেমিক রাজনীতিবিদ অন্ধকার কারাপ্রকোষ্ঠে জীবনের মূল্যবান সময় অতিক্রম করবেন না বা ঘাতকের বুলেট তার বুক ভেদ করে যাবে না, পড়ে থাকবেনা দেশ গড়ার সৈনিকের নিথর দেহ। মানুষ ভুলতে চেয়েছিল ইংরেজদের দুঃশাসন, পাকিস্তানিদের বর্বরতা, গণমানুষের অধিকার ও দাবির প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করার রেওয়াজ। মানুষ চায়নি ১৯৭১ এর এতবড় ধ্বংসযজ্ঞের পর পুনরায় রাজনৈতিক দলের ধ্বংসাত্মক কর্মকাণ্ড, নির্বাচনের নামে প্রহসনের নির্বাচন, জনমতের প্রতি অবজ্ঞা। মানুষ চেয়েছিল ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ, কার্যকর স্থানীয় শাসন, জনগণের ব্যাপক অংশগ্রহণ। স্থানীয় পর্যায়ে উন্নয়ন, ঘুমন্ত বাংলাদেশকে জাগিয়ে তুলতে স্বাধীন নির্বাচন কমিশিন ও নিরপেক্ষ নির্বাচন ব্যবস্থা, গণতান্ত্রিক, মূল্যবোধ গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি, পরমত সহিষ্ণুতা, নির্বাচকমণ্ডলীর প্রতি আস্থা, কার্যকর সংসদ। রক্ত দিয়ে দেশ স্বাধীন করেছে যে জাতি, দেশ গঠনে তাদের ব্যর্থ হওয়ার কথা নয়, ব্যর্থ নেতৃত্বই জাতির দুর্গতির মূল কারণ। স্বাধীনতাত্তোর বাংলাদেশে ত্রুটিপূর্ণ নির্বাচন ত্রুটিপূর্ন সংসদ সৃষ্টি হয়েছিল। আর তার সামগ্রিক ফল পরবর্তী পর্যায়ে বেহাল গণতন্ত্র ও লেজেগোবরে প্রশাসন। বিপন্ন বাংলাদেশ, দিশেহারা জনগণ।

৪. পরমত সহিষ্ণু গণতান্ত্রিক নেতৃত্বঃ ঔপনিবেশিক শাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে বাঙালিদের আন্দোলনের মূল চেতনা ছিল গণমানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠা। গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ সম্পন্ন নেতৃত্ব। মানবাধিকার নিশ্চিতকরণ, জাতীয় সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণ, উন্নয়ন ও জাতির কল্যাণ সাধন। গণতান্ত্রিক নেতৃত্বের প্রচলন। ক্ষমতা বিকেন্দ্রিকরণ, সুশাসন, উন্নয়ন। ১৯৭১-এর মহান মুক্তিযুদ্ধ ছিল পূর্বোল্লিখিত স্বপ্নের নবতর রূপায়নের সংগ্রাম। মুক্তিযুদ্ধেও চেতনা ছিল,

Dhaka University Institutional Repository

স্বাধীন সার্বভৌম, সুখি সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে তোলা। মানবাধিকার ও মৌলিক অধিকার প্রতিষ্ঠা। বাংলাদেশ হবে একটি আদর্শ কল্যাণ রাষ্ট্র। এর নেতৃত্ব হবে গণতান্ত্রিক। জনকল্যাণকর। কারো সঙ্গে শত্রুতা নয়, সবার সঙ্গে বন্ধুত্ব। প্রতিবেশি রাষ্ট্রের সঙ্গে সহযোগিতা ও বন্ধুত্বের মাধ্যমে জাতীয় ও আঞ্চলিক উন্নয়ন। প্রতিটি নাগরিকের জন্য খাদ্য, বস্ত্র, আশ্রয়, শিক্ষা চিকিৎসাসহ মৌল মানবিক অধিকারসমূহের নিশ্চয়তা বিধান। মানুষের বিশ্বাস ছিল দেশ স্বাধীন হলে মুক্তবুদ্ধির চর্চা, বিবেকের স্বাধীনতা এবং প্রতিটি মানুষকে শিক্ষার আলোতে আলোকিত করা হবে। সত্য, ন্যায়, সুন্দও ও সমৃদ্ধির হাত ধরে চলবে। থাকবেনা নিপীড়ন, নির্যাতন, অভাব ও দারিদ্র। মানুষ হবে মুক্ত স্বাধীন দেশের বিবেকবান নাগরিক। একটি সুখি সমৃদ্ধ বাংলাদেশে গড়ে তোলা হবে। মানুষ কেবল স্বাধীনতাই অর্জন করবেনা। মানুষের মুক্তি মিলবে। এ মুক্তি অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক। এমনকি মানুষ আত্মিক মুক্তিও অর্জন করবে। দেশের কেন্দ্র থেকে প্রান্ত পর্যন্ত গণতান্ত্রিক নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে। উন্নয়ন নিশ্চিত হবে। নিরাপত্তা সুদৃঢ় হবে। মুক্তি সুনিশ্চিত হবে। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে জোর প্রতিযোগিতা হবে মুক্ত স্বাধীন পরিবেশে, পরিমণ্ডলে। এগিয়ে যাবে দেশ, সমৃদ্ধ হবে জাতি। গৌরবান্বিত হবে বাঙালি, বিশ্বে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবে প্রতিটি বাঙালি। কারণ ঔপনিবেশিকতাবাদের শৃঙ্খল ভেঙে স্বাধীনতার মুক্ত পরিবেশে যোগ্য নেতৃত্বের কারণে এশিয়া, ইউরোপ, আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকায় বহু জাতির গৌরবদীপ্ত উত্থান দূরলক্ষ্য নয়।

ইতোমধ্যে সামন্তবাদ শোষণ নির্যাতনের হাতিয়ার জমিদারি ব্যবস্থার উচ্ছেদ ঘটেছে। ১৯৫২-এর ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমে মাতৃভাষার দাবি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। জাতীয় চেতনায় উদ্বুদ্ধ বাঙালি মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে দীর্ঘলালিত স্বপ্নের স্বাধীনতাকে অর্জন করে ফেলেছে। মানুষের প্রত্যাশা ভূমি সংস্কার হবে। মানুষ তার জমির অধিকার ফিরে পাবে। যেমন পেয়েছে ভাষার অধিকার। রাষ্ট্রভাষার চেতনায় জাতির শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে উঠবে। আধুনিক যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে উঠবে। উৎপাদন বাড়বে, মাঠে, কারখানায়। নদীমাতৃক বাংলার বিশাল জলসম্পদের ব্যবহার ও উন্নয়ন নিশ্চিত হবে। বহুদলীয় গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক সংস্কৃতিক গড়ে উঠবে। দলমত নির্বিশেষে সকলের সম্মিলিত ঐকান্তিক প্রচেষ্টার মাধ্যমে এবং সময়যোপযোগী নেতৃত্বের হাত ধরে স্বাধীনতা সংগ্রামের মাধ্যমে যে বিপ্লবের রক্তস্নাত সূচনা হয়েছে সকল প্রকার উন্নয়নের মাধ্যমে মানুষের অধিকার যথাযথ বাস্তবায়নে মাধ্যমের সেই বিপ্লবের সফল পরিসমাপ্তি ঘটবে।

Dhaka University Institutional Repository

এছাড়াও মানুষ প্রত্যাশা করেছিল-

১. দারিদ্রমুক্ত বাংলাদেশ

২. অশিক্ষা ও কুসংস্কারমুক্ত বাংলাদেশ

৩. বহুদলীয় গণতন্ত্র

৪. সংসদীয় গণতন্ত্র

৫. প্রকৃত স্বাধীন বিচার ব্যবস্থা

৬. ক্ষমতা পৃথকীকরণ

৭. আমলাতন্ত্র মুক্ত গতিশীল শাসনকার্য

৮. উৎপাদনমুখী রাজনীতি

৯. হরতাল, অবরোধ, ঘেরাওমুক্ত রাজনীতি

১০. আইনের শাসন

১১. শিষ্টের পালন ও দুষ্টের দমন

১২. ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য বান্ধব উৎপাদন ব্যবস্থা

১৩. সর্বোচ্চ অগ্রাধিকারভিত্তিক পল্লী উন্নয়ন

১৪. শতভাগ স্বাক্ষর জ্ঞানসম্পন্ন নাগরিক

১৫. উন্নয়ন বান্ধব শিক্ষানীতি

১৬. কাঙ্ক্ষিত / সহনশীল পর্যায়ে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ

১৭. জনসংখ্যার অর্ধেক নারীর সর্বোচ্চ উন্নয়ন

১৮. নারী পুরুষের উন্নয়নে সমতা বিধান

১৯. শিশুর শিক্ষা ও নিরাপত্তার শতভাগ নিশ্চয়তা

২০. বৃদ্ধ, বৃদ্ধা ও প্রতিবন্ধীর শতভাগ নিরাপত্তা

২১. প্রাকৃতিক সম্পদের সংরক্ষণ ও উন্নয়ন

২২. ভূ-রাজনৈতিক কৌশলগত সুবিধা রাষ্ট্রের কল্যাণে ব্যবহার

২৩. প্রতিবেশি রাষ্ট্রের সঙ্গে গঙ্গাসহ সকল নদ-নদীর পানি বণ্টন সমস্যার সুসম সমাধান

২৪. অভ্যন্তরীণ নদ নদীর নাব্যতা সংরক্ষণসহ পানি সম্পদের যথাযথ ব্যবহার

২৫. বাংলাদেশকে যথার্থ কল্যাণ রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে তোলা

Dhaka University Institutional Repository

২৬. পার্বত্য চট্টগ্রামসহ সকল উপজাতি ও বাঙালিদের সমন্বয়ে একটি প্রগতিশীল বাংলাদেশ গড়ে তোলা।

২৭. রাজনৈতিক দলে, সুশীল সমাজে ও সরকারি প্রতিষ্ঠানে দক্ষ, যোগ্য ও কালোপযোগী নেতৃত্ব গড়ে তোলা

২৮. কারিগরি ও প্রযুক্তি নির্ভর শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা।

২৯. দক্ষ জনসংখ্যার বিশ্বায়ন ঘটানো

৩০. ভাষা, শিক্ষা, সংস্কৃতির উন্নয়ন ও বিশ্বায়ন ঘটানো

৩১. বিজ্ঞানভিত্তিক কৃষি ও চাষাবাদ প্রচলন

৩২. শিল্পায়নকে দ্রুততম করণ

৩৩. টেকসই উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনা

৩৪. বৈদেশিক সাহায্য নির্ভর উন্নয়ন কাজে বিনিয়োগ

৩৫. পর্যায়ক্রমে বৈদেশিক সাহায্যনির্ভরতা কমিনে আনা

৩৬. নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থা পুরো দেশব্যাপী বিস্তার ঘটানো

৩৭. প্রত্যন্ত অঞ্চল পর্যন্ত যোগাযোগের সুব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ

৩৮. কাঁচামাল নির্ভর শিল্প কলকারখানা স্থাপন

৩৯. ক্ষমতার পরিপূর্ণ বিকেন্দ্রিকরণ উপজেলাকে ইউনিট ধরে জোরাল কার্যক্রম গ্রহণ

৪০. সৎ রাজনৈতিক নেতৃত্ব কেন্দ্র থেকে তৃণমূল পর্যন্ত বিস্তৃতকরণ

৪১. আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে ভারসাম্য আনয়ন

৪২. আন্তর্জাতিক সসম্যা সমাধানে কার্যকরী দ্বিপাক্ষিক ও বহুপাক্ষিক ফোরাম প্রতিষ্ঠা

৪৩. ম্যাক্র ও মাইক্রো অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা ও উৎপাদন নিশ্চিতকরণ

৪৪. যুগোপযোগী জাতীয় স্বাস্থ্যনীতি

৪৫. শিক্ষা সংস্কার

৪৬. যুগোপযুগি ভূমি সংস্কার

৪৭. সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে উন্নয়নবান্ধব শিল্প কারখানা স্থাপন

৪৮. ব্যাংকিং খাতে যথোযপুক্ত সংস্কার

৪৯. স্বাস্থ্যখাতে যথোপযুক্ত ও যুগোপযোগী সংস্কার

৫০. জাতীয় কৃষিনীতি ঘোষণা

৫১. প্রাকৃতিক দুর্যোগ, বন্যা, খরা ও নদী ভাঙ্গন প্রতিরোধে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ

Dhaka University Institutional Repository

৫২. কালোপযোগী জাতীয় শিক্ষানীতি প্রচলন ঃ ক. শিশু শিক্ষা, খ. নারী শিক্ষা, গ. বয়স্কশিক্ষা ঘ. কারিগরি শিক্ষা, ঙ. পেশাদার শিক্ষা, চ. উচ্চশিক্ষা, ছ. কারিগরি শিক্ষা

৫৩. সমুদ্র বন্দর উন্নয়ন, স্থল বন্দরকে কার্যকর করা, বিমান বন্দরের আধুনিকায়ন

৫৪. কার্যকর বেতার যোগাযোগ স্থাপন

৫৫. খনিজ সম্পদের অনুসন্ধান, উৎপাদন, জাতীয় উন্নয়নে ব্যবহার।

সকল প্রত্যাশার মায়াজাল ছিন্নকরে স্বাধীনতাত্তোর বাংলার মানুষ পরম বিস্ময়ে লক্ষ্য করল একে একে মৃত্যুবরণ করছে সকল স্বপ্ন। শুকিয়ে যাচ্ছে আশার নদী, ফুরিয়ে যাচ্ছে আলো, ধেয়ে আসছে অন্ধকার। বিপন্ন মানুষ, বিপন্ন মানবতা, বিশৃঙ্খলা সর্বত্র, দুর্নীতি আর সীমান্ত পাচারে দেশ ক্ষতুর। বাংলাদেশ একটা "বটমলেস বাসকেটে" পরিণত হয়েছে। নিম্নে বাংলার আশাহত মানুষের প্রাপ্তি তুলে ধরা হলো ঃ-

১. আধুনিক অর্থে রাষ্ট্র বা রাজনীতির শিকড় আমাদের প্রাগ ঔপনিবেশিক ঐতিহ্য না থাকলেও গণতন্ত্র ও সুশাসনের প্রাথমিক লক্ষণসমূহ আমাদের পুরনো ইতিহাসে আছে। পশ্চিমের কাঠামোও চেতনার সঙ্গে এগুলোর সমন্বয় ঘটিয়ে আমরা রাষ্ট্র রাজনীতি, গণতন্ত্র ও সুশাসনের দেশজ মডেল তৈরি করতে পারতাম। কিন্তু তারজন্য প্রয়োজন ছিল উপযুক্ত যোগ্যতা, মননশীলতা ও উদ্ভাবনী দৃষ্টিভঙ্গির নেতৃত্বের; কিন্তু যার ঘাটতি বড়ই বেদনাদায়ক। রাজনীতির সেকাল ও একাল উভয় কালেই নেতৃত্বেও দুর্বলতা প্রকট ছিল। কাঙ্ক্ষিত উত্তরণের নেতৃত্বের কেন্দ্রীয় ভূমিকার প্রতি ইঙ্গিত করে রবীন্দ্রনাথ তাঁর বিদেশি সুহৃদকে একবার লিখেছিলেন "I do not put my faith in any new institutions but in the individuals all over the world who thinks clearly, feel nobly and act rightly. এ চিন্তায় স্বচ্ছ ভাবনায় মহান ও কর্মে সঠিক নেতৃত্বই আমাদের মৌল ঘাটতি এবং যে কারণে আমাদের অন্য সব হতাশাব্যঞ্জক ঘাটতির সৃষ্টি। মহান মুক্তিযুদ্ধেও মাধ্যমে বিশাল ত্যাগের বিনিময়ে পাওয়া আমাদের এ রাষ্ট্রটি কোন্ ধরনের হবে তা নিয়ে আমাদের সেই সময়ের নেতৃত্বের কোন্ আগাম ভাবনা ছিল কিনা তার কোন তথ্য প্রমাণ আজও মেলেনি। মূলত. আমাদের লড়াই ছিল এমন একটি রাষ্ট্রের লক্ষ্যে, যা হবে জাতি হিসেবে আমাদের সকল প্রজন্মের লালিত স্বপ্নের একটি প্রতিষ্ঠান।

Dhaka University Institutional Repository

স্বাধীনতার এত বছর পর মনে হয় হেগেলীয় রাষ্ট্রের ধারণা এখন ফিকে হতে হতে উধাও। আজও নিয়ন্ত্রিত হয়নি জনসংখ্যা বিস্ফোরণ, মাথাপিছু, উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করেনি, আজজও বাংলাদেশ আমদানি নির্ভও দেশ, বেকারত্ব প্রকট, শিক্ষাহার আশানুরূপ নয়, বৈদেশিক ঋণে দেশ জর্জরিত, তৈল, গ্রাস ও কয়লা উৎপাদন পর্যাপ্ত নয়। বিদ্যুতের সরবরাহ অপ্রতুল কৃষির প্রয়োজনীয় আধুনিকীকরণ হয়নি, শিল্প উৎপাদনে দেশ বহু পিছনে পড়ে আছে, বিপুল জনসংখ্যা সম্পদ না হয়ে বোঝা হয়ে আছে, রাজনৈতিক হানাহানি অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেকে বিকশিত হতে দিচ্ছে না। সবকিছু মিলে দেশ বিপর্যস্ত, জনগণ বিপন্ন, মানুষের মৌলিক অধিকার ধুলায় লুণ্ঠিত। যে ধারণাটি স্থান করে নিচ্ছে তা মার্কস সমালোতি রাষ্ট্রের অনুরূপ। রাষ্ট্র এখন জীবনবৈরি প্রতিষ্ঠানের নাম, যা এখন আমাদের আকাঙ্ক্ষার প্রতীক না হয়ে স্বপ্নের মৃত্যুর কারণ হয়েছে। ১৯৭১-এর স্বপ্নের ঠিকানারূপ রাষ্ট্র এখন যেন বিধ্বংস নীতিমালার মতো, আর এমন রাষ্ট্রের অধিবাসী যে মানুষগুলোর, তাদের যাপিত জীবন নানাভাবে বিপন্ন। রাষ্ট্র এখন একাধারে শোষণ ও বিপন্ন ভাবমূর্তির দ্যোতক। সুশাসন ও নাগরিকের কল্যাণের সব অঙ্গিকার উধাও। শাসক শ্রেণীর দুর্নীতি আর অপশাসনের খপ্পড়ে পড়ে বাংলাদেশ আজ বিশ্বে এক নম্বর দুর্নীতিবাজ রাষ্ট্রের খেতাব অর্জন করেছে। আমজনতার কোন ভূমিকা নেই এ লালট লিখন অর্জনে। কাজেই আমাদের রাষ্ট্রের সামগ্রিক চালচিত্র আমাদেরকে নানাভাবে শুধু বিপন্নই করেনা আমাদের ভাবমূর্তিকেও বাইরের দুনিয়ায় নানাভাবে প্রশ্নবিদ্ধ করে। বর্তমান বাংলাদেশে শাসনের স্থান দখল করেছে অপশাসন, রাষ্ট্রের আসনে আছে অপরাষ্ট্র আর রাজনীতিকে হটিয়ে যেন অপরাজনীতি স্থায়ী আসন গেঁড়ে বসেছে। আজ বিভিন্ন মহলে আওয়াজ উঠছে বাংলাদেশ একটি ব্যর্থ রাষ্ট্র। প্রত্যাশিত কালোপযোগী, গণমানুষের স্বপ্নকে অন্তরে ধারণ করে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করে প্রয়োজনীয় সংস্কার সাধন করে বিপুল জনগোষ্ঠীকে উপযুক্ত করে গড়ে তুলে জনশক্তিতে রূপান্তর করে বৈরিবিশ্বের সঙ্গে যোগ্যতা, দক্ষতা ও বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে বাংলাদেশকে বিশ্বে মাথা উঁচু করে দাঁড় করাবার মতো নেতৃত্বের সঙ্কটই বর্তমান বিপন্নদশার মূল কারণ। কারণ নেতৃত্বহীন জাতি, মাঝিহীন তরনির মত। দুর্বল নেতৃত্ব দুর্বল, মাঝির সমতুল্য। যা জাতিকে গন্তব্যের বন্দরে পৌঁছে দিতে অবধারিতভাবেই ব্যর্থ হয়।

২. স্বাধীনতার দীর্ঘ ৩৮ বছর পরও বাংলাদেশের চিত্র রাষ্ট্র বিপন্ন, গণতন্ত্র শৃঙ্খলিত, রাজনীতি, কলুষিত, সুশাসন বিপন্ন দশার, দায়ভার নেতৃত্বের ওপরই বর্তায়। যারা সাধারণ মানুষের ভাগ্য নিয়ে ছিনিমিনি খেলেছেন, ভাঁওতাবাজির রাজনীতি দিয়ে যারা মানুষকে ঠকিয়েছে, ঠকাচ্ছে,

Dhaka University Institutional Repository

উৎপাদনের রাজনীতির নামে যারা দেশের সম্পদ লুণ্ঠন করছেন, পাচার করেছেন, করছেন, যারা দুর্নীতিকে প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ করছেন, যাদের কারণে বাংলাদেশ এক নম্বর দুর্নীতিবাজ রাষ্ট্রের খেতাব পেল তাদের মুখোস উন্মোচনের দিন এসে গেছে। সাধারণ মানুষ আর রাজনীতিবিদ, রাজনৈতিক দল ও নেতৃত্বকে সুনজরে দেখে না। আঠার শতকের শেষের দিকে ইংল্যান্ডের রাজনৈতিক দূরবস্থা পর্যবেক্ষণ করে এডমন্ড বার্ক লিখলেন "Thoughts Upon the Present Discontentes" (১৯৭০) শিরোনামের বইটি। তিনি বেশ জোরালভাবে যুক্তি দেখিয়েছেন যে, দেশে সুশাসন ও শৃঙ্খলায় প্রয়োজন রাজনৈতিক দল, রাজনীতি ও রাজনৈতিক নেতৃত্বের কার্যকর ও ফলপ্রসূ ভূমিকা। কিন্তু যথার্থ রাজনীতি রাজনৈতিক দল ও রাজনৈতিক নেতৃত্ব এবং গণতান্ত্রিক আচরণ ও বাচনিক প্রয়াস বাংলাদেশে আজও প্রকটভাবে অনুপস্থিত। যদিও ১৯৭১ পূর্ব সময়ে এমন নেতৃত্ব ছিল বলেই স্বাধীন বাংলাদেশ অনিবার্য হয়েছিল। বর্তমানে এমন নেতৃত্ব থাকলে বাংলাদেশের রাষ্ট্র ও রাজনীতির এমন দশা হতো না। বাংলাদেশের গণতন্ত্র, সুশাসন ও রাজনীতির বর্তমান চালচিত্র হল institutionalized party confrontation এর ফলে আমাদের বাস্তবতা হলো Not Democracy but Demoselerosis. Democracy-এর সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে Selerosis নামের মানবীয় একটি রোগকে। এ রোগ হলে ধমনিতে স্বাভাবিক রক্ত সঞ্চালনকে বিঘ্নিত হয়। ফলে বাহ্যিক অবয়ব স্বাভাবিক প্রতীয়মান হলেও দেহটি স্বাভাবিক ক্রিয়াশীল থাকে না। আমাদের গণতন্ত্র নির্বাচন সর্বস্ব; কিন্তু গণতন্ত্রায়নের প্রারম্ভিক সূচনামাত্র। সবটুকু নয়। বলা যায়, খোলশমাত্র, আঁশ নয়।[৬] আমাদের বর্তমান দূরবস্থার মূলে আরও বড় কারণ রয়েছে। এ প্রসঙ্গে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিতার উদ্ধৃতি অনিবার্য:–

"অদৃষ্টের শুধালেম চিরদিন পিছে

অযোঘ নিঠুর বলে কে মোরে ঠেলিছে?

সে কহিল, ফিরে দেখ, দেখিলাম আমি,

সম্মুখে ঠেলিছে মোরে পশ্চাতের আমি"

৬। প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৫৭-৫৮।

Dhaka University Institutional Repository

আমাদের গণতান্ত্রিক অগ্রযাত্রার প্রতিবন্ধকতার মূলে রয়েছে যেমন নেতৃত্বের সঙ্কট তেমনি সংবিধানের স্ববিরোধিতা। ১৯৭২-এর সংবিধানের যে চারটি মূলনীতি গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, জাতীয়তাবাদও ধর্মনিরপেক্ষতা তা প্রকৃত শাসন ব্যবস্থার মৌল প্রকৃতি বিরোধী। ফলশ্রুতিতে স্বাধীনতার পরবর্তীতে আমরা দেখেছি রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার ব্যবস্থা ও সংসদীয় সরকার ব্যবস্থার পর্যায়ক্রমিক পালাবদল। **কখনো আধাগণতান্ত্রিক, আধাসমাজতান্ত্রিক বা স্বৈরতান্ত্রিক একদলীয় শাসন ব্যবস্থা। আরও দুঃখের সঙ্গে দেখা গেল সামরিক স্বৈরশাসন। এবং ইচ্ছামতো সংবিধানের ময়নাতদন্ত করণ।** প্রশ্ন উঠতেই পারে আমাদের সংবিধান আদৌ কি গণতান্ত্রিক চেতনাকে কখনোই ধারণ করছে কি না? কেবল সংবিধানের দোহাই দিয়ে আমাদের দেশে বহু স্বৈরতান্ত্রিক কার্যক্রম পরিচালিত, সে রাষ্ট্রটিতে গণতান্ত্রিক বিবর্তন নির্বিঘ্ন ও সরল রৈখিক হবে এমন- ব্যাপারটি বোধহয় সোনার পাথরটির মতো।

বাংলাদেশে আমাদের স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে সরকারের প্রাথমিক বৈধতা থাকলেও সুশাসন দিতে ব্যর্থ বলে এমন সরকারের বৈধতাও প্রশ্নবিদ্ধ হয় এবং পাঁচ বছরের ক্ষমতার ম্যান্ডেট হয় ভিত্তিহীন। মূলত. এদেশে এখনও শাসনের প্রাথমিক কাঠামো গড়ে উঠেনি; যা বিরাজমান তা হল ঔপনিবেশিক উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া কাঠামোর কিছু জোড়াতালি। কাজেই বলা যায়, এদেশে শাসনই গড়ে উঠেনি। সুশাসনের কথা বল আতিশায়োক্তি মাত্র। যা হয়েছে। কাজেই যে রাষ্ট্রের সংবিধান অগণতান্ত্রিক তার সঙ্গে যুক্ত করতে হবে সুশাসনের বৈশিষ্ট্যসমূহ। এরজন্য আবশ্যক হবে সঠিক, পরিচালনা সুযোগ্য নেতৃত্ব। তাহলে দুটো পর্যায় সমান্তরালে এগিয়ে যেতে পারবে। দুঃখের সঙ্গে বলতে হয় স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলাদেশে সুশাসন দৃশ্যমান হয়নি।[৭]

৩। স্বাধীনতাত্তোর বাংলাদেশে নেতৃত্বের সঙ্কট আজ বাংলাদেশকে বিশ্বে শীর্ষ দুর্নীতিবাজ রাষ্ট্র বলে চিহ্নিত করেছে। কেউ কেউ বলছেন, "ব্যর্থ রাষ্ট্র"। আবার কারো মতে, বাংলাদেশ একটি "ব্যর্থ সরকারের" দেশ। স্বাধীনতাত্তোর বাংলাদেশে নির্বাচন পদ্ধতি, পরিবেশ এবং নির্বাচন সংশিষ্ট রাজনৈতিক সংস্কৃতি গণতন্ত্রের উপযোগী নয়। নির্বাচন কমিশন নির্বাচন করে; কিন্তু সর্ষের মধ্যে ভূতের অবস্থানের মতো এ নির্বাচন কমিশনই ত্রুটিপূর্ণ। প্রতিষ্ঠানটির সাংগঠনিক কাঠামোর সীমাবদ্ধতা দূর করার লক্ষ্যে উদ্যোগ গ্রহণ করা প্রয়োজন। কোন সরকারই এমন উদ্যোগ গ্রহণ করছেনা। নির্বাচন কমিশন যথার্থ শক্তিশালী ও স্বায়ত্তশাসিত না হলে কাঙ্ক্ষিত মানের নির্বাচন দুরাশা মাত্র। সরকারের প্রভাবাধীন নির্বাচন কমিশন গণতান্ত্রিক প্রণোদনা

৭। হোসেন, সৈয়দ আনোয়ার, বাংলাদেশ রাষ্ট্র রাজনীতি গণতন্ত্র সুশাসন, একুশে বাংলা প্রকাশন, একুশে বইমেলা-২০০৬ পৃষ্ঠা-৫৮

Dhaka University Institutional Repository

পরিপন্থী। নির্বাচন বিধিমালা এমনভাবে আছে যাতে অযোগ্য কালো টাকার মালিক ও পেশিশক্তি নির্ভর লোকদের নির্বাচন করা ঠেকানো সম্ভব নয়। বিগত বছরগুলিতে নির্বাচনে নির্বাচিত সংসদ সদস্যদের মান নিয়ে নানা প্রশ্ন উঠেছে। আমরা কখনো দেখেছি টাকার জোরে অরাজনৈতিক ব্যক্তি, শিল্পপতি, অবসরপ্রাপ্ত আমলা, সেনা কর্মকর্তারা সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়ে আখের গুছানোর কাজে ব্যস্ত থেকেছেন। বিশেষ করে শিল্পপতি ও ধনিক বণিক শ্রেণী সংসদকে তাদের অবসর বিনোদনের কেন্দ্রে পরিণত করেছেন আর মন্ত্রীদের ও মন্ত্রণালয়ে তদবির করে সম্পদের পাহাড় গড়ে তুলেছেন। তাই বলা চলে, স্বাধীনতাত্তোর নির্বাচন ও নির্বাচিত সাংসদদের মান স্বস্তিদায়ক নয়। স্বাধীনতাত্তোর বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ কখনো এক নায়কের অধীন, কখনো সামরিক শাসনের যাতাকলেপৃষ্ঠ। সর্বোপরি গত দেড় দশক ধরে আমরা যে সংসদ পেয়েছি তা অকার্যকর হিসেবে অভিহীত হয়েছে। অকার্যকর সংসদ আর কার্যকর গণতন্ত্রের মেলবন্ধন হয় না।[৮]

আমাদের বিগত সংসদীয় সরকারের দেড় যুগের সংসদ সদস্যদের গণতান্ত্রিক চেতনা ও মূল্যবোধ যে কত নিচুমানের ছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় সংসদে কোরাম সঙ্কটের মতো ঘটনার পৌনঃপুনিক ঘটনায়। এমনকি বিগত ২০০১ সালের জোট সরকারের নজিরবিহীন বিশাল মন্ত্রিসভার মন্ত্রী মহোদয়গণ উপস্থিত থাকলেই কোরাম হবার কথা। অর্থাৎ সংসদীয় রীতিনীতির প্রতি মাননীয় মন্ত্রিমহোদায়গণের সচেতনতার অভাব পীড়াদায়ক। অন্য সাংসদের কথা আর কিইবা বলার আছে। একে দলীয় স্বৈরতন্ত্রের বহিঃপ্রকাশ বলা চলে।

গণতন্ত্রে ক্ষমতাসীন ও বিরোধী দল নিয়ে হয় সরকার। যেমন ব্রিটেনে ক্ষমতাসীন দলকে বলা হয় "হার ম্যাজেস্টিস গভর্নমেন্ট" এবং সংসদে বিরোধী দলকে "হার ম্যাজেস্টিস অপোজিশন"। অর্থাৎ দু'পক্ষই সরকারের অংশ। কিন্তু আমাদের দৃশ্যপট ভিন্নতর। এখানে ক্ষমতাসীন দলই সব– "উইনার টেকস অল"। সুতরাং এখানেও আমাদের রাজনৈতিক সংস্কৃতির উন্নয়ন প্রয়োজন। আমাদের জাতীয় সংসদে আলোচনাও বিতর্কের মান সব সময়েই প্রশ্নবিদ্ধ থেকেছে। এর প্রধান কারণ সাংসদদের প্রশ্নবিদ্ধ মান। মূলত আমাদের দেশ এখন এক ক্রান্তিকাল অতিক্রম করছে।

৮। প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৮৭।

Dhaka University Institutional Repository

স্বাধীনতাত্তোরকালে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ এর সাড়ে তিন বছরের শাসন আমলে প্রথম জাতীয় সংসদ নির্বাচন হয় ১৯৭৩ সালে। সেই নির্বাচন নিয়েও রয়েছে ভোট ডাকাতির অভিযোগ। ব্যালট বাক্স ছিনতাইয়ের অভিযোগ। প্রভাব খাটানোর অভিযোগ জনগণের ভোটে জয়ী প্রার্থীকে পরাজিত ঘোষণা করার এবং পরাজিত প্রার্থী বিজয়ী ঘোষণা করার অভিযোগ "সেই ১৯৭৩ সালের জাতীয় সাধারণ নির্বাচনে অনুষ্ঠিত কেলেঙ্কারীর কাহিনী কার না জানা ? বহুদলীয় গণতন্ত্রের প্রতি বিশ্বাস ঘোষণা করা সত্ত্বেও ক্ষমতাসীন দলটি ক্ষমতার মোহেই অন্ধ হয়ে নির্বাচিত হতে দেয়নি। সেদিন এমনকি কিছু কিছু নির্বাচিত প্রার্থীকেও জবরদস্তিমূলক পরাজিত বলেই ঘোষণা করা হয়েছিল। সেই সর্বনাশা স্বৈরাচারের প্রথম শিকার ছিলাম আমি নিজে।" [১]

এছাড়াও খন্দকার মোশতাক আহম্মদের পরাজয় নিশ্চিত জেনেও তাকে বিজয়ী ঘোষণা করার মতো ঘটনা ঘটেছিল। দেশপ্রেমিক গণতান্ত্রিক জনগণ প্রবল প্রতিবাদে প্রকম্পিত করেছিল বাংলার আকাশ বাতাস।

এছাড়াও ১৯৭৫-এর পরবর্তী দুটি সামরিক স্বৈরাচারী সরকারের আমলের নির্বাচনে ক্ষমতাসীন সরকারের প্রভাব খাটানো ও পছন্দের প্রার্থীকে বিজয়ী করার ঘটনা বিরল নয়। বলা হয়, ওই সকল বন্দুকের নলের জোরে ক্ষমতা দখলকারী সরকারগুলো দেশের গণতন্ত্রের ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের কবর রচনা করেছিল। আর বিগত দেড় দশকের সংসদীয় গণতন্ত্র দলীয় স্বৈরতন্ত্র ভিন্ন অন্যকিছু নয়। নতুন প্রবর্তিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারগুলোর পরিচালিত নির্বাচনে অংশ গ্রহণকারী কোন না কোন দল কারচুপির অভিযোগ এনেছেন। সেই সকল সাজানো-পাতানো নির্বাচনের মাধ্যমে গঠিত সরকারকে প্রতিহত করার ডাক দিয়েছেন বার বার। এমনকি নির্বাচনের ফলাফল বর্জন করেই ক্ষান্ত হননি বরং সংসদ সদস্য হিসেবে শপথ না নেয়ার ঘোষণা দিতেও কুণ্ঠিত হননি।

প্রকৃতপক্ষে সুখি, সমৃদ্ধ, গণতান্ত্রিক বাংলাদেশের স্বপ্ন আর অবাধ নির্বাচনের মাধ্যমে অর্জিত সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য সরকার আজও বাংলার মানুষের কাছে মরুভূমির "মরীচিকা" হয়েই রয়ে গেল। ১৯৭৩ সালের ৭ মার্চের জাতীয় নির্বাচনে কারচুপির সঙ্গে মুজিবের সম্পৃক্ততায়

১। মেজর জলিল রচনাবলী, সম্পাদনায় মাসুদ মজুমদার, ১৯ নভেম্বর ১৯৯৭ পৃষ্ঠা-৭৯।

Dhaka University Institutional Repository

প্রমাণ পেয়ে দ্যা গার্ডিয়ান পত্রিকা লিখেছিল– "বাংলাদেশের রাজনীতির কৌমার্জ হরণ করে নিয়েছেন বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি, স্থপতি শেখ মুজিবুর রহমান স্বয়ং।"

৪. কিন্তু স্বাধীনাত্তোরকালে যে রাজনৈতিক দলটি ক্ষমতাসীন হয়েছিল তাদের সাড়ে তিন বছরের শাসনামলের কীর্তি কলাপ আমাদের স্মৃতিপটে ভাস্বরই নয় কেবল, বেদনাদায়ক, সে কলঙ্কজনক স্মৃতি আজো দুঃস্বপ্নের মতোই জেগে আছে অনেকেরই মানসপটে। বহুদলীয় গণতন্ত্রে বিশ্বাসী হয়েও আওয়ামী লীগ ও তার নেতৃত্ব ১৯৭৩ সালের প্রথাম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ও পরবর্তী কর্মকাণ্ডে সর্বনাশা স্বৈরাচারীর বেশ ধারণ করেছে বার বার। যা প্রত্যক্ষ করে স্বাধীনতা সংগ্রামের বীর মুক্তিযুদ্ধে ও সেক্টর কমান্ডার মেজর জলিল তার গ্রন্থে বলেছেন, আওয়ামী লীগের সাড়ে তিন বছরের শাসনামলে আমি স্বৈরাচাকে প্রত্যক্ষ করেছি বাংলার শহরে, নগরে, গ্রামেগঞ্জে, হাটে-ঘাটে, মাঠে, ক্ষেত-খামারে, কলকারখানায়, স্কুল, কলেজ, ভার্সিটিতে এমনকি বাংলার বিভিন্ন কারাগারে। স্বৈরাচারকে দেখেছি মায়ের রক্তাক্ত শূন্য কোলে, স্বৈরাচারকে দেখেছে তরুণী বিধবা বধূর বুকফাটা আর্তনাদে, অসহায় শিশুর অন্নশূন্য বাসনে। আমি স্বৈরাচার দেখেছি বিপ্লবী দেশপ্রেমিক জননেতা সিরাজ সিকদারের নির্মম হত্যাকাণ্ডের মধ্যদিয়ে। আমি স্বৈরাচার দেখেছি বহুদলীয় গণতন্ত্রের হোতা কর্তৃক আমাদের দলের হাজার হাজার মুক্তিকামী তরুণের অকাল পরিণতির মধ্যদিয়ে। সবশেষে আমি স্বৈরাচার দেখেছি বহুদলীয় গণতন্ত্রের সমাধি রচনার মধ্যদিয়ে একদলীয় শাসনের উত্থানের কলঙ্কময় অধ্যায় থেকে।[১০] রাজনৈতিক দল ও তার নেতৃত্বের ব্যর্থতার অমোঘ পরিণতি বরণ করতে হয়েছে আওয়ামী লীগ ও তার নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানকে স্ব-পরিবারে জীবন দিয়ে এবং দলটি ক্ষমতার মসনদ থেকে স্বাভাবিকভাবেই ছিটকে পড়ে।

অনেক হত্যাকাণ্ড, ক্যু-পাল্টা ক্যু ও জেলহত্যার মতো ঘটনার পর যে রাজনৈতিক দলটি ক্ষমতায় আরোহণ করেছিল সেটি প্রথমে রাজনৈতিক দল হিসেবে আত্মপ্রকাশ না করে সামরিক জান্তা, হিসেবেই ক্ষমতা কুক্ষিগত করেছিল। ঐতিহাসিক ৭ নভেম্বর, ১৯৭৫ সনে অনুষ্ঠিত সিপাহী জনতার অভ্যুত্থানের সঙ্গে বিশ্বাস ঘাতকতা করে ক্ষমতাসীন ব্যক্তিটি পরবর্তীকালে বহু কুকর্ম ও বৈধকরণের জন্য বিএনপি নামক রাজনৈতিক দলটির জন্ম দেয়। প্রথম সাড়ে তিন বছরের স্বৈরাচারী গোষ্ঠীর কলঙ্কজনক অধ্যায় ৭ নভেম্বরের অভ্যুত্থানের মধ্যদিয়ে সম্পূর্ণভাবে মুছে

১০। প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৮০।

Dhaka University Institutional Repository

যাওয়ার কথা থাকলেও এ অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তিটি চরম স্বৈরাচারী আচার আচরণের মধ্যদিয়ে একের পর এক নতুন কলঙ্কের জন্ম দিতে থাকেন।

সর্বপ্রথম তিনি অভ্যুত্থানের প্রধান নায়ক বীর মুক্তিযোদ্ধা কর্নেল আবু তাহেরকে প্রহসনমূলক বিচারের মধ্যদিয়ে ফাঁসির কাষ্ঠে ঝুঁলিয়ে হত্যা করেন। তারপরের ইতিহাস আরো জঘন্য। আরো করুণ। তিনি নিজ ক্ষমতা পাকাপোক্ত করার স্বার্থে কয়েকশত নন-কমিশন্ড অফিসারকে রাতের অন্ধকারে বিনা বিচারে ফাঁসিতে ঝুঁলিয়ে হত্যা করেন। সেনাবাহিনীর ওই সকল দেশপ্রেমিক সদস্যদের অধিকাংশ ছিল ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী বীর যোদ্ধা সেনাবাহিনীর ওই সকল বীর মুক্তিযোদ্ধাদের ফাঁসির মাধ্যমে হত্যা করে যে ত্রাসের রাজত্ব তিনি কায়েম করেছিলেন, তার স্বার্থেই গড়া রাজনৈতিক দলটি আজ তার অবর্তমানে যখন গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের জন্য জান দিয়ে ফেলার শপথ করে বেড়ায় তখন সেই শহীদ কর্নেল তাহেরের বিধবা স্ত্রী এবং অসহায় ও এতিম সন্তানদের মনে গণতন্ত্র সম্পর্কে কোন আশাবাদ জাগে কি না আমি জানি না। তবে এদের গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের চিৎকার আমাকে পুনরায় শঙ্কিত করে তোলে। বেচারা গণতন্ত্র তাদের হাতে পুনরুদ্ধার কোনরূপ যদি পেয়েই বসে, তাহলে গণতন্ত্রের যে কী অবস্থাটাই হবে তা ভাবতেই শিউরে ওঠে মন।[১১]

উল্লিখিত মন্তব্য এবং আজকের বাস্তবতার হুবহু মিল- মেজর জলিলের সমাজ, রাষ্ট্র, রাজনীতি বিশ্লেষণে গভীরতম অন্তর্দৃষ্টির পরিচয়কে পাঠকের সামনে দিবালোকের মতো স্পষ্ট করে তোলে। বিগত দেড় দশকেও আওয়ামী লীগ ও বিএনপি বাংলাদেশের রাজনীতিতে পর্যায়ক্রমে ক্ষমতায় থেকেও গণতান্ত্রিক চেতনাকে এগিয়ে নিতে চরমভাবে ব্যর্থ হয়েছে। বিএনপির অনুসরণে বাংলাদেশে পরবর্তীতে রাজনৈতিক মঞ্চে আবির্ভূত হন লে. জে. এইচ. এম. এরশাদ। তিনিও রাজনৈতিক দল গঠন করেন। যার নাম "জাতীয় পার্টি"। দীর্ঘ নয় বছর শাসনকার্য পরিচালনা করেও ১৯৯০ সালে সম্মিলিত রাজনৈতিক আন্দোলন ও গণতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠার দাবিতে ক্ষমতা ছেড়ে দিতে বাধ্য হন তদানীন্তন রাষ্ট্রপতি জেনারেল এরশাদ। বাংলাদেশের রাজনীতি এ পর্যায়ে বাক বদল নেয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থার সাংবিধানিক সংযোজনের মাধ্যমে এবং শাসন ব্যবস্থা রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারের পরিবর্তে সংসদীয় ব্যবস্থায় ফিরে আসে। গত দেড় দশক জুড়ে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের মাধ্যমে জাতীয় নির্বাচন পরিচালিত হলেও গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা, গণতান্ত্রিক সমাজ, রাজনীতির গণতন্ত্রায়ন আজও সোনার হরিণই

১১। প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৮০।

Dhaka University Institutional Repository

থেকে গেছে। কোটি কোটি মানুষের দীর্ঘ লালিত স্বপ্ন আজও অপূর্ণ রয়ে গেল। আজও স্বাধীনতার দীর্ঘ ৩৮ বছর পরেও আমাদের এই যে, হতদরিদ্র চিত্র, সন্ত্রাস, চাঁদাবাজি, অনুৎপাদনশীলতা, পশ্চাতপদতা অস্থিরতা, অনিশ্চয়তা কিসের অভাবে এমনটি হলো? সবচেয়ে বড় অভাব কিসের, নেতৃত্বের। মূল সমস্যা ওইটাই, বাকিগুলো সহযোগী। কোথাও নেতা নেই। দক্ষিণ ও বাম, নিস্পৃহ ও উত্তেজিত-সকলেই বলতে চাইবেন বাংলাদেশের মূল সঙ্কট নেতৃত্বের।[১২]

এছাড়াও মানুষ দেখতে পেল ঃ-

১. উত্তরাধিকারসূত্রে, বিপুল ক্ষমতা ও বিশাল অবয়বধারী প্রতিষ্ঠান, রাষ্ট্র ও তার পরিচালক সরকারেও ক্ষমতালিপ্সু নেতৃত্ব।

২. দুর্নীতিগ্রস্ত নেতৃত্ব।

৩. অনভিজ্ঞ, অদক্ষ, অজ্ঞ চাটুকর পরিবেষ্টিত নেতৃত্ব।

৪. পাকিস্তানি ঔপনিবেশ বিরোধী নেতৃত্বে যারা সফল বিরোধী আন্দোলনে পারদর্শী তারা স্বাধীন দেশ গঠনে ব্যর্থ।

৫. আক্রান্ত জনতা আহত সিংহের মতোই ঝাঁপিয়ে পড়েছিল পাকিস্তানি শাসক ও সামরিক জান্তার ওপর। মুক্তিযুদ্ধ হয়ে উঠেছিল সময়ের দাবি, পরিবেশ পরিস্থিতি ছিল অনুকূল যার নির্মাতা ছিলেন যুদ্ধকালীন নেতৃত্বে।

৬. স্বাধীনতার ঘোষণা সম্পর্কিত তথ্য ও উপাত্ত প্রমাণ করে নেতৃত্বের অপরিপক্কতা, অদূরদর্শিতা। তবে জনতার সংহতি ছিল অভেদ্য বিশাল, নিয়ামক শক্তি ছিল রাজনৈতিক ও সামরিক নেতৃত্বের যৌথ প্রয়াস।

৭. Bangladesh is a bottomless basket.

৮. আন্তর্জাতিক রাজনীতির দ্বান্দ্বিকতা, ভারতের ভূরাজনৈতিক কৌশল। পাকিস্তান ও ভারতের সঙ্গে সাপে নেউলে সম্পর্ক বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ইতিবাচক ভূমিকা পালন করেছিল।

৯. মুক্তিসংগ্রামে সফল বাংলাদেশের নেতৃত্ব বিশ্বরাজনীতির কঠিনতম ষড়যন্ত্রের শিকার হয়েছিল যার হাত থেকে বাংলাদেশের রাজনৈতিক নেতৃত্ব রেহাই পায়নি।

১২। চৌধুরী, সিরাজুল ইসলাম, নির্বাচিত রাজনৈতিক প্রবন্ধ, অন্যপ্রকাশ, একুশে বইমেলা-২০০০ পৃষ্ঠা-১১৪।

Dhaka University Institutional Repository

১০. আন্তর্জাতিক রাজনীতির ঘূর্ণাবর্ত বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে স্থায়ী দ্বন্দ্বের জন্ম দেয় এবং স্থায়ীভাবে বাংলাদেশের রাজনৈতিক নেতৃত্ব (De-polarization) সংঘাতপূর্ণ বিপরীত মেরুকরণের জন্ম দেয়।

১১. স্বৈরতান্ত্রিক বৈশিষ্ট্যের নেতৃত্ব সদ্যজাত বাংলাদেশের রাজনৈতিক উত্তরাধিকার।

১২. স্থানীয় পর্যায়ে নীতিহীন নেতৃত্বের উত্তরাধিকার, যার ফলে দুর্নীতি, কালোবাজারি, মজুদদারি, সীমান্ত পাচার ছিল স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলাদেশের প্রধান সমস্যা।

১৩. পরিবারতন্ত্র, গোষ্ঠীতন্ত্র, এলিটতন্ত্র, দলতন্ত্র, বিশেষ বাহিনীর প্রবল দাপট বাংলাদেশের শাসন ব্যবস্থাকে বা পুরো দেশকে একটি বিশৃঙ্খল রাষ্ট্রে পরিণত করেছে। নেতৃত্বের দুর্বলতা বাংলাদেশের এ শোচনীয় অবস্থার জন্য দায়ী।

১৪. সরকার বিরোধীদের / সরকারের সমালোচকদের ওপর চরম নির্যাতনের ফলেই আন্ডারগ্রাইন্ড রাজনীতির জন্ম হয় যা নেতৃত্বর অগণতান্ত্রিক আচরনের ফল।

১৫. গণতান্ত্রিক আন্দোলনের মাধ্যমে গড়ে ওঠা নেতৃত্ব সফল স্বাধীনতা সংগ্রাম পরিচালিত করেও স্বাধীন দেশে একদলীয়, অগণতান্ত্রিক, শাসনের চরম পিচ্ছিল পথে পা বাড়ায় এবং ভয়ঙ্কর পরিণতি বরণ করে।

১৬. কয়েকটি অভ্যুত্থান ও পাল্টা অভ্যুত্থান এবং সামরিক এক নায়কের ক্ষমতা দখল।

১৭. স্বাধীনতা বিরোধী চক্রের পুনরুত্থান এবং মুক্তিযুদ্ধের আদর্শের নির্বাসন।

১৮. পাকিস্তানি সামরিক, সামন্ততান্ত্রিক ও আমলাতান্ত্রিক নেতৃত্বের পুনর্বাসন এবং মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ভূলুণ্ঠিত।

১৯. নব্য বুর্জোয়া, সামন্ততন্ত্র ও পাতিবুর্জোয়া শ্রেণীর উদ্ভব এবং রাষ্ট্রের ছত্রছায়ায় রাষ্ট্রীয় সম্পদের দেদার লুটপাট করে নব্য ধনীক শ্রেণীতে পরিণত হওয়ার অবাধ প্রতিযোগিতা।

২০. সর্ববৃহৎ ও সুসংগঠিত ও চৌকুশ বাহিনী হিসেবে, সামরিক বাহিনীর ক্ষমততা দখল, গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের ধ্বংস সাধন, দুর্নীতি, রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস কায়েমের মাধ্যমে বঞ্চিত বৃহৎ শ্রেণীর নামে ধোঁকাবাজির নেতৃত্ব।

২১. জাতীয়তা ও রাষ্ট্রীয় সংহতির বিনাশ সাধনের নেতৃত্ব।

২২. স্বাধীনতা বিরোধী মতাদর্শের নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা বা মহান মুক্তিযুদ্ধের শহীদদের প্রতি অবমাননার চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত।

২৩. খুনি ও হত্যাকারীদের রাষ্ট্রীয়ভাবে পৃষ্ঠপোষকতার নেতৃত্ব।

২৪. বন্দুকের নলের মাধ্যমে ক্ষমতা দখল করে বন্দুকের নলের মাধ্যমে ভোট আদায়ের নেতৃত্ব।

Dhaka University Institutional Repository

২৫. বিভ্রান্ত বাম রাজনৈতিক নেতৃত্ব।

২৬. অনুগত নির্বাচন কমিশন ও রাষ্ট্রীয় প্রচার মাধ্যমগুলোর অবাধ ব্যবহারের মাধ্যমে বৈধতা প্রাপ্তির নেতৃত্ব।

২৭. সাম্প্রদায়িক মৌলবাদী রাজনীতির পুনরুত্থান।

২৮. নেতৃত্বের কথামালার রাজনীতি, প্রতিশ্রুতিদানের রাজনীতি।

২৯. নেতৃত্বের নীতিহীনতার রাজনীতি।

৩০. নেতৃত্বের ক্ষমতা দখল ও ক্ষমতা আকড়ে থাকার রাজনীতি।

৩১. ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণ, নিয়ন্ত্রণ ও প্রয়োগের রাজনীতি।

৩২. "জনগণের অভিপ্রায়ের অভিব্যক্তি নয়"-রাজনীতি হয়ে উঠেছিল সামরিক শাসকের অসামরিক পোশাকে ফরমান জারির রাজনীতি।

৩৩. রাজনৈতিক দল শ্রেণী স্বার্থের প্রতিভূতে পরিণত হল নেতা বিশেষ শ্রেণীর নেতায় পরিণত হল।

৩৪. ছাত্র ও ছাত্ররাজনীতি দলীয় রাজনীতির তল্পিবাহকে পরিণত হল। হয়ে উঠল রাজনৈতিক দলকে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করার হাতিয়ার।

৩৫. বিরাষ্ট্রীকরণের মাধ্যমে জনগণের রাষ্ট্রীয় সম্পদ মিল, কলকারখানা ব্যক্তি মালিকানায় পরিণত হয়ে রাষ্ট্রীয় সম্পদে বিশেষ ব্যক্তিদের সম্পদে পরিণত হতে লাগল।

৩৬. রাষ্ট্রীয় আমলা শ্রেণী নিজেদের ভাগ্য বদল ও ক্ষমতার ভাগিদার হতে সামরিক শাসকের তল্পিবাহকে পরিণত হল।

৩৭. রাজনীতিতে সামরিক বাহিনীর ভূমিকা ক্রমেই বাড়তে লাগল।

৩৮. আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে বাংলাদেশের অবস্থান বদল ঘটল।

৩৯. ইতিহাস বিকৃতির রাজনীতি।

৪০. দুর্বল গণতন্ত্র।

৪১. নেতৃত্বের নৈতিক অবক্ষয়।

৪২. বিকাশমান স্বৈরতন্ত্র।

৪৩. নেতৃত্বের সামরিকীকরণ।

৪৪. অদূরদর্শী নেতৃত্ব।

৪৫. রাষ্ট্র হয়ে উঠল বল প্রয়োগকারী প্রতিষ্ঠান।

৪৬. অসহিষ্ণু রাজনৈতিক নেতৃত্ব দেশের জন্য বিপদ ডেকে আনল।

Dhaka University Institutional Repository

সবশেষে, বলা যায়, এক বিপুল প্রত্যাশা, বুকভরা আশা, দীর্ঘ বঞ্চনার চির অবসান, নব্য ঔপনিবেশবাদী পাকিস্তানি শাসন, শোষণ, নির্যাতনের বিরুদ্ধে দীর্ঘ পঁচিশ বছর যাবৎ মানুষের মনে ক্ষোভ দানা বেধে উঠতে ছিল। তার ওপর অর্থনৈতিক ও সংস্কৃতি আগ্রাসন বাংলার মানুষকে পাকিস্তানি শাসক শ্রেণীর ওপর শেষ বিশ্বাস ও আস্থা একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল। আপামর জনসাধারণের অংশগ্রহণের মাধ্যমে বিপুল ত্যাগ তিতিক্ষার পর মহান মুক্তিযুদ্ধে লাখ লাখ প্রাণের বিনিময়ে অসংখ্য মা বোনের সম্ভ্রমের বিনিময়ে দেশ স্বাধীন হল। সকল প্রকার শোষণ, বঞ্চনা, মুক্ত একটি গণতান্ত্রিক, উদার, অসাম্প্রদায়িক সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে তোলার কাজে সকলে আত্মনিয়োগ করবে। মানুষের মুক্তি হবে।

কিন্তু স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলাদেশের শাকসদের চালচিত্র, কর্মকাণ্ড, নেতৃত্ব গণমানুষের প্রত্যাশা পূরণে ব্যর্থ হল। আওয়ামী লীগের নেতৃত্ব স্বাধীনতা পূর্ব অর্থাৎ ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এ নির্বাচন ছিল পাকিস্তানি রাষ্ট্রের অস্তিত্বের বিপক্ষে গণরায়। ঔপনিবেশিক শোষণ, নির্যাতনের বিরুদ্ধে গণরায়। কাজেই স্বাধীনতাত্তোর বাংলাদেশে একটি সর্বদলীয় সরকার গঠন করে, এই সরকারের অধীনে গ্রহণযোগ্য নির্বাচন করে তাদের মাধ্যমে বাংলাদেশের সংবিধান, রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজ ব্যবস্থা নির্মাণের প্রয়াস পেলে হয়তো জাতির ইতিহাস অন্যরকম হতে পারতো। হয়তো বা ঘটে যাওয়া ইতিহাসের কলঙ্কজনক স্মৃতি আর অধ্যায় থেকে বাংলাদেশ রেহাই পেতেও পারত। যাহোক, আমরা স্বাধীনতা পেলেও আমার দেশের মানুষের মুক্তি আজও সুদূর পরাহতই রয়ে গেল।

আমরা পেলাম স্বৈরতন্ত্র, একনায়কতন্ত্র, সীমাহীন দুর্নীতি, সীমান্ত পাচার, চরম বিশৃঙ্খলা, দুর্ভিক্ষ, পুরনো কায়দায় মানুষের ওপর অত্যাচার, নির্যাতন, একদলীয় শাসন, রহিত হল মানুষের মত প্রকাশের স্বাধীনতা, বন্ধ হয়ে গেল সংবাদপত্র, রাষ্ট্রীয় প্রচারযন্ত্র হয়ে গেল সরকারের মুখপত্র। অতঃপর রাষ্ট্রীয় হত্যাকাণ্ড, জেলহত্যা, সামরিক অভ্যুত্থান, পাল্টা সামরিক অভ্যুত্থান, হাজার হাজার সাধারণ সৈনিকের মৃত্যুদণ্ড, বীর মুক্তিযোদ্ধা জাতির গৌরব সামরিক অফিসারদের আত্মকলহ ও হত্যাকাণ্ড। স্বাধীনতা বিরোধী শক্তির উত্থান, রাষ্ট্রীয় সম্পদ লুণ্ঠন, ভঙ্গুর গণতন্ত্র, শক্তিশালী আমলাতন্ত্র, লাল ফিতার দৌরাত্ম। প্রকট নেতৃত্বের সঙ্কট। আজ রাজনীতি দুর্নীতিগ্রস্ত, সুশাসন ও সুযোগ্য নেতৃত্ব সুদূরপরাহত সর্বোপরি দেশের অর্থনীতি ও মানমর্যাদা বিপন্ন।

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায়

সিভিল সোসাইটি ও নেতৃত্বের সংকট

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায়

সিভিল সোসাইটি ও নেতৃত্বের সংকট

ভূমিকা ঃ

বাংলাদেশ একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র। বাংলাদেশের স্বাধীনতার বয়স প্রায় চার দশক হতে চলেছে, কিন্তু যে মুক্তির লক্ষ্য নিয়ে এতো জীবন দান, এতো সম্ভ্রমহানী, এতো বড় ক্ষতির স্বীকার, সে মুক্তির দেখা আজও মেলেনি জাতীয় জীবনে। এদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ বা মুক্তির সংগ্রামে হাতেগোনা কিছু মানুষের ভাগ্য পরিবর্তন হলেও আপামর জনসাধারণ আজও বঞ্চিত এবং নির্যাতিত নিগৃহীত। কেবল ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনে, ১৯৬৬ সালের ৬ দফা আন্দোলনে, ১৯৬৯ সালের আয়ুব বিরোধী গণঅভ্যুত্থানে এবং ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে এদেশের মানুষ আক্রমণের শিকার হয়ে জীবন দেয়নি, আজও বাংলাদেশের মানুষকে পুলিশের গুলিতে জীবন দিতে হচ্ছে। স্বাধীনতার পর একটি দিনও বাদ যায়নি। মানুষকে মরতে হয়েছে কোথাও না কোথাও পুলিশের গুলিতে এবং আজও মরতেই হচ্ছে। অভাব, অশিক্ষা ও কুসংস্কার আজও আমাদেও প্রধান শত্রু। পৃথিবীর সর্বাপ্রেক্ষা ঘনবসতিপূর্ণ এদেশে আজও আমরা জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করতে পারেনি। খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন, কৃষি উৎপাদন ও শিল্পায়নের মাধ্যমে অর্থনীতির চাকা সচল করা আজও সম্ভব হয়নি। সন্ত্রাস, দুর্নীতি ও আমলাতন্ত্র ভয়াল থাবায় আজ বাংলাদেশের অস্তিত্ব সঙ্কটাপন্ন। এই সামগ্রিক বিপর্যয়ের জন্য জাতীয় নেতৃত্ব সর্বাগ্রে দায়ী হলেও আমাদের সিভিল সোসাইটির নেতৃত্বের সংকট দায়ী বলে বিশেষজ্ঞগণ মনে করেন। নিম্নে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো।

Dhaka University Institutional Repository

(ক) সিভিল সোসাইটি ও নেভৃত্বেও সঙ্কট ঃ বিষয়ে আলোচনা ও পর্যালোচনার পূর্বেই দেখা দরকার সিভিল সোসাইটির বলতে কী বুঝায়।

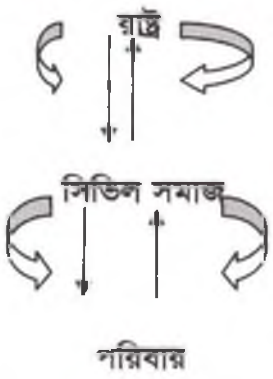

চিত্র ঃ ১ সিভিল সোসাইটির চক্র

সমাজবিজ্ঞানের ইতিহাসে 'সিভিল সোসাইটির' একটি প্রাথমিক প্রত্যয় হিসেবে সুপরিচিত। এর প্রথম আনুষ্ঠানিক প্রস্তাবক হচ্ছেন আঠারো শতকের স্কটিশ ইতিহাসের দার্শনিক অ্যাডাম ফার্গুসন কিন্তু মহান গ্রিক দার্শনিক প্লেটোর 'The Republic' কোনো কল্প লোকের গ্রন্থ নয়; বরং এটি এমন একটি ধ্রুপদী রচনা- যার পিছনে রয়েছে বাস্তব রাজনীতিতে আগ্রহী সংবেদনশীল একজন চিন্তাবিদদের। অপরিসীম শ্রম ও মেধার স্বাক্ষর। কারণ জ্ঞান ও ন্যায় বিচারের আদর্শ সমন্বিত একটি 'সম্প্রদায়' সৃষ্টিতে মানুষের সামর্থের ওপর প্লেটোর ছিল সুগভীর আস্থা।[১] উক্ত সম্প্রদায়ই আজকের সিভিল সোসাইটি ধারণার অন্তর্গত বলেই মনে করেন সমাজবিজ্ঞানী ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানীগণ। এ্যাডাম ফার্গুসন ১৭৬৭ সালে প্রকাশিত তাঁর An Eassy on the History of Civil Society নামক বিখ্যাত গ্রন্থে Civil Society সংক্রান্ত প্রস্তাব প্রকাশ করেন। ফার্গুসনের সিভিল সোসাইটি হচ্ছে রাষ্ট্রের আলোকিত, মহিমান্বিত, পরিশুদ্ধ পরার্থে উৎস্বগীকৃত জনগোষ্ঠী, যাদের স্পর্শে বা প্রচেষ্টায় সমাজের বিবর্তনের ধারণায় ঘটে যাওয়া বিকৃতি, অসঙ্গতি, অসাম্য অনাচার দূর হবে একটি শুভ সমাজের বিবর্তন ঘটবে। মানুষ-শান্তি, প্রগতি ও সমৃদ্ধি অর্জন করবে। মূলত. ফার্গুসনের 'সিভিল সোসাইটি' হচ্ছে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত সামাজিক প্রতিষ্ঠানসমূহের একটি ব্যবস্থা (system) বিশেষ।[২] ফার্গুসনের তার 'সিভিল সোসাইটি'র প্রস্তাবনায় প্রকৃতপক্ষে সমাজবিজ্ঞান, নীতিশাস্ত্র ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের মধ্যে একটা সমন্বয়ের প্রয়াস পেয়েছেন।[৩]

---

১. সেন ড. রঙ্গলাল, সিভিল সোসাইটি, পৃ-১৭
২. প্রাগুক্ত, পৃ- ৩
৩. প্রাগুক্ত, পৃ- ৯

Dhaka University Institutional Repository

মূলত ফার্গুসন ছিলেন একজন নীতিবাদী। তাই তিনি আধুনিক রাষ্ট্র ব্যবস্থার অভ্যন্তরীণ সকল বাস্তব সম্ভাবনাকে সুষ্ঠুরূপে সদ্ব্যবহার করার পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতেন যে, সামাজিক প্রগতিজনিত কারণে মানুষের স্বাভাবিক সত্তার যে বিকৃতি ঘটে তার একটি রক্ষণশীল রাজনৈতিক ও সামজিক সমাধান সম্ভব। আর এটাই তার 'সিভিল সোসাইটি' প্রত্যয় প্রসঙ্গে প্রকৃত প্রস্তাবনা। আবার এরিস্টটলের ধ্রুপদি রচনা 'Politic' এ দুটো গুরুত্বপূর্ণ ধারণা প্রাধান্য পায় ঃ (১) 'রাষ্ট্র একটি সম্প্রদায়' এবং (২) 'এটি সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে শ্রেষ্ঠ '। এরিস্টটল তাঁর গ্রন্থে সম্পত্তির ব্যক্তি মালিকানার পক্ষে যুক্তি দেখালেও তিনি বিশ্বাস করতেন সম্পদের ক্ষেত্রে মাত্রাতিরিক্ত অসমতা রাষ্ট্রের ভারসাম্য ও সমন্বয় বিনষ্ট করতে পারে। তিনি তার এ উপলব্ধি থেকে এমন একটি সমাজ প্রতিষ্ঠার কথা সপ্রশংসভাবে উলেখ করেন যেখানে মধ্যবিত্ত শ্রেণী শক্তিশালী থাকবে। এছাড়া ন্যায়বিচার অনুসন্ধানে, তার অভিমত, "মানুষের তৈরি শাসন কখনো নিখুঁত ন্যায় বিচার নিশ্চিত করতে পারে না। এজন্য যা আবশ্যক তাহলো আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা। এটি অবশ্যই ব্যক্তি মানুষের আইনের চেয়ে অধিকতর গ্রহণযোগ্য।" 'সিভিল সোসাইটি' সম্পর্কে এরিস্টটলের ধারণার সূত্র আমরা এখান থেকে অনুধাবন করতে পারি।[৪] জন লক রাষ্ট্রকে সিভিল সমাজ ও রাজনৈতিক সমাজের একীভূত প্রতিষ্ঠান হিসেবে দেখেছেন। পরবর্তীতে রুশোও একই ধারণা পোষণ করেছেন।[৫]

অন্যদিকে, হেগেল বুর্জোয়াদেরকেই সিভিল সমাজ হিসেবে দেখেছেন। তার মতে, সিভিল সমাজ হচ্ছে- বিভিন্ন ব্যক্তির ব্যক্তিগত উদ্দেশ্য ও স্বার্থোদ্ধারের প্লাটফর্ম।' তিনি একে রাষ্ট্রের বর্ধিত অংশ হিসেবে দেখেছেন।[৬]

কার্ল মার্কস ও গ্রামসি সিভিল সমাজের গুরুত্ব উপলব্ধি করেছেন। মার্কস এর মতে, সিভিল সমাজ হচ্ছে- মূলত বুর্জোয়া সমাজ এবং যেখানে রাষ্ট্রীয় স্বার্থের বিপরীতে ব্যক্তি স্বার্থই প্রাধান্য পায়।[৭] অন্যদিকে, গ্রামসি সিভিল সমাজকে চিত্রায়িত করেছেন "রাজনৈতিক সমাজ+সিভিল সমাজ = রাষ্ট্র" বলে। তার মতে, সিভিল সমাজ হলো এক ধরনের সংগঠন ও টেকনিক্যাল মাধ্যম যার ওপর ভিত্তি করে শাসক সমাজ তাদের সাংস্কৃতিক তাদের আদর্শিক মতাদর্শের যৌক্তিকতা প্রতিষ্ঠা করতে সচেষ্ট হয়।[৮] ফরাসি চিন্তাবিদ টাকিয়াভেলি সিভিল সমাজের প্রাধান্য

---

৪. প্রাগুক্ত, পৃ-২০

৫. হোসেন, সৈয়দ আনোয়ার, "গণতন্ত্র ও সিভিল সমাজ, চাওয়া পাওয়ার হিসাব", অনুপরাহী সম্পাদিত, সিভিল সোসাইটি; রাজনৈতিক পর্যালোচনা, লোকজ, পৃ-৬২, ১৯৯৯

৬. Knox T.M. Hegels, "Philosophy of right (Translated with notes). U.S.A 1969

৭. Marx Karl, "In Praise of Democracy" in Fredrick L. Bender (ed.), Karl Marx: The Essential Writing, New York parper & Row, 1972.

৮. Chandhoke, Neera, State and Civil Society-Explorations in Political Theory, New Delhi, Sage Publications, P-112. 1995

Dhaka University Institutional Repository

স্বীকার করে বলেন যে, রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ থেকে সিভিল সমাজই ব্যক্তিকে রক্ষা করতে পারে এবং সিভিল সমাজ তার অধিকার রাষ্ট্রের ইচ্ছার বিরুদ্ধেও প্রয়োগ করতে পারে।[৯]

সতের শতকে সিভিল সোসাইটির ধারণার উন্মেষ থেকে আজ পর্যন্ত বিবর্তনের পথ ধরে এ সম্পর্কিত ধারণায় এসেছে ব্যাপক পরিবর্তন। সিভিল সমাজ কি রাষ্ট্রের প্রতিশব্দ, নাকি এটি রাষ্ট্রের একটি একীভূত প্রতিষ্ঠান? এটি কি ব্যক্তিস্বার্থ প্রতিষ্ঠার একটি সংগঠন নাকি বৃহত্তর জাতীয় কল্যাণ সাধনের একটি হাতিয়ার? সর্বোপরি এটি কি শাসক গোষ্ঠীর আদর্শিক মতবাদের যৌক্তিকতা নির্মাণের জন্য সচেষ্ট নাকি গণতন্ত্র বিনির্মাণে সচেতন, জনগোষ্ঠীর স্বতঃস্ফূর্ত বহিঃপ্রকাশ? এসব বিতর্ক পিছনে ফেলে একুশ শতকে সিভিল সোসাইটি হয়ে উঠেছে গণতন্ত্র রক্ষা ও সরকারের ওপর কার্যকর নজরদারির একটি অত্যবশ্যকীয় প্রতিষ্ঠান।[১০]

সুতরাং বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে সিভিল সোসাইটি হিসেবে সেই প্রতিষ্ঠানকেই চিহ্নিত করা যায় যা একটি অরাজনৈতিক ও অলাভজনক প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে উঠেছে। যেখানে ব্যক্তিরা একত্রিত হয়ে ভলান্টারি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলে ও গণসচেতনতা, জনমত তৈরি এবং সরকারের দমনমূলক কার্যক্রমের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ তৈরিতে সচেষ্ট থাকে। ক্ষেত্রবিশেষে তারা চাপ সৃষ্টিকারী গোষ্ঠী হিসেবেও কাজ করে এবং সরকারের করণীয় সম্পর্কেও মতামত প্রকাশ করে।[১১]

বাংলাদেশের সিভিল সোসাইটির সক্রিয় এক্টরদের বিভিন্ন গবেষক বিভিন্ন Typology তে ভাগ করেছেন। তবে গুরুত্ব ও কার্যকর ভূমিকা রাখা সাপেক্ষে সিভিল সোসাইটির এক্টরদের মূলত ছয় ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। যথা-

১. একাডেমিক সংস্থাসমূহ

২. শ্রমিক সংস্থাসমূহ।

৩. পেশাজীবী বেসরকারি সংগঠন (বিভিন্ন চেম্বার অব কমার্সসমূহ)।

৪. সাংবাদিক সংস্থাসমূহ

৫. এনজিও

৬. থিয়েটার সংস্থাসমূহ।

---

৯. রহমান, মোঃ শামসুর, "সিভিল সমাজ ও গণতন্ত্র : বাংলাদেশ প্রেক্ষিত", তারেক শামসুর রহমান (সম্পাদিত) বাংলাদেশ রাষ্ট্র ও রাজনীতি, উত্তরণ-২০০০, ঢাকা, পৃ-১১৪

১০. বাংলাদেশের রাজনীতির চার দশক, সম্পাদনায় রেহমান, ড. তারেক শামসুর, পৃ-৩৩৫-৩৩৬

১১. প্রাগুক্ত, পৃ-৩৩৭

Dhaka University Institutional Repository

একথা দুঃখজনক হলেও সত্য যে, সিভিল সোসাইটির উল্লিখিত এক্টরসমূহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে কিছু ইতিবাচক ভূমিকা পালন করলেও আদর্শিক দৈন্যতা, নীতিহীনতা, অর্থের প্রলোভন ও সাংগঠনিক দুর্বলতার কারণে, বৈদেশিক প্রভাব; দাতা গোষ্ঠীর চাপ ও অভ্যন্তরীণ কোন্দলের কারণে[১২] যথাযথ ভূমিকা পালন করতে ব্যর্থ হচ্ছেন। বিশেষত স্বাধীনতাউত্তরকাল হতে দেশে নেতৃত্বের যে সঙ্কট চলছে তা নিরসনে তেমন কোনো উদ্যোগী ভূমিকা পালন করতে পারছেন না। বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও উপদলে বিভক্ত হয়ে আত্মকলহে লিপ্ত আমাদের সিভিল সোসাইটির প্রষ্টরসমূহ। ফলে জাতির ক্রান্তিকালে সিভিল সোসাইটির এক্টররসমূহ প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে ব্যর্থ হচ্ছেন।

১। একাডেমিক সংগঠনসমূহ : শিক্ষাবিদদের সংগঠনসমূহ যেকোনো দেশেই সিভিল সমাজের গুরুত্বপূর্ণ অংশ। সরকারের ওপর কার্যকর চাপ সৃষ্টি, জনমত গঠনেও নেতৃত্বের সঙ্কট নিরসনে বা ক্রান্তিকালে জাতিকে সঠিক নেতৃত্ব দানে তারাই অগ্রণী ভূমিকা পালন করে থাকে। তবে বাংলাদেশে সিভিল সোসাইটির এ এক্টরটি পুরোপুরি দুটি বৃহৎ রাজনৈতিক দলের লেজুরবৃত্তি করে বেড়াচ্ছে। যেকোনো পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সংগঠনসমূহ বিভিন্ন রং কিংবা ডান বা বাম এমনকি মৌলবাদী- এ সুস্পষ্ট বিভাজনে বিভক্ত। স্বাধীনতা উত্তরকাল থেকে আজ পর্যন্ত জাতি যেখানে সুস্পষ্ট নেতৃত্বের সঙ্কটে নিপতিত, জাতীয় অগ্রগতি, উন্নতি, উন্নয়ন, প্রগতি ও বৃহত্তর গণমানুষের মুক্তি যেখানে সুদূর পরাহত। মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বা জাতীয় জীবনে গণতান্ত্রিক চেতনা প্রতিষ্ঠা, অর্থনৈতিক মুক্তি অর্জন, প্রতিটি নাগরিকের মৌলিক চাহিদা পূরণ, কৃষিক্ষেত্রে উৎপাদন বৃদ্ধি করে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন, শিল্পায়নের মাধ্যমে বেকারত্ব দূরীকরণ করে অর্থনৈতিকভাবে জাতিকে স্বাবলম্বী করে বিশ্বে মাথা উঁচু করে দাঁড়ান, শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে উন্নত বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে চলার উপযুক্ত মেধাবী, দক্ষ ও যোগ্য নাগরিক সৃষ্টিসহ সর্বক্ষেত্রে নেতৃত্বের সঙ্কট যেখানে প্রকট সেখানে সিভিল সোসাইটির উলিখিত এক্টরের দৈন্যদশা অত্যন্ত পীড়াদায়ক। অথচ প্রবাদ আছে- "শিক্ষকরা জাতি গঠনের কারিগর" কিন্তু তাদের কার্যক্রম যেমন হতাশাজনক তেমনি পীড়াদায়ক। জাতির বিবেক শিক্ষক সমাজ যদি

---

১২. দেখুন Stiles, Kendall, "Grassroot Empowerment: States, Non-States Actors and Globla Policy Formulation", in Geottrey Underhill and Richard Heggott (eds.), Non State Actors and Power in the Global System, London Routledge, 2000. PP 88-102.
Chowdhury Dr. Hassanuzzaman, Globalization and 'Market-Friendly' Myth A Provoking Note, Dhaka.. Center for Islamic Research, 2008.

Dhaka University Institutional Repository

যথার্থ ভূমিকা পালন করতে সমর্থ হতো তবে নেতৃত্বের সংকট যেমন দূর হতো তেমনি সোনালী ভোরের প্রত্যাশায় জাতি বুক বাধতে পারতো।

২. শ্রমিক সংস্থাসমূহ : বাংলাদেশের শ্রমিক সংগঠনগুলি মূলত সরকারি ইন্ড্রাস্ট্রির সঙ্গেই জড়িত এবং শ্রমিক সম্পর্কিত জাতীয় পলিসি নির্ধারণী পর্যায়ে তারা একটা ভূমিকা রাখে। তবে সত্যিকার অর্থে বাংলাদেশের শ্রমিক সংগঠনগুলো "বিভাজনের রাজনীতির" শিকার। সমস্ত সংস্থার শ্রমিক সংগঠনই কোনো না কোনো দলীয় রাজনীতির লেজুড়বৃত্তি করে। শ্রমিক সংগঠনের নেতাদের দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি, লুটপাটের কারণে কোনো সরকারি ইন্ডাস্ট্রি লাভজনক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয় না। এশিয়ার বৃহত্তম পাটকল আদমজী শেষ পর্যন্ত বন্ধ হয়ে গেছে। দেশের বহু ইন্ডাস্ট্রি পূর্বাপর একই পরিণতি বরণ করেছে। এক সমীক্ষায় দেখা গেছে। যে জাতীয়ভাবে ২৩টি শ্রমিক সংগঠনের মধ্যে মাত্র ৩টি আংশিক রাজনৈতিকভাবে স্বাধীন হিসেবে বিবেচিত হয়।[১৩] এ সংগঠনগুলো অধিকাংশ ক্ষেত্রেই গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত হয় না এবং এগুলোর নেতারা হয় অযোগ্য, না হয় দুর্নীতিবাজ ও পেশীশক্তির দ্বারা বেষ্টিত। ফলে সিভিল সমাজের একটি অত্যন্ত শক্তিশালী Actor হওয়া সত্ত্বেও বাংলাদেশে তাদের ভূমিকা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নেতিবাচক।[১৪] এরা জাতির কোনো কল্যাণে তো আসেই না বরং অযোগ্য নেতৃত্বের তল্পিবাহক এ সকল শ্রমিক সংগঠনগুলো দিন দিন জাতির অর্থনীতিকে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে নিয়ে যাচ্ছে, নতৃত্বের সংকটকে করছে প্রলম্বিত। জাতীয় পর্যায়ে দুর্বল, অযোগ্যও অবৈধ নেতৃত্ব শ্রমিক সংগঠনের নেতাদের জন্য সাপেবর হয়ে দেখা দেয়। অযোগ্য নেতৃত্ব ও অস্থিতিশীল পরিস্থিতিকে কাজে লাগিয়ে সংগঠনের নেতারা যেমন আঙ্গুল ফুলে কলা গাছে পরিণত হয় তেমনি রাষ্ট্রীয় শিল্প, কলকারখানায় লালবাতি জ্বালিয়ে দেয়।

৩. পেশাজীবী বেসরকারি সংগঠন (চেম্বার অব কমার্স) : সাধারণভাবে এটা বলা যায় যে, প্রাতিষ্ঠানিক দুর্বলতা ও রপ্তানি নির্ভরশীল প্রতিষ্ঠান হওয়ার কারণে বাংলাদেশের ব্যবসায়ী সম্প্রদায় বিশেষত চেম্বার অব কমার্সগুলো পশ্চিমা বিশ্বের ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের মতো রাজনৈতিক ঘটনাবলীর ওপর কার্যকর চাপ প্রয়োগ করতে পারে না। যেহেতু চেম্বার অব কমার্সগুলো, যার অধিকাংশ সদস্যই হচ্ছে- রপ্তানি নির্ভর গার্মেন্টস ইন্ডাস্ট্রির মালিক, উৎপাদনের ক্ষেত্রে সরাসরি তৃণমূল পর্যায়ের সঙ্গে জাড়িত নয়, তাই জাতীয় পর্যায়ে তাদের

---

১৩. দেখুন, রেহমান, ড. তারেক শামসুর রহমান, (সম্পাদিত), "বাংলাদেশের রাজনীতির চার দশক" প্রথম খণ্ড, পৃ-৩৪৬
১৪. প্রাগুক্ত, পৃ- ৩৪৭

Dhaka University Institutional Repository

ভূমিকা তেমন উল্লেখযোগ্য নয়। সেই সঙ্গে দলীয় রাজনীতির সম্পৃক্ততা তাদের ভূমিকাকে অনেকাংশেই প্রশ্নবিদ্ধ করে। তবে ব্যবসায়ী স্বার্থরক্ষায় তারা সাধারণত একজোট হয়েই বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করে।[১৫] চেম্বার অব কমার্স এর নেতারা বিপুল অর্থবিত্তের মালিক হওয়ার পরও অধিকতর ধন সম্পদের মালিক হওয়ার জন্য অবৈধ প্রভাব খাটিয়ে দুর্নীতিবাজ ব্যাংক কর্মকর্তাদের সাথে যোগ সাজসে বিপুল ঋণ গ্রহণ করে এবং পরবর্তীতে জনগণের আমানত ফেরত না দিয়ে ঋণ খেলাপিতে পরিণত হয়। পুনরায় দুর্নীতিবাজ রাজনৈতিক নেতাদের কাজে লাগিয়ে বিপুল অংকের টাকা ঋণ মওকুফ করিয়ে নিয়ে দরিদ্র জনগণের টাকা আত্মসাৎ করে। যাকে প্রকারান্তরে জনগণের টাকা চুরিও বলা যায়। এ জাতীয় নেতারা যেমন প্রতিষ্ঠানের জন্য বোঝা তেমনি জাতীয় নেতৃত্বের বিকাশেও প্রতিবন্ধকতা হয়েই বিরাজ করবে।

৪. **সাংবাদিক সংগঠনসমূহ :** বাংলাদেশে সিভিল সোসাইটির গুরুত্বপূর্ণ Actor হিসেবে সাংবাদিক সংগঠনগুলো তুলনামূলক স্বাধীন ভূমিকা পালন করে থাকে। এ সংগঠনগুলো সাধারণত কোনো ধরনের বৈদেশিক ফান্ড পায় না। ফলে তাদের দাতাগোষ্ঠীগুলোর কাছে কোনো ধরনের দায়বদ্ধতার বন্ধনেও আবদ্ধ থাকতে হয় না। বর্তমানে বাংলাদেশের প্রায় বাংলা, ইংরেজি মিলিয়ে একশটির মতো বৃহৎ জাতীয় দৈনিক প্রকাশিত হচ্ছে। এর মাঝে বেশকটি ঢাকার বাইরে বিভাগীয় শহরগুলো থেকে প্রকাশিত হয়। তবে যেহেতু সরকারি বিজ্ঞাপনই সংবাদপত্রগুলোর মূল অর্থায়নের উৎস তাই স্বভাবতই সেখানে সেলফ সেন্সরশিপ বিদ্যমান। সাংবাদিকরা জাতীয় প্রেসক্লাবসহ বিভিন্ন পেশাজীবী সংগঠনের সঙ্গে জড়িত। তারা বিভিন্ন জাতীয় ইস্যুতে কার্যকর জনমত গঠনে সব সময়ই সক্রিয় ভূমিকা রেখে চলেছে। বর্তমানে ইলেকট্রনিক্স মিডিয়ার ব্যাপক প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে এ মিডিয়ার সংবাদকর্মি বা স্পট রিপোর্টাররাও সুশাসন প্রতিষ্ঠায় তাদের কর্মপ্রয়াস অব্যাহত রেখে চলেছে। সকল প্রকার দুর্ঘটনাসহ মানুষের ওপর অন্যায়, অত্যাচার, জুলুম, নির্যাতন ও সামাজিক অসাম্য তুলে ধরছেন। তারা সরকারের কর্মকাণ্ডের চুলচেরা বিশেষন করে এবং ভালোমন্দ দিক মানুষের কাছে তুলে ধরছেন। ফলে সরকারি কর্মকাণ্ডের ব্যাপারে ব্যাপক জনমত সংগঠিত হচ্ছে। বিশেষ করে নির্বাচনের সময় এ সকল সংবাদপত্র সংবাদকর্মি, ইলেকট্রনিক্স মিডিয়ার কল্যাণে মানুষের পক্ষে ভোটদানের ক্ষেত্রে সঠিক সিদ্ধান্ত নেয়া সহজতর হয়ে উঠেছে। যা আমাদের নেতৃত্ব নির্বাচনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

---

১৫. Chowdhury D. "Legislature and Governance in Bangladesh" H. A. Hye (ed.) Governance, South Asian Perspective Dhaka UPL, Pp-49-68, 2000

Dhaka University Institutional Repository

কিন্তু দুঃখের বিষয় হলো যেখানে বাংলাদেশের রাজনীতি ও নেতৃত্বের অন্তর বাহির সকল বিষয়ে জনসাধারণকে সর্বাপেক্ষা সঠিক তথ্য দেয়ার ক্ষমতা সম্পন্ন সংবাদকর্মি ও ইলেকট্রনিক্স মিডিয়ার রিপোর্টাররাও বিভাজনের রাজনীতির শীকার হয়ে বিভক্ত হয়ে আছেন। ফলে সৎ, নিরপেক্ষ ও নির্ভীক সংবাদকর্মির যে ভূমিকা সেটা তাদের মধ্যে লক্ষ্য করা যায় না। বরং দলের আনুগত্য প্রকাশ করতে গিয়ে তারা সঠিক তথ্য প্রকাশে যেমন ব্যর্থ হচ্ছেন তেমনি স্বধর্মচ্যুত হয়ে পড়েছেন (দলীয় আনুগত্যের কারণে অযোগ্য নেতাকে নিয়ে গুণকীর্তন করতে তারা দ্বিধাবোধ করেন না। মনে হয় তারা পারেন না এমন কিছু নেই।) ফলে জাতিগঠন প্রক্রিয়া ব্যাহত হচ্ছে নেতৃত্বের সঙ্কট বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ সঙ্কট যেমন তাদের নিজেদের ঐক্যের ক্ষেত্রে, আদর্শের ক্ষেত্রে এবং সিভিল সোসাইটির একটি শক্তিশালী এক্টরে পরিণত হতে প্রতিবন্ধকতার জন্ম দিচ্ছে তেমনি দলকেন্দ্রিক মনগড়া অসত্য তথ্য দিয়ে পুরো জাতিকে বিভ্রান্ত করছে, বিভক্ত করছে।

৫. এনজিও (NGO) : স্বাধীনতাত্তোর বাংলাদেশে দেশি ও বিদেশি এনিজওদের কার্যক্রম শুরু হয় মূলত যুদ্ধবিধ্বস্ত জনগোষ্ঠীকে ত্রাণ ও পুনর্বাসন সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে। পরবর্তীতে তাদের কার্যক্রমে ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে। এনজিওদের কলেবরও ব্যাপক বৃদ্ধি পায়। এক হিসেবে দেখা গেছে যে, বর্তমানে বাংলাদেশে ৩০ হাজারেরও বেশি এনজিও সক্রিয় আছে।

সারণি-১

রেজিস্ট্রার্ড এনজিওদের মোট সংখ্যা *

প্রতিষ্ঠানের নাম	এনজিওর সংখ্যা
Association of Development Agencies of Bangladesh (ADAB), জানুয়ারি ২০০০	১০৭১
Department of Social Service (DSS), জানুয়ারি- ২০০১	২৩,৬২৩
NGO Affairs Bureau, জুলাই-২০০১	৮৪৫
Voluntary Health Service Society (VSS), জুন-২০০১	২০৭

* সূত্র ঃ বাংলাদেশ ব্যুরো স্ট্যাটিসটিক, ২০০২

Dhaka University Institutional Repository

স্বাধীনতাত্তোরকালে কার্যকর সিভিল সোসাইটির অনুপস্থিতিতে এনজিওরাই সিভিল সোসাইটির মূল চালিকাশক্তি হয়ে দাঁড়ায় বলে অনেক বিশেষজ্ঞ উল্লেখ করেন।[১৬] বিশেষ কিছু বৃহৎ এনজিও। যেমন ব্র্যাক, প্রশিকা, ও গ্রামীণ ব্যাংকের তৃণমূল পর্যায়ে লক্ষ লক্ষ গ্রাহক থাকায় তারা গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্য, শিক্ষা আর্থিক সক্ষমতা অর্জন প্রভৃতি ক্ষেত্রে একটি লক্ষণীয় ভূমিকা পালন করেছে। ফলে এ সমস্ত এনজিও বিশেষত ব্রাকের বিস্তৃত ও সংগঠিত গ্রামীণ সংগঠন থাকায় তারা গ্রামীণ পর্যায়ে উল্লেখযোগ্যভাবে সোশ্যাল ক্যাপিটাল অর্জনে জনগণকে সহায়তা করতে পারছে। এভাবে বাংলাদেশের সিভিল সমাজের মুখ্য এক্টর হিসেবে এনজিওরা তাদের অবস্থান সংহত করেছে। যদিও এনজিওদের এ ভূমিকা বিতর্কের উর্ধ্বে নয়।

প্রথমত-বৈদেশিক সাহায্য দাতা গোষ্ঠীর ফান্ডের ওপর নির্ভরশীল থাকায় অধিকাংশ এনজিওই তাদের কাজের জন্য রাষ্ট্রের কাছে দায়বদ্ধ না থেকে দাতা গোষ্ঠীর কাছেই দায়বদ্ধ থাকছে।

দ্বিতীয়ত-তারা জনগণকে যথাযথভাবে পলিসি মেকিংয়ে সহায়তা করতে পারছে না।

তৃতীয়ত-তারা দরিদ্রদের জন্য কাজ করলেও চরম দরিদ্রদের অনেকেই তাদের কার্যক্রমে নিজেদের অন্তর্ভুক্ত করতে ব্যর্থ হচ্ছে।

চতুর্থত-ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে তারা দরিদ্র জনগোষ্ঠীর অধিক সক্ষমতা অর্জনের কথা বললেও তাদের ঋণের সুদের হার অত্যন্ত চড়া, এমনকি সাধারণ ব্যাংক থেকে তা তিন চার গুণ বেশি।

পঞ্চমত-দাতাগোষ্ঠীর নির্দেশিত উন্নয়ন ইস্যু নিয়েই তারা প্রধানত কাজ করে। দেশীয় প্রয়োজনভিত্তিক ইস্যুগুলিতে তারা তেমন সক্রিয় নয়। এছাড়াও বলা যায়, নব্য ঔপনিবেশিক শাসন শোষণের আর এক অভিনব সংস্করণ এ NGO। পুঁজিবাদী বিশ্ব পুঁজি খাটিয়ে বিশ্বকে যেমন নিঃশ্ব করতে চায় তেমনি চায় করতলগত করে রাখতে। পিছিয়ে পড়া অদক্ষ জনসমাজ NGO-এর মাধ্যমে ঋণ গ্রহণ করে অনেক ক্ষেত্রেই ঋণ পরিশোধে ব্যর্থ হয়ে ভিটে মাটিসহ শেষ সম্বলটুকু চিরতরে হারিয়ে নিঃস্ব থেকে নিঃস্ব হয়ে যায়। অনেক ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক এক্টরের মাধ্যমে সামাজিক ও ধর্মীয় মূল্যবোধে প্রচণ্ড আঘাত হেনে বিদ্যমান সমাজকাঠামোতে ভাঙ্গন ধরায় যা কালান্তরে রাষ্ট্রকে দেউলিয়া করে দিতে পারে বলে বিশেষজ্ঞগণ মনে করেন। এমনও

১৬। Rahman A. and Razzaque A. "On Reaching Hardeore poor, Some Evidence on Social Exclusion in NGO Programmes" Bangladesh Development Studise Vol. 26, No. 1, pp. 1-36.2000

Dhaka University Institutional Repository

দেখা গেছে NGO সংগঠনগুলি তাদের স্বার্থে আঘাত আসার সম্ভাবনা দেখা দিলে জাতীয় রাজনীতি ও রাজনৈতিক নেতৃত্বকে ভ্রান্তপথে পরিচালিত করতে বা উৎখাত করতেও কার্পণ্য করে না। নবাব আমলের জগৎশেঠদের ষড়যন্ত্র আজও ইতিহাসের অমর সাক্ষি হয়ে আছে। মোটকথা সিভিল সোসাইটির এক্টর হিসেবে NGO এর মাধ্যমে নেতৃত্বে সঙ্কট নিরসন যেমন সম্ভব নয় বলেই মনে হয় তেমনি জাতীয় উন্নয়ন ও অগ্রগতির লক্ষ্যে সুসংসহত নেতৃত্ব গঠনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে সহায়তা করবে বলেও বিশ্বাস করা দূরহ।

৬. থিয়েটার সংস্থাসমূহ : সামাজিক সমস্যাসমূহ চিহ্নিত করে গণসচেতনতা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে বাংলাদেশের থিয়েটার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। জাতীয়, স্থানীয় ও গোষ্ঠীভিত্তিক থিয়েটারসমূহ বিনোদন বিতরণের মাধ্যমে নিরক্ষরতা দূরীকরণ, নারী নির্যাতন, নিরসন, সামাজিক অবক্ষয় ও মৌলবাদ প্রতিরোধসহ স্বৈরাচার বিরোধী চেতনা বিকাশে শহর থেকে পল্লী অঞ্চল পর্যন্ত জনগণের মানসপটে স্থায়ী প্রভাব ফেলতে সক্ষম হয়েছে। গ্রাম বাংলার যাত্রা, থিয়েটার, জারি, সারি গান কবির লড়াই ইত্যাদি সব সময়ই গ্রামীণ জনগণের বিনোদনের মূল মাধ্যম ছিল। এসব বিনোদনের মাধ্যমে যেসব মেসেজ দেয়া হয় তা সব সময়ই খুব ফলপ্রসূ বলে প্রমাণিত হয়েছে। অথচ রাজনৈতিক বিভাজনে আমাদের সংস্কৃতিক অঙ্গনও আজ নানা দল, উপদল, গ্রুপ ও জোটে বিভক্ত। ফলে তাদের কর্মকাণ্ড দল ও গোষ্ঠীর মনরঞ্জনে নিয়োজিত বিধায় প্রকৃত জাতীয় চেতনা কারও কর্মকাণ্ডে ফুটে উঠছে না। ফলে এ সকল সংস্থাসমূহের প্রতি মানুষের আস্থা দিন দিন কমে যাচ্ছে। সামাজিক চেতনা বিনির্মাণের হাতিয়ার বিভাজনের রাজনীতির শিকার হয়ে সমাজকে বিভ্রান্ত করছে ও বিভক্ত করছে। দেশ আজ জাতীয়তাবাদের প্রশ্নেও বিভাজিত। মানুষ বিভ্রান্ত, কারও ওপরই আস্থা রাখতে পারছে না। দেশের নেতৃত্ব আজ চেতনায় বিভক্ত, বিশ্বাসে বিভক্ত। লেজুড়বৃত্তির সংস্কৃতি দেহ-মনে-চিন্তায়-চেতনায়, ভাব-ভঙ্গিমায়, আচার-আচরণে, চাল-চলনে ও বড়মাপের নেতা সৃষ্টির অন্তরায় হয়ে আছে বলে বিজ্ঞজনের ধারণা। মোটকথা সংস্কৃতিক অঙ্গনের দৈন্যদশা নেতৃত্বের সঙ্কটের প্রধানতম কারণ বললে অত্যুক্তি হবে না।

পরিশেষে বলা যায়, বাংলাদেশের সুশীল সমাজ বা সিভিল সোসাইটির যদিও অনেক ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে তাদের কল্যাণে বিভিন্ন সামাজিক সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে দেশ এগিয়ে

Dhaka University Institutional Repository

যাচ্ছে তাদের নেতৃত্বে আপামর জনসাধারণের দুর্বার সমস্যার কিছুটা লাঘব হচ্ছে তথাপি সমস্যার পাহাড় জাতির কাঁধে পাথরচাপার মতোই বিদ্যমান। চাই এর অবসান। তবে একথা সত্য যে উন্নয়নশীল দেশসমূহে উন্নত দেশসমূহের তুলনায় সন্ত্রাস, দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি, দলীয়করণ মৌলিক অধিকারহরণ, নারী-শিশু ও সংখ্যালঘু নির্যাতন, সামরিক বেসামরিক, আমলাতান্ত্রিক, শাসন-শোষণ ইত্যাদি বেশি বিধায় এসব দেশে সিভিল সোসাইটির ভূমিকা তুলনামূলকভাবে বেশি ও দৃঢ় হওয়াই প্রত্যাশিত।[১৭] এ কথা মিথ্যে নয় যে, বাংলাদেশের সিভিল সোসাইটি আমাদের সকল প্রগতিশীল, গণতান্ত্রিক, জাতীয়তাবাদী ও আধিপত্যবাদ বিরোধী আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন সন্দেহ নেই। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও সত্য যে, ব্যক্তিগত ও সামষ্টিকভাবে এঁরা অনেক কাম্য ভূমিকা পালনে সক্ষম হননি। সিভিল সোসাইটির সুবিধাবাদীতা স্বার্থপরতা, আপসকামিতা, কথা ও কাজের পার্থক্য, সময় ও স্থান বুঝে বক্তব্য দান সম্ভবতঃ সব সময়ই কমবেশি পরিলক্ষিত হয়েছে। "সিয়াসতনামা"মূলক তাঁর "নিজামুল" গ্রন্থে লিখেছেন : তিনিই উত্তম শাসক যিনি বুদ্ধিজীবীদের সান্নিধ্যে থাকেন। আর তিনিই নিকৃষ্টতম বুদ্ধিজীবী যিনি শাসকদের সান্নিধ্য কামনা করেন। মহাত্মা গান্ধী স্বাধীন ভারতের দুর্দশার জন্য শিক্ষিত প্রশাসক যাঁদের অনেকেই সিভিল সোসাইটির অংশ দায়ী করে বলেছেন The heart of Inidas problems is the heartlessness of her educated people. বিভিন্ন উন্নয়নশীল দেশে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা ব্যর্থ হওয়ার জন্য ওইসব দেশের শিক্ষিত, প্রশিক্ষিত ও তুলনামূলকভাবে উন্নত জীবনমানের অধিকারী রাজনৈতিক শ্রেণীর (Political Class) অগণতান্ত্রিক মানসিকতাকেই প্রধানত দায়ী করেছেন। নেতৃত্বের সঙ্কটের মূলে সিভিল সোসাইটির অযোগ্যতা, অদূরদর্শিতা, স্বার্থপরতা, আপসকামিতা, স্বার্থবিরোধিতাকেই চিহ্নিত করেছেন। প্রত্যাশা এই যে, আমাদের সিভিল সোসাইটির বাংলাদেশের সার্বিক উন্নয়ন বিশেষত, দুর্নীতি ও সন্ত্রাসমুক্ত, সমৃদ্ধ বাংলাদেশ তথা স্বদেশের শান্তি, সুস্থিতি ও নেতৃত্বের সঙ্কট নিরসনে কাঙ্ক্ষিত ভূমিকা পালনে ব্রতী হবেন।

---

[১৭]। মোহাম্মদ, ড. হাসান; বাংলাদেশের ধর্ম ও রাজনীতি, পৃষ্ঠা -১৬৩

Dhaka University Institutional Repository

ষষ্ঠ অধ্যায়

নেতৃত্বের সংকট নিরসনের উপায়

Dhaka University Institutional Repository

ষষ্ঠ অধ্যায়

নেতৃত্বের সংকট নিরসনের উপায়

ভূমিকা :

বাঙালি জাতীয়তাবাদী নেতার আলোচনা প্রসঙ্গে সবার আগেই স্মরণ করতে হয় শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক, হোসেন শহীদ সোরওয়ার্দী, মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কথা। বৃটিশ বিরোধী আন্দোলনে শের-এ-বাংলার অবদান যেমন কিংবদন্তীতুল্য তেমনি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তান বিরোধী আন্দোলনের মাধ্যমে হয়ে উঠেছেন স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি। স্বাধীনতাত্তোর বাংলাদেশে দেশ গড়ার ক্ষেত্রে সুযোগ্য নেতৃত্বের আজও বেশ অভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে। দেশ গড়ার নেতৃত্বের যে সংকট তার কারণ বিশ্লেষণ করে প্রতিকার নির্ণয়ের মাধ্যমে এ অধ্যায়ে নেতৃত্বের সংকটনিরসনের উপায় তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে।

১. নেতৃত্বের নীতিবাদ, গণতন্ত্রায়ন ও বিকেন্দ্রিকরণঃ তৃতীয় বিশ্বের অন্যান্য অনেক দেশের মতো বাংলাদেশে নেতৃত্বের ক্ষেত্রে নীতিহীনতা একটা মৌলিক সমস্যা। পরাধীনতা ও দীর্ঘ ঔপনিবেশিক শাসন ও শোষণের মধ্যে তৃতীয় বিশ্বের জনগণ রাজনীতিতে নির্যাতন, নিপীড়ন অপপ্রচার, মিথ্যা অপবাদ, ভয়াল রক্তচক্ষু প্রদর্শনের মতো যাবতীয় অপকর্মের সঙ্গে পরিচিত হয়েছেন শতাব্দির পর শতাব্দি। সর্বগ্রাসী অভাব যার মূল কারণ ঘৃণ্য স্বৈরশাসন এবং শিক্ষা বা সুশিক্ষা থেকে আজও বঞ্চিত থাকার বঞ্চনা, যা আজও বিদ্যমান এর ফলশ্রুতিতে জাতিগঠন অসম্পূর্ণ থেকে গেছে। জাতীয়তাবাদী চেতনা ও বঞ্চনার মনবেদনা থেকে জাগ্রত আবেগ মাঝে মাঝে আমাদের ঝাঁকুনি দেয়। ফলে নীতি-আদর্শ, দেশপ্রেম ও চেতনার সুনামি দেখা দেয়। কিন্তু কালের ধারায় আবার তা হারিয়ে যায়। অথবা রাজনৈতিক নেতৃত্বের চেতনাপুষ্ট ইস্পাত কঠিন মনোবল প্রদর্শনের অভাবে ধরে রাখা সম্ভব হয় না মানুষের জাগ্রত মহৎ ও মহান চেতনাকে। ফলে জাতিগঠন প্রক্রিয়া প্রারম্ভিক পর্যায়ে বা অসম্পূর্ণ রয়েগেছে। জাতির নেতৃত্বের নীতিহীনতা একটি কেন্দ্রীয় বিষয়। দীর্ঘ ঔপনিবেশিক শাসন শোষণের ফলে জনসংখ্যা ও সম্পদের অনুপাতের মারাত্মক অসামঞ্জস্য বা অসমতা বিদ্যমান। ফলে সমাজে সম্পদ আহরণের প্রতিযোগিতায় নীতিহীনতা মারাত্মক ক্ষতিকর উপাদান। এছাড়াও নব্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত এ সকল রাষ্ট্রে যেমন বাংলাদেশে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক বা সামাজিক পরিবর্তনের মূল

Dhaka University Institutional Repository

চালিকাশক্তিই (Prime mover of Social change) হলো রাষ্ট্র। দেশের বুর্জোয়া শ্রেণীর কার্যকলাপ বিশ্লেষণ করলে এটা স্পষ্ট হয়ে যায়।

পাশ্চাত্যের বুর্জোয়া বিপ্লব গড়ে ওঠে নিম্ন ধাপ থেকে। চাপা উত্তেজনাপূর্ণ সমাজে বিভিন্ন সৃজনশীল ক্ষমতার উদ্ভবের ফলে সেখানে বিপ্লব ঘটে থাকে। কিন্তু তৃতীয় বিশ্বের বুর্জোয়া শ্রেণী রাষ্ট্র কর্তৃক পরিচালিত ওপর থেকে চাপিয়ে দেয়া কৃত্রিম বিপ্লবের জন্ম দেয়। ব্যক্তিগত উদ্যোগ এবং ব্যবসায়ীদের ঝুঁকিপূর্ণ প্রয়াসের (entrepreneurship) চেয়ে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা (State patronage) তৃতীয় বিশ্বের শিল্পায়নের প্রধান উপাদান। বিশেষ করে 'মুক্ত' পৃথিবী 'ফ্রি ওয়ার্ল্ড' অন্তর্ভুক্ত তৃতীয় বিশ্বের সামরিক ও বেসামরিক নেতারা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ব্যবহার করে দেশীয় সনাতন ব্যবসায়ী, বিদেশের কোম্পানির এজেন্ট, অন্যের সম্পত্তির অবৈধ গ্রাসকারী, লুণ্ঠনকারী, শাসককুলের আত্মীয়স্বজন ও দলের সমর্থকদের মধ্যে নানা রকম সুবিধা বন্টন করে একটা বুর্জোয়া শ্রেণী গড়ে তোলে। এছাড়াও আমদানি-রপ্তানির জন্য লাইসেন্স দেয়া, বিদেশি অর্থ সাহায্যে বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন এবং রাস্তাঘাট নির্মাণ ও অন্যান্য শিল্প অবকাঠামো তৈরির ঠিকাদারি দিয়ে একশ্রেণীর দুর্নীতিপরায়ণ ও ধনিক শ্রেণী তৈরি করা হয়। এজন্য শিল্পপতি ও ধনী ব্যক্তিরা তাদের ধনসম্পদ অর্জন ও রক্ষা করার প্রয়োজনে রাজনৈতিক নেতাদের সঙ্গে অবৈধ অর্থনৈতিক সম্পর্ক গড়ে তোলে এবং অনেকে সরাসরি রাজনীতিতে নেমে পড়ে। তথাকথিত শিল্পমালিক ও ধনিক শ্রেণী ব্যবসায়িক স্বার্থ অনুকূল রাখার জন্য তাদের সহজলব্ধ ধনসম্পদ দ্বারা আমলাদের সঙ্গেও আঁতাত গড়ে তোলে। এভাবে তারা সন্ত্রাসীদের লালন পালন করতেও রাজনীতিবিদদের অর্থসাহায্য করে থাকে। রাজনৈতিক সমর্থন ও রাজনীতির মধ্যদিয়ে ধনি হওয়ার এ পর্যায়ে, রাজনীতি ও অর্থনৈতিক দ্বন্দ্ব অনেকটা যুদ্ধক্ষেত্রের তুল্য হয়ে উঠে। সকল রাজনৈতিক মূল্যবোধ ধ্বংস হয়ে যায়। সন্ত্রাস ও পেশিশক্তির মূল্য অনেক বেড়ে যায়। রাষ্ট্রে জোর যার মুল্লুক তার অবস্থার সৃষ্টি হয়। ফলে নির্বাচিত সরকারের বৈধতা জনদৃষ্টিতে নিম্নমানের পর্যায়ে থাকে এবং সাধারণভাবে দেশে নৈরাজ্যকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। রাজনৈতিক নেতা, আমলা, সামরিক বাহিনী, রাজনীতিতে সম্পৃক্ত জনগণ (Politically releavent people) স্বাভাবিক সকল প্রকার সততার প্রতি সন্দেহ (cynicism) প্রকাশ করতে থাকে। এ cynicism এর অবশ্যম্ভাবী পরিণাম হয় সর্বস্তরে দুর্নীতিতে নীতিহীনতার প্রসার। আর দুর্নীতি বা নীতিহীনতার মতবাদ যতই বিস্তৃতি লাভ করতে থাকে cynicism এর মাত্রা ততই বাড়তে থাকে। রাজনীতি হয়ে পড়ে একেবারে ক্লেদযুক্ত। অর্থনৈতিক পথে রাজনৈতিক ক্ষমতা

Dhaka University Institutional Repository

লাভ, পেশিশক্তির ব্যবহার আর সর্বগ্রাসী দুর্নীতির দুষ্টচক্র (Vicios circle) সমাপ্ত উন্নয়নশীল দেশকেই গ্রাস করে ফেলে। ফলে গণতন্ত্র ও গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক নেতৃত্বের সুষ্ঠু বিকাশ সম্ভব হয় না। পরিবর্তে হয় সামরিক শাসন না হয় "Illiberal Democracy" র আবির্ভাব ঘটছে।[১] যেহেতু "রাজনীতি সকল ক্ষমতার উৎস" তাই রাজনৈতিক নেতৃত্ব ষড়যন্ত্র, স্বৈরাচার আর দুর্নীতির মাধ্যমে পাকাপোক্তভাবে ক্ষমতায় টিকে থাকার আপ্রাণ চেষ্টা চালায়। ক্ষমতার কেন্দ্রে নেতৃত্বের এ নির্লজ্জ প্রতিযোগিতা রাজনৈতিক দলগুলির সাধারণ ব্যাপার মাত্র। কেন্দ্র থেকে প্রান্তে বা স্থানীয় সরকারগুলিতেই সরকারের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, প্রতিনিধি নেতৃত্বের নৈতিকতা বোধ বিসর্জন দিতে যেমন উৎসাহিত হয় তেমনি নীতি, আদর্শ ও মূল্যবোধকে আঁকড়ে ধরতে বিপন্নবোধ করেন।

কাজেই আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়, রাজনীতিকে অর্থনৈতিক প্রলোভন, দুর্নীতিপরায়ণতা থেকে মুক্ত করে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধে পরিপুষ্ট হতে হবে। মানুষের মেধা, প্রজ্ঞা ও জ্ঞাননির্ভর চিন্তা চেতনায় উজ্জীবিত নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে হবে। রাজনৈতিক নেতাদেরকে সর্বাগ্রে নীতি ও আদর্শ যেমন অন্তরে তেমনি বাইরেও লালন করতে হবে। জীবনের বাস্তব কর্মকাণ্ডে তার প্রকাশ ঘটাতে হবে। কেন্দ্র থেকে প্রান্ত পর্যন্ত এ আদর্শ ও দর্শন ছড়িয়ে দিতে হবে। রাজনীতিবিদদের যতটা সম্ভব অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড থেকে দূরে থাকতে হবে। তাহলে যথার্থ তদারকির (Monitroing) মাধ্যমে অর্থনীতির চাকা গতিশীল করা যাবে। রাজনৈতিক নেতৃত্বের সঙ্গে সঙ্গে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রের দৃষ্টান্তমূলক অর্থনৈতিক ব্যক্তিত্ব প্রতিষ্ঠান ও দিকনির্দেশনাকারী নেতৃত্ব গড়ে উঠবে। সমাজের সর্বক্ষেত্রে নেতৃত্বের সংকট দূর হবে।

২. নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠায় স্থানীয় সরকারের ভূমিকা : বাংলাদেশে সম্প্রতি প্রবর্তিত উপজেলা পূর্বতন থানার আয়তন নিয়ে গঠিত হলেও প্রশাসনিক রূপটি অনেক শক্তিশালী। গ্রামীণ অর্থনীতির চাকা ঘুরাতে গ্রাম বাংলার ঘুমন্ত মানুষকে জাগাতে উপজেলা একটি যুগান্তাকারী সংস্কার হিসেবে সুধীমহলে স্বীকৃত হওয়া সত্ত্বেও প্রতিহিংসার বশবর্তী হয়ে বিগত বিএনপি সরকার (১৯৯১-৯৬) উপজেলা ব্যবস্থা বিলোপ করলেও জনগণের প্রবল ইচ্ছায়ও সুশীল সমাজের, দেশপ্রেমিক মানুষের দাবিতে পুনরায় উপজিলা প্রবর্তিত হয়েছে। উপজেলা পেয়েছে তার নির্বাচিত চেয়ারম্যান, ২ জন ভাইস চেয়ারম্যানের কারণে উপজেলায় নারীর ক্ষমতায়ন মোটামুটি

১। বাংলাদেশের রাজনীতি : সঙ্কট ও বিশ্লেষণ, তালুকদার মনিরুজ্জামান, পৃষ্ঠা-১২২।

Dhaka University Institutional Repository

প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পেল। যোগাযোগ ঋণ বিতরণ, সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহ স্থাপন ইত্যাদির ফলে একটি থানা অপেক্ষা উপজেলা অনেক বেশি শক্তিশালী ও গতিশীল। কতগুলি ইউনিয়ন নিয়ে উপজেলা গঠিত। প্রতিটি ইউনিয়নই হচ্ছে বাংলাদেশের প্রশাসনিক কাঠামোর সর্বনিম্ন স্তর। ইউনিয়নে ও উপজিলায় নির্বাচিত চেয়ারম্যান থাকবেন উপজেলা চেয়ারম্যানের ক্ষমতা যেটুকু ছিল তা বর্তমানে খর্ব করা হয়েছে। মূলত. স্থানীয় নেতৃত্বের প্রতি কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের অজানাভীতির কারণে এবং আমলাদের চাপের কারণে এমন হচ্ছে। বাংলাদেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার এবং দিনে দিনে যোগ্য নেতৃত্ব গড়ে তোলার সর্বাপেক্ষা কার্যকরী প্রতিষ্ঠান উপজেলার ক্ষমতা কিছুটা খর্বাবস্থায় বর্তমানে প্রচলিত আছে। গণতান্ত্রিক চেতনা, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ও প্রগতিশীল নেতৃত্বের ব্যাপারে নিস্পৃহতাই এমন অবস্থার জন্য দায়ী। স্থানীয় নেতৃত্বই একদিন জাতীয় নেতৃত্বে পরিণত হয়। স্থানীয় পুঁজির বিকাশই একদিন জাতীয় অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। বস্তুত পুঁজিপতির পুঁজিলগ্নীকে আরও সুসংহত, নিয়মানুগ, শৃঙ্খলিত করার জন্যই উপজেলার প্রয়োজন। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের মূল উদ্দেশ্য জনগণকে জাতীয় উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত করানো। বাংলাদেশের একটি গ্রাম প্রকৃতপক্ষে টেকসই ইউনিট (Viable Unit) হয় না। অধিকাংশ পল্লী বিশেষজ্ঞদের মতে, উপজেলা পরিষদ উন্নয়নের মূল কেন্দ্রবিন্দু হওয়া উচিত। উপজেলা পরিষদের মতো আয়তন বিশিষ্ট স্থানীয় সরকারের ইউনিট, উন্নয়ন কাজের (Basic Geogrophical Unit) হতে পারে। পলী উন্নয়ন পরিকল্পনার কেন্দ্রবিন্দু হবে উপজেলা পরিষদ। যাই বলা হোক না কেন, স্বয়ংসম্পূর্ণ স্থানীয় সরকার পরিচালনার জন্য উপজেলা পরিষদ হবে আদর্শ অঞ্চল বা ইউনিট। কারণ Upazilla is neither big nor too small unit for proper planning of rural development .[২] উপজেলার মাধ্যমে কৃষিতে আরও অধিক পরিমাণে ঋণ বিনিয়োগে এবং যন্ত্রপাতির ব্যবহার বেড়েছে। রাষ্ট্রের উন্নয়ন বাজেটের নির্দিষ্ট অংশ বরাদ্দ পাবে উপজেলা পরিষদ। গ্রামীণ যোগাযোগ বৃদ্ধি পাচ্ছে। যারা কখনো নিজেদের ভবঘুরে গ্রামীণ সর্বহারার বাইরে নিতে সক্ষম হয়নি তারা বিভিন্ন সাহায্যকারী সংস্থা এবং সরকারি সংস্থার মাধ্যমে এখন "সমবায়ী শ্রমিক" সমবায়ী সর্বহারায় রূপান্তরিত করতে পারছে। সোভিয়েট কমিউনগুলোর প্রকৃতি প্রায় একই প্রকার। চীনের কমিউন ছিল মোটামুটি আয়তনে উপজেলার মতো। এখানে নিয়োজিত ব্যক্তিদের সংগঠন ছিল। পার্টির অস্তিত্ব পৃথক। উৎপাদন ও বণ্টন ছিল সমবায়ভিত্তিক

২। প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-১৯-২০।

Dhaka University Institutional Repository

যেমন উৎপাদন তেমন বন্টনকে কিভাবে পাবে তা পূর্ব নির্ধারিত।[৩] ক্ষুদ্রতম প্রশাসনিক একক হিসেবে রাশিয়ায় সোভিয়েত, চীনের কমিউন এবং বাংলাদেশের উপজেলার মধ্যে নেতৃত্বের পরিপ্রেক্ষিতে সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্য বিদ্যমান থাকলেও-বাংলাদেমের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রেক্ষাপটে উপজেলা একটি কার্যকর উৎপাদন ইউনিট হওয়ার সকল যোগ্যতা বহন করে। যদিও আমাদের দেশে জনগণের সচেতনতা ও নির্বাচনের স্বচ্ছতার অভাব রয়েছে তবুও বিদ্যমান ত্রুটি দূর করতে পারলে নেতৃত্ব তৈরিতে এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নে গ্রাম প্রধান বাংলাদেশে উপজেলা পরিষদ মডেল হিসেবে গণ্য হতে পারে। পদ্ধতি যত সুন্দর হোক না কেন তার প্রয়োগনিষ্ঠার ওপর সাফল্য নির্ভর করে। ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণের মাধ্যমে দেশব্যাপী মাটি ও মানুষের যোগ্য নেতৃত্ব তৈরির "আঁতুরঘর" উপজেলা পরিষদ। নগরায়ন, শিল্পায়ন ও পল্লী উন্নয়নের ত্রিবেণী ছিল উপজেলা যা উৎপাদন বৃদ্ধি করে প্রথমত. পল্লী উন্নয়ন অতঃপর জাতীয় উন্নয়ন ঘটাতে সক্ষম হয়েছিল এবং ভবিষ্যতেও হবে। আর জনপ্রতিনিধিদের শাসনের মধ্যদিয়ে গণতান্ত্রিক নেতৃত্ব বিকশিত হবে সঙ্গে সঙ্গে আমলতান্ত্রিক জটিলতা, গতিহীনতার স্থলে সমাজজীবনে দ্বায়বদ্ধতা ও গতিশীলতা ফিরে আসবে।

৩. নেতৃত্বের সঠিক চিন্তাধারা : রুশ কমিউনিস্ট পার্টি বলশেভিকও মেনশেভিক দুভাগে বিভক্ত হয়েছিল। মূল কারণ ছিল যে, মেনশেভিকরা মনে করতেন সর্বহারা শ্রেণী বিপ্লবী শ্রেণী নয়। সন্ত্রাসবাদকে সমর্থন করতেন তাঁরা, তারা ভাবতেন, আলগা ধরনের একটা সংগঠনই বিপ্লবী পার্টির আদর্শ নয়। লেনিন দেখালেন সর্বহারা শ্রেণীই মূল বিপ্লবী শ্রেণী, সন্ত্রাসবাদ নয়, বিপ্লবীপন্থাই শ্রেয়, আর সুসংবদ্ধ দৃঢ় শৃঙ্খলায় আবদ্ধ পার্টিই বিপ্লবী পার্টির আদর্শ নমুনা। এ ধারণা নিয়ে বলশেভিক পার্টি লেনিনের নেতৃত্বে সত্যিকার বিপ্লব সম্পন্ন করতে পারলেন। চৌ-এনলাই, চু-তে প্রমুখ যখন মুখোমুখি যুদ্ধ ঘোষণা দিলেন মাও সেতুং তার বিরোধিতা করলেন। মাও সেতুংয়ের বক্তব্য ছিল এই, এখনো গেরিলা যুদ্ধ চালাতে হবে কারণ, পার্টির নিয়মিত বাহিনী যথেষ্ট শক্তিশালী নয়। ফলে মাওকে সেনাবাহিনীর নেতৃত্ব থেকে সরিয়ে দেয়া হল। বছর দুয়েক যুদ্ধের পর যখন নিয়মিত বাহিনী যথেষ্ট বিজয় অর্জনে ব্যর্থ হলো তখন তারা মানলেন যে, মাও সেতুং এর বক্তব্য সঠিক ছিল।

উল্লিখিত উদাহরণ থেকে বোঝা গেল, সঠিক ধারণাই নেতৃত্বের মূল কথা। গভীর পাণ্ডিত্য, নিষ্ঠা ও দেশপ্রেম দ্বারাই সঠিক নেতৃত্ব বিকাশিত ও অর্জিত হয় না। কেন মাও সেতুং ও লেনিনের

৩। সোপানভ, ষষ্ঠ বর্ষ প্রথম সংখ্যা, জুন-১৯৮৮, পৃষ্ঠা-১৫-১৬।

Dhaka University Institutional Repository

মতো সঠিক চিন্তাধারা নিয়ে কোন নেতৃত্ব আমাদের দেশে সৃষ্টি হল না? তাঁদের অধ্যবসায়, অধ্যয়ন, রচনাবলী, দূরদৃষ্টি, আন্তরিকতা ও পরিশ্রমের অন্যন্য উদাহরণকে আমাদের দেশের কোন নেতা কি অবলম্বন করেছেন? শুধু রচনার কথাই যদি ধরা যায় তবে দেখা যায়, সোহরাওয়ার্দী, শেরে বাংলা, ভাসানী, মুজিব থেকে শুরু করে বুর্জোয়া ও কমিউনিস্ট নেতারা লিখেছেন খুবই কম অথবা লেখেননি আদৌ।[৪] একদা ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী উইনস্টোন চার্চিলকে এক সাংবাদিক জিজ্ঞেস করেছিলেন, অন্য সবার থেকে আপনার চিন্তাভাবনা সর্বদা একটু এগিয়ে থাকে এটা কি করে সম্ভব বলে আপনি মনে করেন? জবাবে চার্চিল বলেছিলেন- "অন্য সকলে যখন কাজকর্মে পড়ালেখায় ব্যস্ত থাকে তখন আমিও তাদের মতই ব্যস্ত থাকি। কিন্তু তারা যখন ঘুমিয়ে থাকে তখনও আমার পড়ালেখা চিন্তাভাবনা চলতে থাকে বলেই হয়তোবা সকলের চেয়ে আমার চিন্তাভাবনা একটু অগ্রগামী থাকে।" নেতৃত্বের ধরন সাম্যবাদী ধারার হোক বা বুর্জোয়া ধারার হোক না কেন, সঠিক ধারণার নেতৃত্বের পেছনে প্রয়োজন সাধনা, অধ্যয়ন, গবেষণা ভাবনা, অনুভব, লিখন, দূরদৃষ্টি, আন্তরিকতা ও কঠোর পরিশ্রম। যা বাংলাদেশে ইতোপূর্বে পরিদৃষ্ট হয়নি। সম্ভাবনা খুব একটা আছে বলে মনে হয় না। বর্তমান নেতাদের হয়ে দেখা যায়, তাদের ভাড়াটে বুদ্ধিজীবীরা লেখেন। নেতৃত্বের অন্তর্গত আলোর বিচ্ছুরণ, এ প্রক্রিয়ায় কি আদৌ সম্ভব? আমাদের বর্তমান নেতৃত্বের মধ্যে আপসকামিতা, স্বার্থপরতা, পরশ্রীকাতরতা, কুৎসা রটনা ও অপরের দোষ বর্ণনায় সত্যমিথার আশ্রয় নিয়ে যে ভঙ্গিমা প্রকাশ পায় তা অপরকে খাট তো করেই নিজের ক্ষুদ্রতাকেও উন্মুক্ত করে দেয় জনসমক্ষে।

স্বাধীনতাত্তোর বাংলাদেশের রাজনীতিতে নেতৃত্বের সঠিক চিন্তার প্রকাশ দেখা যায় না বললেই চলে। একটি স্বাধীন দেশ গড়ে তোলার মতো প্রজ্ঞা নেতাদের কর্মকাণ্ডে দারুণ অভাব ছিল বরাবরই। বাংলাদেশের স্বাধীনতার স্থপতি শেখ মুজিবকে যতদূর দেখা যায়, দেশহিতকামী আকাঙ্ক্ষা নিয়ে তাঁর রাজনীতি শুরু হয়নি। পঞ্চাশের দশকে মন্ত্রীত্বেরকালে তাঁর বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ ছিল প্রবল। দ্রুত গড়ে তুলেছিলেন প্রচুর ব্যক্তিগত সম্পত্তি। সম্পত্তি অর্জনের পর ষাটের দশকে তাঁর ধনাত্মক রাজনীতি শুরু হয়। ক্ষমতার উদগ্র আকাঙ্ক্ষা ছিল তাঁর। কিন্তু সে ক্ষমতাকে তিনি যৌক্তিকভাবে জনগণের মঙ্গলের জন্য কামনা করতেন বলে মনে হয় না। তাঁর প্রমাণ তিনি ক্ষমতা অর্জন করে মুজিববাদ কায়েম করতে চাইলেন, চাইলেন নিরঙ্কুশ

৪। প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৩৬।

Dhaka University Institutional Repository

স্বৈরতন্ত্রী বাকশাল কায়েম করতে। ১৯৭২ সালে যখন তিনি সমাজতন্ত্রকে অবস্থার চাপে গ্রহণ করতে বাধ্য হন, তখন আমরা দেখি তার সে সমাজতন্ত্র মার্কসবাদ বিরোধী। ক্ষমতা গ্রহণের পর মানুষ তাঁর কাছে চেয়েছে ন্যায়ের শাসন, অত্যাচারের মূল উৎপাটন, সে আশায় তাঁকে তারা গ্রহণ করেছি বঙ্গবন্ধু হিসেবে; কিন্তু তিনি চেয়েছেন লাল ঘোড়া দাবড়াতে, চেয়েছেন একনায়কতন্ত্র, তাঁর সরকার হয়েছে চরম অত্যাচারী, দুর্নীতিবাজ।[৫] কাজেই দেখা যায়, সঠিক নেতৃত্বের সঠিক সিদ্ধান্ত এখানে অপ্রতুল।

এরপরও বাংলাদেশে ললাট লিখন পরপর দুটি সামরিক স্বৈরাচার। তারা প্রথমে ক্ষমতা কুক্ষিগত করেছে। অতঃপর প্রলোভন দেখিয়ে, সুযোগ সুবিধা দিয়ে দলছুট নেতা, বঞ্চিত নেতা, বেকার নেতা, ধূর্ত নেতাদের নিয়ে দল গঠন করেছেন, দেশ পরিচালনা করেছেন। ফল যা হবার তা হয়েছে। নেতৃত্ব প্রদানের মাধ্যমে সাফল্যের পথ ধরে নেতার আসন অলংকৃত করার যে নেতৃত্ব তাঁর সঙ্গে সামরিক নেতৃত্বের ব্যবধানটা হলো- সামরিক নেতৃত্ব হলো অবরোহণ প্রক্রিয়া, যেখানে গণতান্ত্রিক নেতৃত্ব হলো আরোহন প্রক্রিয়া। এ বিপরীতধর্মী নেতৃত্বের মধ্যে পরবর্তীটাই রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সূত্র সমর্থিত প্রথমটি নয়। এক্ষেত্রে সমস্যা হলো পরীক্ষা দেয়ার আগেই পাস করে ফেলার মতো অবস্থা। চাটুকর, তোষামোদকারী চক্রবেষ্টিত নেতৃত্বের এ ধারার সাফল্যের হার খুবই কম। নেতৃত্বের সঠিক চিন্তার প্রকাশ এক্ষেত্রে বিরল বললে অত্যুক্তি হবে না।

বাংলাদেশে বিগত দেড় দশক ধরে কেবল উত্তরাধিকারের রাজনৈতিক নেতৃত্বই পরিলক্ষিত হচ্ছে যা গণতন্ত্রের পরিপন্থী। ভাবাবেগ সর্বস্ব। জাতির সর্বনাশ যা হওয়ার তা সম্পন্ন হতে আর বাকি আছে বলে মনে হয় না। উপরিউল্লিখিত ঘটনা ও দৃষ্টান্ত থেকে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়, বাংলাদেশকে নেতৃত্বের সংকট থেকে মুক্তি পেতে হলে বর্তমান ও ভবিষ্যত নেতাদেরকে অবশ্যই সঠিক চিন্তাধারায় এগুতে হবে। নেতাদের কোন প্রকার অলৌকিক আবেগ সর্বস্ব বিষয় বলে মনে করলে চলবেনা।

৪. নেতৃত্বের প্রক্রিয়া : সঠিক নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা ও নেতৃত্বের সংকটনিসরন করতে হলে অবশ্যই নেতৃত্বকে একটি বিজ্ঞানভিত্তিক প্রক্রিয়ায় অগ্রসর হতে হবে। সাম্যবাদী বা পুঁজিবাদী যে সমাজেই হোক না কেন নেতৃত্বকে একটি প্রক্রিয়ার মধ্যদিয়ে চূড়ান্ত পরিণতিতে উপনীত হতে হবে। কারণ, ব্যক্তির মাধ্যমেই হোক অথবা ধারণার মাধ্যমেই হোক, যখন কোন নেতৃত্ব

৫। প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৩৪-৩৫।

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিষ্ঠিত হয় তখন একটি প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়। প্রকৃতপক্ষে যখনই আমরা কোন নেতৃত্বকে বৈজ্ঞানিকভাবে ব্যাখ্যা করতে ব্রতী হই, তখন তাকে একটি প্রক্রিয়া হিসেবেই দেখতে পাই। নেতৃত্বকে একটি প্রক্রিয়া বা বিজ্ঞান হিসেবে গ্রহণ করার সঙ্গে সঙ্গেই নেতৃত্ব সম্পর্কে আরোপিত সকল ধরনের দেবত্ব, অলৌকিকত্ব, অসাধারণত্ব ইত্যাদির স্থলে আয়াসসাধ্য, সৃজননির্ভর, মানবীয় ধারণা ঠাঁই করে নেয়।

আমরা যদি চীন কিংবা রাশিয়ার নেতৃত্বের মূল প্রক্রিয়াটি প্রত্যক্ষ করি তবে দেখা যাবে নেতৃত্বের তিনটি পর্যায় রয়েছে।

প্রথম পর্যায় : বাস্তব অবস্থাসমূহ অর্থাৎ উন্নয়ন প্রকল্প, মানবিক মানসিক-সমস্যা, প্রস্তাবনা, প্রবণতাসমূহ। এগুলো সাধারণ মানুষের মধ্যে, সাধারণ বাস্তব পরিস্থিতির মধ্যে বিরাজমান থাকে। এসব বিষয় হলো কোন দেশের সামগ্রিক সমস্যা ও উন্নয়ন প্রবণতার বাস্তব ছবি। এ বিষয়গুলো বিভিন্ন মাধ্যমে গৃহীত হয়ে দলের গবেষণাকার্যে ব্যবহৃত হয়।

দ্বিতীয় পর্যায় : কমিউনিস্ট পার্টিগুলোর পলিটব্যুরো ও অন্যান্য উচ্চতম পরিষদে বাস্তব অবস্থাসমূহ পর্যালোচনা হয় এবং তার সারমর্ম স্থির করে।

তৃতীয় পর্যায় : পার্টির দ্বারা স্থিরীকৃত সূত্রাবলী, সাধারণ ও স্থানীয় পরিষদ, কমিউন বা সোভিয়েতসমূহে আলোচিত হয় এবং পুনরায় কেন্দ্রীয় কমিটির উচ্চতম পরিষদসমূহে চূড়ান্ত ভাবে সূত্রায়িত হয় অথবা পরিকল্পিত হয়।

উপরে বর্ণিত সামগ্রিক প্রক্রিয়াটির মধ্যে বহু পর্যায়ের ব্যক্তি বা সমষ্টির মতামত দ্বারা মূল নেতৃত্বের নীতি ও কর্মসূচি চূড়ান্ত করা হয়। এ ব্যক্তিদের মধ্যে আছেন ঃ অসাধারণ এবং সাধারণ ব্যক্তিরা। এছাড়া রয়েছেন বিশেষ ব্যক্তিরা, মাঝারি মেধা, বা ক্ষমতা সম্পন্ন, স্বল্প মেধাসম্পন্ন বা ক্ষমতা সম্পন্নরা। একজন সাধারণ ব্যক্তির দৃষ্টিতে অসাধারণের অংশগ্রহণ অসাধারণ পর্যায়ের মর্যাদাপ্রাপ্ত হয় কিন্তু সাধারণ অসাধারণ বা অন্যান্য প্রত্যেক ব্যক্তিই এ প্রক্রিয়ায় তার সাধারণ ভূমিকা পালন করে মাত্র।

এ প্রক্রিয়ায় নেতৃত্ব সর্বাপেক্ষা গণতান্ত্রিক, সর্বাপেক্ষা অতিমানবীয়তার প্রভাবমুক্ত আদলটি স্পষ্ট হয়ে উঠে। এ প্রক্রিয়ার মধ্যে মহান নেতৃত্বসুলভ অংশগ্রহণ নিহিত রয়েছে। পার্টির চেয়ারম্যানের মুখ দিয়ে যখন কোন নীতি ঘোষিত হয়, তখন এ নীতি শুধু পার্টি চেয়ারম্যানের

Dhaka University Institutional Repository

আন্তরিকতা, সদিচ্ছার চেতনার বহিঃপ্রকাশ না হয়ে লক্ষ কোটি মানুষের আন্তরিকতার, সদিচ্ছার চেতনার বহিঃপ্রকাশ হিসেবেও প্রকাশিত হয়, তখনই এ মহাপ্রক্রিয়া বা নেতৃত্ব সম্পন্ন হয়।[৬] বাংলাদেশের রাজনীতিতে রাজনৈতিক দলে নেতা নির্বাচনে যদি নেতৃত্বের উল্লিখিত প্রক্রিয়া নিশ্চিত করা যায় অর্থাৎ তৃণমূল থেকে কেন্দ্র পর্যন্ত নেতা নির্বাচনে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হয় প্রতিটি কর্মির মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা থাকে নেতা নির্বাচনে কর্মিদের মতামতের প্রতিফলন ঘটে। তবেই প্রকৃত নেতৃত্বের জয়যাত্রার সূত্রপাত হবে। কেন্দ্র ও শীর্ষ নেতৃত্বের মাঝে যতগুলো স্তর আছে বা থাকে প্রত্যেকটি স্তরের নেতা নির্বাচনে স্থানীয় কর্মিদের গোপন ভোটে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় সকল স্তরের নেতা নির্বাচন করা হয়। তবে নেতৃত্বের মতামত হয়ে উঠবে গণমানুষের মতামত। এ প্রক্রিয়ায় নেতাকে কোন প্রকার চাটুকারিতা, প্রতারণা, প্রলোভন বা স্বেচ্ছাচারিতা স্পর্শ করতে পারে না। রাষ্ট্র যথার্থ নেতার নেতৃত্বের সুফল পেতে থাকে। এ প্রক্রিয়ায় নেতা নির্বাচিত হতে ও নেতৃত্বকে ধরে রাখতে নেতাকে পর্যাপ্ত জনসম্পৃক্ততা, গণমানুষের প্রাণের ভষা উপলব্ধিকরণ, যথাযথ নিয়মনীতির প্রতি আনুগত্য, পর্যাপ্ত অধ্যয়ন, চিন্তা, গবেষণার মাধ্যমে নেতার মাঝে নেতৃত্বের সঠিক গুণাবলীর উন্মোধন, জাগরণ ও প্রকাশ নিশ্চিত হয়। দেশ ও জাতির কল্যাণে উপযুক্ত সময়ে উপযুক্ত নেতার নেতৃত্ব নিশ্চিত করতে হলে, নেতৃত্বের প্রক্রিয়াটি যথাযথ মূল্যায়ন, অনুশীলন, আত্মীকরণ ও উন্মোচন একান্ত আবশ্যক। এর মাধ্যমেই নেতৃত্বের সংকটনিরসনের প্রচেষ্টা সফল হবে বলে মনে করা হয়।

৫. জাতীয়তাবাদী নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা : স্বাধীনতাত্তোর বাংলাদেশে বিরাজমান রাজনৈতিক নেতৃত্বের ধারাটি জাতীয়তাবাদী চেতনায় পরিপুষ্ট নয়। যদিও বাংলাদেশের বৃহত্তর রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে স্বাধীনতা পূর্ববর্তী আন্দোলন সংগ্রামে বাংলাদেশের মানুষের মনের কথাটি-উপলব্ধি করে রাজনীতি করত বলে জনগণের একান্ত নিকটবর্তী হতে পেরেছিল। বিপুল গণসমর্থন অর্জন করতে সক্ষম হয়েছিল। কিন্তু স্বাধীনতা পরবর্তী আওয়ামী লীগ গণমানুষের স্বার্থের পরিপন্থী কর্মকাণ্ডে নিযুক্ত হয়ে দলকে গণবিচ্ছিন্ন করে ফেলেছিল। দলের নেতৃত্ব বিতর্কিত হয়ে পড়েছিল। মানুষ এক সময় যাকে অন্ধভাবেই ভালোবেসেছিল, তিনিই বিতর্কিত হতে লাগলেন। বন্ধু তাজউদ্দিনের সঙ্গে শেখ মুজিবুর রহমানের বিরোধ দেখা দিল। মূলত. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব তারই চিত্রময় ভাষায় "চাটার দল" কর্তৃক পরিবেষ্টিত হয়ে পড়েন। পতনের শেষ দৃশ্যে গণমানুষের নেতা হয়ে উঠলেন স্বৈরাচার, নির্যাতনকারী, একনায়ক। প্রতিষ্ঠা করলেন

৬। প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-১৩-১৪।

Dhaka University Institutional Repository

"বাকশাল"। মানুষের প্রতিবাদের ভাষা কেড়ে নিলেন। সকল দল ও সংবাদপত্র কেবল চারটি ছাড়া বন্ধ করে দিলেন। মানুষের মুক্তির নেতা "মুজিববাদ" প্রতিষ্ঠা করতে চাইলেন। ক্ষমতার নির্বিঘ্ন ও একচ্ছত্র উপভোগের প্রত্যাশায় করুণ পরিণতি ভোগ করলেন স্বপরিবারে জীবন দেয়ার মাধ্যমে। নেতৃত্বের জাতীয়তাবাদী চরিত্র বিসর্জন ও গণমানুষের আস্থা অর্জনে ব্যর্থতা ও সাম্রাজ্যবাদের খপ্পড়ে পড়াই নির্মম পরিণতির মূল কারণ বলে প্রতীয়মান হয়। পক্ষান্তরে জিয়াউর রহমানের রাজনীতি ছিল আওয়ামী লীগ এর রাজনৈতিক দর্শন থেকে পৃথক। কিন্তু এ পার্থক্য কেবল আকৃতিতে, অবয়বে, চেতনায় নয়। বরং তার রাজনীতি ছিল স্বাধীনতা বিরোধীদের সকল আদর্শ প্রতিষ্ঠায় বিশেষ ভূমিকা পালন। তিনি পাকিস্তানের আদলে দেশের সংবিধান, জাতীয়তাবাদ, অর্থনীতি রাজনীতিকে পরিচালিত করতে থাকেন। তার আমলে বাংলাদেশের রাজনীতিতে রাজাকার পুনর্বাসনের ব্যবস্থা তিনিই করে দিয়েছিলেন। তাঁর বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদের সঙ্গে রাজাকারদের কোন বিরোধ নেই। বিএনপি জাতীয়তাবাদী দল করে অথচ তার দলের নামটিও ইংরেজিতে অর্থাৎ জনগণের ভোট চায়, অথচ জনগণ থেকে দূরে থাকতে চায়। বিএনপি নামের ইংরেজিয়ানটি সাম্রাজ্যবাদের দিকে তার মুখবর্তিতার প্রতীকী প্রকাশ যেন সাম্রাজ্যবাদের তল্পিবাহক কখনো জাতীয়তাবাদী হতে পারেনা। বিএনপির জাতীয়তাবাদে ভারত বিরোধিতা, সাবেক পাকিস্তানের প্রতি পক্ষপাত এবং মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের মুখাপেক্ষিতা বিশেষভাবে সমুপস্থিত বলে অভিযোগ রয়েছে। অভিযোগটি যে মিথ্যা তা নয়।[৭] বর্তমান "আওয়ামী লীগ" ও "বিএনপি" কেউই জনগণের স্বার্থ দেখে না, দেখবে ধনীদের স্বার্থ। ধনীকে আরও ধনী হতে সাহায্য করবে। এ দুইয়ের কেউই সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী নয় বরং উভয়েই সাম্রাজ্যবাদের অনুগ্রহ প্রার্থী। অপর বৃহৎ রাজনৈতিক দল "জাতীয় পার্টির" আদর্শ ও দর্শন বিএনপির মতোই। বিদ্যমান বৃহৎ রাজনৈতিক দলের প্রচলিত নেতৃত্ব গণমানুষের ভাগ্য পরিবর্তনে বুলি সর্বস্ব আওয়াজ তুলছে। সাম্রাজ্যবাদের হাতে ক্রীড়নক এ সকল রাজনৈতিক দল ও তার নেতৃত্ব বিশ্বব্যাংক, আইএমএফ, বিশ্ববাণিজ্য সংস্থা, শক্তিধর আঞ্চলিক জোটসমূহের প্রেসক্রিপশন বাস্তবায়নেই কাজ করে যাচ্ছে।

দেশের মানুষকে বাঁচাতে হলে মূল যে কাজটি করতে হবে তাহলো বিদ্যমান আর্থ-সামাজিক বৈষম্য দূর করা। প্রচলিত রাজনৈতিক দল ও তার নেতৃত্বের ওপর বাঙালির দাবি নির্ভর করছেন। নির্ভর করছে সমাজ পরিবর্তনে বিশ্বাসী মানুষের উপর। অর্থাৎ যথার্থ অর্থে,

---

৭। নির্বাচিত রাজনৈতিক প্রবন্ধ ঃ সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, পৃষ্ঠা-৮১-৮২।

Dhaka University Institutional Repository

জাতীয়তাবাদীরা কি করবে তার ওপর। নেতৃত্ব ওই অংশকে দিতেই হবে। কিন্তু কোনো আন্দোলনই স্বতঃস্ফূর্ততার ওপর নির্ভরশীল হয়ে দীর্ঘস্থায়ী, কিংবা সুদূরপ্রসারী হতে পারে না। তাকে সংঘটিত হতে হয়।[৮] প্রকৃত দেশপ্রেমিক জাতীয়তাবাদী নেতার পক্ষেই সম্ভব বিদ্যমান ব্যবস্থার আমূল সংস্কার করে প্রতিটি নাগরিককে জাতীয়তাবাদী চেতনায় উজ্জীবিত করে ক্ষুধা, দারিদ্র, শোষণ, বঞ্চনা মুক্ত জাতি হিসেবে বাঙালিদেরকে প্রত্যাশিত উচ্চাসনে অধিষ্ঠিত করতে। তবে সকল প্রকার রক্তচক্ষু, ভয়-ভীতি প্রলোভনকে উপেক্ষা করার যোগ্যতাসম্পন্ন নেতার আবির্ভাব ঘটাতে হবে।

৬. সামরিক নেতৃত্ব : বাংলাদেশে সামরিকতন্ত্র ঐতিহ্যবাহী এ বাস্তব সত্য আমাদের অস্বীকার করার কোনই উপায় নেই। তাই একথা মেনে নিতেই হয় এদেশে শাসক হিসেবে বুদ্ধিজীবীরা হয় থেকেছেন দ্বিতীয় সারিতে অথবা নিজেদের বর্ধিত করেছেন সামরিক অভিজ্ঞতায়। বর্তমানকালেও আমরা তাই প্রত্যক্ষ করছি আইয়ুব, ইয়াহিয়া জিয়া, এরশাদ সকলেই এসেছেন সামরিকতন্ত্র থেকে। গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা কখনো এদেশে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়নি।

তাছাড়া বাঙালি চিরকাল বিদেশিদের দ্বারা শাসিত। তুর্কি, পাঠান, মোঘল আমলে বাঙলা অঞ্চলে তাদের সামরিক প্রতিনিধিরাই মূলত. সুবেদারি বা শাসনভার লাভ করেছে। সামান্য ব্যতিক্রম ছাড়া সকল সময়ই বাঙলা ছিল বিদেশি, বিজাতি-বিভাষী-বিধর্মীদের দ্বারা শাসিত। সামরিক বাহিনীর আদর্শ জনগণের গণতান্ত্রিক স্বার্থের প্রতিকূলে বিধায় সর্বদাই নেতৃত্বকে তা গণবিচ্ছিন্ন ও গণস্বার্থবিরোধী ভূমিকা দিয়েছে। অথচ এ ধারণা সর্বজনবিদিত, গণস্বার্থের পক্ষে গণআদর্শধারী গণবাহিনী ব্যতিরেকে রাজনীতির সামরিক নির্ভরতা অগণতান্ত্রিক শাসন-শোষণকে টিকিয়ে রাখারই বহিঃপ্রকাশ। তাই আমাদের মতো দেশে সামরিক শক্তিকে ঘৃণা না করে দূরে সরিয়ে না রেখে বরং সম্পূর্ণভাবে সামাজিক রাজনৈতিক অঙ্গনে একীভূত / অঙ্গীভূত করে নেয়াই সঙ্গত। প্রয়োজন হলো সেনাবাহিনীর বর্তমান আদর্শের পরিবর্তন।

স্বাধীনতাত্তোর বাংলাদেশে আমাদের রাজনৈতিক অঙ্গনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলছে যে সকল প্রধান রাজনৈতিক দল তার প্রধান দুটির জন্ম সেনা ছাউনিতে। সেনা নায়কের নেতৃত্বের হাত ধরেই তার পথ চলা। যদিও বামপন্থীরা ১৯৭৫-এর পট পরিবর্তনের পর সেনাবাহিনীর হাত ধরে বাংলাদেশে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার স্বপ্নে বিভোর হয়ে উঠেছিলেন। কিন্তু কতগুলো

৮। প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৮৬।

Dhaka University Institutional Repository

ধারাবাহিক ক্যু ও পাল্টা ক্যু-এর মাধ্যমে অসংখ্য সেনা অফিসার ও জওয়ানের রক্তাক্ত হত্যাকাণ্ডের মধ্যদিয়ে বুর্জোয়া সমর্থিত অংশ সফল হয়। বিতাড়িত হয় সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন। সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়। বাংলাদেশ পুনরায় বুর্জোয়া শাসন শোষণের চক্রে আবদ্ধ হয়। আজকের বাংলাদেশের অর্থনীতি ও রাজনীতি বুর্জোয়া নেতৃত্ব ও আদর্শ কবলিত। সমাজতন্ত্রের পুনরাবির্ভাবের সম্ভাবনা প্রায় তিরোহিত। রাষ্ট্রের এমন অবস্থায়, রাজনীতির বর্তমান পর্যায়ে সামরিক বেসামরিক নেতৃত্বের জাতীয় স্বার্থরক্ষাকে অগ্রাধিকার দিয়ে ন্যূনতম ঐক্যের ভিত্তিতে গণমানুষের ভাগ্য পরিবর্তনে একযোগে কাজ করলে হয়তোবা নেতৃত্বের সংকটকাটিয়ে উঠতে কিছুটা হলেও সহায়ক হবে। নবতর নেতৃত্বের জন্ম বিকাশ ও বিস্তৃতি সম্ভব হবে। যা সর্বমহলেরই কাম্য হওয়া উচিত। অন্যথায় অকার্যকর সরকার ব্যবস্থার যে ধারাবাহিকতা চলছে অদূর ভবিষ্যতে বাংলাদেশ একটি ব্যর্থ রাষ্ট্রে পরিণত হলে আমাদের এত কষ্টের এত গৌরবের স্বাধীনতা স্বার্বভৌমত্বও বিপন্ন হতে পারে। যা কোনো মহলের জন্যই শুভ হবে বলে মনে হয় না।

৭. নেতৃত্বের উত্তরাধিকার ধারা বদলাতে হবে ঃ মুক্তিযুদ্ধের চেতনাভিত্তিক সুখি, সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে তুলতে হলে বর্তমান রাজনীতির মূলভিত্তি হবে জ্ঞান, মেধা ও কর্মদক্ষতা, অর্থ সম্পদ ও শক্তি নয়। দলের অভ্যন্তরে সুনির্দিষ্ট "আচরণবিধি" থাকলে সদস্য পদ ও নেতৃত্বের প্রক্রিয়ার গুণগতমান বাড়বে। পৃথিবীর অনেক দেশেই দলীয় "নৈতিক আইন" (Ethics Act) রয়েছে। যেখানে দলের নেতাদের জন্য সুনির্দিষ্ট গুণাবলীর ব্যাখ্যা থাকে। সে সঙ্গে নিয়মতান্ত্রিকভাবে পরিচালিত হওয়ার জন্য যথাযথ মূল্যায়ন পদ্ধতি বলবৎ থাকে, যা সঠিক আচরণবিধি মানার জন্য উৎসাহিত করা হয়। মূল্যবোধ ও রাজনীতি আত্মীকরণ, সুশাসন ও নেতৃত্বের কলাকৌশল অনুধাবন করে সরকার পরিচালনায় জনগণের কল্যাণকে প্রাধান্য দেয়া আগামী রাজনৈতিক নেতৃত্বের কাছে প্রধান প্রত্যাশা। বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে প্রধান দলগুলোর সবচেয়ে বড় সমস্যা দাঁড়িয়েছে শীর্ষ নেতৃত্বের পতন। বিগত পনের বছরের দ্বন্দ্ব, দুর্নীতি, অপশাসন, রাষ্ট্র পরিচালনার নৈতিকতার অভাব বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ও বিএনপিকে পর্যুদস্ত করেছে। সে সঙ্গে "উত্তরাধিকারের রাজনীতি দলগুলোকে করেছে স্থবির, সঙ্কীর্ন অগণতান্ত্রিক। প্রায় ২৫ বছরের রাজনৈতিক দলের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, তাদের নেতৃত্ব ছিল উত্তরাধিকার থেকে প্রাপ্ত সঙ্কীর্ন, অনির্বাচিত এবং স্থবির। শেখ হাসিনা বাংলাদেশের স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কন্যা হিসেবে ১৯৮১ সালে বাংলাদেশ

Dhaka University Institutional Repository

আওয়ামী লীগের সভাপতি মনোনীত হন, পার্টির ভাঙ্গনের মুখে। তিনি কোন দিনও নির্বাচনের সম্মুখীন হননি। অনুরূপভাবে বেগম খালেদা জিয়া বিএনপির চেয়ারপারসনের পদে আসীন হন ১৯৮১ সালে প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের মৃত্যুর পর। দুই শীর্ষ নেতৃত্ব সকল প্রকার জবাবদিহিতার উর্ধ্বে এবং তাদের কার্যক্রম দলীয় নিয়ন্ত্রণের আওতায় কখনো পরিচালিত হয়নি। দলীয় সদস্যগণও শীর্ষ নেতৃত্বের অভিশাপ থেকে বাঁচতে কখনোই তাদের সিদ্ধান্ত ও ভূমিকার বিরোধিতা করতে সাহসী হয়নি। কেউ কখনো করে থাকলে তাকে চরম মূল্য দিতে হয়েছে। অনুরূপ অবস্থাই বিরাজ করছে জাতীয় পার্টিও ক্ষেত্রেও। এমনই পরিপ্রেক্ষিতে গণতান্ত্রিক রীতিনীতির চর্চার অভাবে এবং আইনী কাঠামোর অনুপস্থিতিতে বাংলাদেশের শীর্ষ নেতৃত্ব কখনোই দায়িত্বশীল ও জনকল্যাণকে দলের মুখ্য চালিকাশক্তি হিসেবে গ্রহণ এবং বাস্তবায়িত করার চেষ্টা করেনি। এরই ফলশ্রুতিতে দলীয় নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি "অথবা" কর্মসূচি ক্ষমতা লাভের পর গুরুত্ব পায়নি।[৯] প্রকৃতপক্ষে "দলীয় ক্ষমতা" কেন্দ্রীভূতকরণ" (Centralization) বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলগুলোকে সত্যিকারভাবে জনগণের "প্রতিনিধিত্বমূলক" সংগঠন হিসেবে গড়ে উঠতে বাধার সৃষ্টি করেছে।[১০] দলীয় ও জাতীয় নেতৃত্ব ভয়াবহ সঙ্কটের মুখোমুখি হয়েছে।

অর্থবহ রাজনীতি, গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক সাংস্কৃতিক চর্চা, সুনির্দিষ্ট লক্ষাভিমুখী যোগ্য, দক্ষ, কার্যকরী নেতৃত্ব যার দৃষ্টান্ত আমরা স্বাধীনতা পূর্ব বাংলার রাজনীতিতে লক্ষ্য করেছিলাম তা ফিরিয়ে আনতে হলে আজ আর একবার পুরো জাতিকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। উত্তরাধিকারের স্থবির রাজনীতি স্থলে গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত সময়ের সবচেয়ে যোগ্য নেতা নির্বাচন করে নেতৃত্বের আসনে বসিয়ে বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক রাজনীতির ধারাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। অন্যথায় জাতি হিসেবে আমরা কেবলই একস্থানে স্থির হয়ে পড়ব। অগ্রসরমান বিশ্বের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে না পারলে আমাদের স্বাধীনতার স্বপ্ন "আঁধারই" থেকে যাবে। একটি সাধারণ নির্বাচনে মারাত্মক ভরাডুবির পরও সেই দলের নেতৃত্ব বহালতবিয়তে দিন কাটায়। কথার ফুলঝুরি ছড়ায়। একের পর এক মিথ্যে অজুহাত দেখিয়ে যেতে থাকে। জাতিকে অসত্য গল্পে বিভোর করে। বিভেদ সৃষ্টি করে সমাজে। হানাহানি ছড়ায় জনসাধারণের মধ্যে। অপেক্ষায় থাকে শাসক দলের ব্যর্থতার সুফল পরবর্তী নির্বাচনে ঘরে তুলতে। এ যদি হয় অবস্থা তাহলে

৯। ESSAYS ON DEMOCRACY AND LEADERSHIP BANGLADESH PERSPECTIVES, PROFESSOR DR. ATAUR RAHMAN, Page-156-157

১০। প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-১৫৮।

Dhaka University Institutional Repository

ওই সকল রাজনৈতিক নেতার নেতৃত্বে জাতির পশ্চাতধাবন ছাড়া অগ্রগতি কি আদৌ সম্ভব। আর এ জাতীয় নেতৃত্বকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের কোন সূত্রমতে প্রগতিশীল নেতৃত্ব, যোগ্য নেতা বলা যায় তা কারও কাছে বোধগম্য নয়। যদি বলা হয় তাদের অবর্তমানে দেশ নেতৃত্বশূন্য হয়ে পড়বে তাহলে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠে যাদের অবর্তমানে তারা তাদের স্থলাভিষিক্ত হয়েছেন তাদের মৃত্যুর পর কী দেশ এরচেয়ে খারাপ চলেছে? তাহলে তারা কিভাবে বলেন, তাদের উত্তরাধিকার শাসন আমল ছিল স্বর্ণযুগ।

কাজেই জাতীয় অগ্রগতি ও নেতৃত্বে প্রাণ সঞ্চালনের স্বার্থে আজ এটা গণদাবিতে পরিণত হয়েছে মানুষ উত্তরাধিকারের নেতৃত্ব চায় না। মানুষ চায় গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার নেতৃত্ব। যার মাধ্যমে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও জনমতের সর্বোচ্চ প্রতিফলন ঘটা সম্ভব।

৮. রূপান্তরিত নেতৃত্ব : বিখ্যাত রাষ্ট্রবিজ্ঞানী জেমস ওটুল তার Leading change বইতে নেতৃত্বের পরিবর্তন প্রক্রিয়ায় জনগণের সম্পৃক্ততা বিষয়ে গুরুত্ব দিয়েছেন। দেশ ও অবস্থান ভেদে নেতৃত্বের বিকাশ ঘটে সামাজিক ও রাজনৈতিক অংশগ্রহণের কাঠামো সৃষ্টির মাধ্যমে। আজ বাংলাদেশে প্রয়োজন নতুন নেতৃত্বের উন্নয়নকল্পে এমন একটি সম্পূর্ণ ব্যবস্থা গড়ে তোলা যেখানে গড়ে উঠবে জনকল্যাণ কেন্দ্রিক ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দু। দারিদ্র, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, পরিবেশ, এলাকার উন্নয়ন, মানুষের অধিকার ইত্যাদি বিষয়ে নতুন আঙ্গিকে কাজ করবে সে নেতৃত্ব। নতুন কল্যাণকর কৌশল নিয়ে তারা জনগণের সঙ্গে সংযোগ সৃষ্টি করবে। তাদের কাজের কেন্দ্রবিন্দু হবে অকৃত্রিমতা, জবাবদিহিতা ও সাধারণদের নিয়ে উন্নয়নের কাঠামো সৃষ্টি করা। এ নেতৃত্বের মডেল হবে কার্যকর সহযোগিতা এবং গোটা বিশ্বকে আস্থায় এনে সমস্যার সমাধানের ব্যবস্থা নেয়া। নিজ আদর্শ ও মূল্যবোধের প্রতি তারা হবে শ্রদ্ধাশীল এবং একটি অংশগ্রহণমূলক আদর্শের ওপর ভিত্তি করে তারা দেশের মানুষের সেবা করবে। এটাই হলো নেতৃত্ব বিশারদদের মতে, রূপান্তরিত নেতৃত্ব। বাংলাদেশের বর্তমান ক্রান্তিকালীন সমাজ ব্যবস্থায় এ রূপান্তরিত নেতৃত্ব গতানুগতিক রাজনৈতিক নেতৃত্বের চেয়ে বেশি অবদান রাখতে পারে জাতি গঠনে।[১১]

একটি গতিশীল জাতি হিসেবে বাংলাদেশের সম্ভাবনা রয়েছে একটি স্থিতিশীল, উদার মুসলিম অধ্যুষিত রাষ্ট্রে পরিণত হওয়ার যদি আজকের এ যুগ সন্ধিক্ষণে সঠিক রাজনৈতিক নেতৃত্বের বিকাশ হয়। পুরনো নেতৃত্ব আজ বাংলাদেশকে অনুপ্রাণিত করতে পারছে না। নতুন নেতৃত্ব

১১। প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১৫৩।

Dhaka University Institutional Repository

বিকাশের পথও খুব সুগম নয়। বাংলাদেশ বেছে নিয়েছে গণতন্ত্রের পথ এবং অর্জনও কম নয়। কিন্তু রাজনৈতিক নেতৃত্বের জটিল মেরুকরণ প্রক্রিয়ায় বাংলাদেশ গণতন্ত্রের সুফল অর্জন করতে পারেনি। সুশাসন প্রতিষ্ঠা করতে ব্যর্থতার প্রমাণ দিয়েছে। জনগণের রাজনৈতিক অংশগ্রহণের মাত্রা, সংসদের গুণগতমান, সভ্যিকার রাজনৈতিক পছন্দের স্বাধীনতা, বিচার প্রক্রিয়া ও মানুষের নিরাপত্তা অসংহত রয়ে গেছে। রাজনৈতিক সহিংসতা ও দুর্নীতি প্রতিরোধ করা সম্ভব হয়নি। শাসন পরিচালনার প্রতিষ্ঠানগুলো শক্তিশালী দক্ষ ও দায়িত্বশীল করার অপেক্ষায় রয়েছে। এ ধরনের প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠার ক্ষেত্রে রাজনৈতিক মূল্যবোধ সম্প্রসারিত হয়নি। সৎ, দেশ প্রেমিক ও বিজ্ঞ নেতৃত্বের অভাব জাতিকে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিকভাবে পর্যুদস্ত করেছে, করছে।[১২]

বলতে গেলে প্রচলিত নেতৃত্ব আজ ব্যর্থ ও বিপর্যস্ত। আজ প্রয়োজন এমন এক নেতৃত্বের যাদের সংঘাতময় রাজনীতি ভেঙ্গে ফেলার সাহস আছে। যারা দেশ ও জনগণের স্বার্থে নিজ স্বার্থকে গৌণ করার প্রজ্ঞা দেখতে পারবে। যারা সরকারের সর্বস্তরে দায়িত্বশীল ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে দুর্নীতি ও অব্যবস্থাপনা রোধ করতে পারবে। বিখ্যাত নেতৃত্ব বিশারদ রোনাল্ড হাইফেটজ তার "Leadership without easy answer" গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, আজকের বিশ্বে নেতৃত্ব অনেক জটিল এবং ভবিষ্যত অনিশ্চিত। তাই তিনি সমাজ অথবা রাষ্ট্রের পরিবর্তনের মুখে নেতৃত্বকে সাযুজ্যপূর্ণ কাজের প্রক্রিয়ার ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন যেখানে নেতার ভূমিকা হবে অংশগ্রহণের নতুন কাঠামো সৃষ্টি করা এবং পরিবর্তনের পদক্ষেপগুলি বাস্তবায়নে নতুন প্রজন্মের নেতৃত্বধারা সৃষ্টির প্রক্রিয়ায় উন্মুক্ত করা।[১৩] যা নেতৃত্বের সংকটনিরসনের কার্যকরী হাতিয়ার বলে গণ্য হবে।

৯. নেতৃত্বের সুশাসন : বাংলাদেশে বিরাজমান নেতৃত্ব সুশাসন বা Good Governance এর মাপকাঠিতে উত্তীর্ণ নয়। Good Governance বা সুশাসনের অভাবে বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় প্রশাসনযন্ত্র থেকে শুরু করে সমাজ ব্যবস্থার প্রতি রন্ধ্রে রন্ধ্রে দুর্নীতি অনুপ্রবেশ করে পুরো দেশটাকে বেসামাল করে ফেলেছে। দুর্নীতিতে বিশ্বসেরা খেতাবে ভূষিত করেছে। এশিয়ার অর্থনৈতিক ড্রাগন সিঙ্গাপুরের সাবেক প্রধানমন্ত্রী লী কুয়ান ইউ'র মতে Good Governance বলতে বুঝায় ঃ

১২। প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-১৫৩।
১৩। প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-১৫৩।

Dhaka University Institutional Repository

প্রথমত-সৎ ও প্রত্যয়দীপ্ত নেতৃত্ব।

দ্বিতীয়ত-দেশের সকল স্তরের জনগণ ও পেশাজীবীদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ. সম্পৃক্ততা, যা যাচাই হবে নিয়মিতভাবে অনুষ্ঠিত শান্তিপূর্ণ ও সুষ্ঠু নির্বাচন এবং পেশাজীবীদের সঙ্গে মতামত বিনিময়ের মাধ্যমে। যাকে বলা হয় অংশীদারিত্বমূলক গণতন্ত্র (Participatory Democracy)।

তৃতীয়ত-অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও অগ্রগতিতে জনগণের ন্যায্য হিস্যা। সেটা নিশ্চিত হবে সামাজিক বণ্টনের (Social distribution)-এর মাধ্যমে।

চতুর্থ-সঠিক নীতিমালা গ্রহণ, দিক নির্দেশনা দান ও তা বাস্তবায়নে ঐকান্তিক আগ্রহ ও সদিচ্ছা।

এছাড়াও অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক মুহাম্মদ আনিসুর রহমান Good Governance বা সুশাসনের দুটি মাপকাঠি নির্ধারণ করেছেন, প্রথমত. নিয়মিত ব্যবধানে নির্বাচন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে নেতৃত্বের প্রতি জনমত যাচাই এবং দ্বিতীয়তঃ আইনের দৃষ্টিতে সকল নাগরিকই যাতে সমমর্যাদা লাভ করতে পারে তা নিশ্চিত করা।[১৪]

অতএব বলা যায়, নেতৃত্বের সংকটনিরসনের উপায় হিসেবে আমাদেরকে তত্ত্ব ও ন্যায়নীতির বিচারের মানদণ্ডে যেমন নেতাকে মূল্যায়ন করতে হবে তেমনি যোগ্যতা, দক্ষতা অভিজ্ঞতা এবং মানুষ ও দেশের প্রতি গভীর ভালোবাসা, দরদ দায়বদ্ধতা সর্বোপরি মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়নে Committed বা অঙ্গীকারাবদ্ধ নেতা পাবার যাবতীয় সূত্রবদ্ধ প্রচেষ্টা যেমন চালাতে হবে তেমনি প্রত্যাশায় বুক বাঁধতে হবে। হয়তোবা একদিন প্রত্যাশিত নেতার আবির্ভাব ঘটবে, দেশ জেগে উঠবে বিশ্ব দরবারে আপন মহিমায় আসন করে নেবে এরই সঙ্গে নেতৃত্বের সংকট ঘুঁচবে।

নেতৃত্বের সংকটনিরসনের উপরিউক্ত কারণগুলি ছাড়াও আরও যেসকল কার্যক্রম, চিন্তাচেতনা, অনুশীলন, প্রতিপালন একান্ত আবশ্যকতা হলো ঃ

১. নেতৃত্বের জাতীয় মুক্তির চেতনায় পরিপুষ্ট হওয়া একান্ত আবশ্যক।

২. নেতৃত্বের জনগণ সম্পৃক্ততা নিশ্চিতকরণ।

১৪। হোসেন, সৈয়দ আবুল, গণতন্ত্র, নেতৃত্ব ও উন্নয়ন : । পৃষ্ঠা, ৯-১০।

Dhaka University Institutional Repository

৩. নেতৃত্বের ক্ষমতা প্রয়োগ তত্ত্বের জ্ঞান।

৪. নেতৃত্বের খ্যাতির ধারণা বর্জন।

৫. নেতৃত্বের সর্বোচ্চ দেশ প্রেম।

৬. নেতৃত্বের প্রতিভার ধারণা প্রয়োগ।

৭. নেতৃত্বের ঐতিহ্যবোধ লালন ও চর্চা।

৮. আদর্শ বদলের নেতৃত্ব পরিহার।

৯. নেতৃত্বের প্রান্তিক ধারণা।

১০. নেতৃত্বর ওপর থেকে নয় ভেতর থেকে উঠে আসতে হবে।

১১. নেতৃত্বের গণতান্ত্রিকতা।

১২. দুর্নীতি মুক্ত নেতৃত্ব।

১৩. চেতনানির্ভর ও অঙ্গীকার দীপ্ত নেতৃত্ব।

১৪. বামরাজনীতির ভ্রান্ত নীতি পরিহার।

১৫. শেকড়হীন ভাসমান বা প্রবাস নেতৃত্ব বর্জন।

১৬. নীতির নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা ক্ষমতার নেতৃত্ব নয়।

১৭. শিক্ষাক্ষেত্রে লেজুড়বৃত্তির রাজনীতি বর্জন প্রকৃত ছাত্র সমাজভিত্তিক নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা।

১৮. চিন্তাশীলের নেতৃত্ব প্রবর্তন।

১৯. রাজনৈতিক অর্থনীতিভিত্তিক নেতৃত্ব।

২০. নেতৃত্বের সর্বব্যাপক রাজনীতিকরণ তিরোহিত করতে হবে।

২১. নেতৃত্ব তৈরির আবহ সৃষ্টি করতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

উপসংহার:

অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সময়ের প্রয়োজনে, বাস্তবতায় নিরিখে "নেতৃত্বের সংকট প্রেক্ষিত বাংলাদেশ" বিষয়টি গবেষণায় স্থান পেয়েছে। একথা ঐতিহাসিকভাবে সত্য যে, সঠিক নেতৃত্ব জাতিকে সাফল্যের বন্দরে পৌঁছে দেয়। নেতৃত্বের ব্যর্থতায় জাতি-অমানিশার অন্ধকারে হাবুডুবু খায়। নেতৃত্ব বলতে প্রধানত রাজনৈতিক নেতৃত্বকেই ইঙ্গিত করা হয়। এছাড়া সিভিল সমাজও জাতির ক্রান্তিকালে নেতৃত্বে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। স্বাধীনতাত্তোর বাংলাদেশে রাজনৈতিক নেতৃত্বের সংকটযেমন পরিলক্ষিত হয়েছে তেমনি যথার্থ ভূমিকা পালন করতে দেখা যায়নি। যার ফলশ্রুতিতে আজ বাংলাদেশের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অঙ্গন বিপর্যস্ত। বিশ্ব সভায় বাংলাদেশের অবস্থান ক্রমাগত নিম্নগামী। মানুষের জীবনমান সর্বনিম্ন স্তরে। সবার মনে হতাশা। সর্বত্র অস্থিরতা, নীতি, আদর্শ ও মনুষ্যত্বের অভাব সর্বত্র কমবেশি পরিলক্ষিত হচ্ছে। যারা নিরীহ, আদর্শ পরায়ন ও একান্তভাবে সাধারণ তারা বড় অসহায়।

আদিম সমাজই নেতৃত্বের সুতিকাগার। যুথবদ্ধ জীবনে সবচেয়ে শক্তিমান ব্যক্তিকেই নেতা বলে গণ্য করা হতো। পশু শিকার বা সংঘবদ্ধ বিরুদ্ধ শক্তির মোকাবেলায় তারা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতো। আদিম মাতৃতান্ত্রিক সমাজে মা নেতৃত্বের আসন অলংকৃত করতেন। পিতৃতান্ত্রিক সমাজে পিতা। এছাড়া আদিম সমাজে গোত্রপতি, সামন্ত সমাজে সামন্ত প্রভু ছিল নেতা। পরবর্তীতে বিভিন্ন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী, সমাজবিজ্ঞানী, দার্শনিক ও মনোবিজ্ঞানী বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে নেতৃত্বের সংজ্ঞা দিয়েছেন। নেতৃত্বের বৈশিষ্ট্য শ্রেণীবিভাগ, গুণাবলী কাজ ও মাত্রা নির্দেশ করেছেন। (দেখুন, প্রথম অধ্যায় তাত্ত্বিক আলোচনা)।

স্বাধীনতাত্তোর বাংলাদেশের রাজনীতিতে তিনটি প্রধান দল ও দলীয় সরকার দেশ পরিচালনা করে আসছে।

প্রথমত-আওয়ামী লীগ প্রধান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর শাসনামল ও তার উত্তরাধিকার।

দ্বিতীয়ত-বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (**বিএনপি**) প্রধান জেনারেল জিয়াউর রহমানের শাসনামল ও তার উত্তরাধিকার

তৃতীয়ত-জাতীয় পার্টি প্রধান জেনারেল হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদের শাসনামল।

Dhaka University Institutional Repository

দেশ স্বাধীন হবার পর পাকিস্তানের কারাগার থেকে ১০ই জানুয়ারি ১৯৭২ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তন করেন এবং যুদ্ধবিধ্বস্ত ও নব্য স্বাধীন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর পদ অলংকৃত করেন এবং ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট শাহাদাৎ বরনের পূর্ব পর্যন্ত ক্ষমতায় ছিলেন।

বিশ্বজুড়ে এটা লক্ষ্য করা যায় যে, স্বাধীনতা অর্জনের পর নেতৃত্ব দানকারী জাতীয়তাবাদী দল শাসনকারী দল হিসেবে খুব একটা সফল হতে পারে না। তেমনি স্বাধীনতা অর্জন পর্যন্ত আওয়ামী লীগ একক যোগ্য ও সুষ্ঠু নেতৃত্বদান করলেও স্বাধীনতাত্তোরকালে সুশৃঙ্খলভাবে দেশের শাসন ব্যবস্থা পরিচালনা করতে ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছেন। দেশে ব্যাপক সন্ত্রাস, দুর্নীতি, সীমান্ত চোরাচালান, প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও ভ্রান্ত পররাষ্ট্র নীতির ফলে বাংলাদেশ আন্ত র্জাতিক চক্রান্তের শিকারে পরিণত হয়। ১৯৭৪ সালে দেশে দেখা দেয় এক ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ। আওয়ামী লীগ স্বাধীনতা আন্দোলনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করলেও এবং দেশের মানুষকে আশার বাণী শুনালেও স্বাধীনতাত্তোরকালে শাসনকারী দল হিসেবে তা পূরণ করতে সক্ষম হননি। এমনকি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সংসদীয় গণতন্ত্রের সমর্থক হয়েও ক্ষমতায় এসে একদলীয় শাসন (বাকশাল) প্রতিষ্ঠায় প্রয়াস চালিয়ে ছিলেন। নেতার আদর্শচ্যুতির খেসারাত তাকে জীবন দিয়েই দিতে হয়েছিল। (দেখুন, দ্বিতীয় অধ্যায়,শেখ মুজিবুর রহমানের শাসনামল।)

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের শোকাবহ ঘটনায় বঙ্গবন্ধু স্বপরিবারে নিহত হয়েছিলেন। এরপর বাংলাদেশের সামরিক বাহিনীতে ঘটে পরপর তিনটি অভ্যুত্থান। সর্বশেষ ৭ নভেম্বরের অভ্যুত্থানের মাধ্যমে জেনারেল জিয়া ক্ষমতার পাদ প্রদীপে চলে আসেন। বঙ্গবন্ধুকে স্ব-পরিবারে হত্যা করাকে সমর্থন দিয়ে জেনারেল জিয়া যে হত্যাকাণ্ডের রাজনীতি শুরু করেছিল তার আমলে ২১তম বিদ্রোহে ১৯৮১ সালের ৩০ মে জীবন দিয়ে তিনি তাঁর ঋণ শোধ করে গেছেন । জেনারেল জিয়ার অনভিপ্রেত ও অপরিণামদর্শী নেতৃত্বে কারণে বাংলাদেশে স্বাধীনতা বিরোধী শক্তি যারা ১৯৭১ সালে গণহত্যা চালিয়েছিল, বুদ্ধিজীবী হত্যা করেছিল তারা ক্রমান্বয়ে শক্তিশালী হয়ে উঠে। দেশে বিভাজনের রাজনীতি শুরু হয়। যার মাশুল গুণতে হচ্ছে জাতিকে আজও। এর শেষ কোনদিন হবে কি না কে জানে?

Dhaka University Institutional Repository

যদিও মহকুমাকে জেলায় উন্নীত করে এবং থানাগুলোকে উপজেলায় উন্নীত করে নির্বাচিত চেয়ারম্যানের মাধ্যমে স্থানীয় শাসনের একটি টেকসই ও যুগোপযোগী ইউনিট 'উপজেলা পরিষদ' গঠন করেছিলেন, এ সময় দেশে অবকাঠামোগত ব্যাপক উন্নয়ন সাধিত হয়েছিল, কিন্তু কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতির কারণে জেনারেল এরশাদ সরকার তেমন গ্রহণযোগ্যতা অর্জন করতে পারেনি, অতঃপর ১৯৯০ সালের ৬ ডিসেম্বর জেনারেল এরশাদ ক্ষমতা পরিত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিল। (দেখুন, দ্বিতীয় অধ্যায়, হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদের শাসনামল)।

বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমেদকে উপরাষ্ট্রপতি (নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকার) নিয়োগের পর ১৯৯১ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি পঞ্চম জাতীয় সংসদ নির্বাচন হলে জেনারেল জিয়াউর রহমানের সহধর্মীনি বেগম খালেদা জিয়া ও তার দল বিএনপি নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন। বিএনপি প্রধান বেগম খালেদা জিয়ার স্বৈরতান্ত্রিক মানসিকতা শাসনকার্যে বিভিন্ন অনিয়ম ও দুর্নীতি এবং সর্বশেষ বিভিন্ন উপনির্বাচনে বিএনপির ব্যাপক কারচুপি সকল বিরোধী দলকে একই প্লাটফর্মে নিয়ে আসে। এবং সকল দলের প্রচন্ড বিক্ষোভ ও আন্দোলনের মুখে ভোটার বিহীন নির্বচনে গঠিত ষষ্ঠ জাতীয় সংসদে "নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকার" ব্যবস্থার আইন পাশ করে বেগম খালেদা জিয়া ক্ষমতা ত্যাগ করতে বাধ্য হন। এভাবেই আমাদের সংবিধানে বিপুল আন্দোলনের ফল "অনির্বাচিত নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক ব্যবস্থা" সংযোজিত হয়। (দেখুন, দ্বিতীয় অধ্যায়, বেগম খালেদা জিয়ার শাসনামল)।

অবশেষে দীর্ঘ ২১ বছর পর আওয়ামী লীগ ও বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা ওয়াজেদ ১৯৯৬ সালের ১২ জুন সপ্তম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে সরকার গঠন করেন এবং সংসদ নেত্রী ও প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হন। এ সময় মোস্তাক-জিয়া আমলের Indeminity অধ্যাদেশ বাতিল করে বঙ্গবন্ধুর আত্মস্বীকৃত খুনিদের বিচারের আওতায় আনেন। ১৫ আগস্টকে জাতীয় শোক দিবস ঘোষণা করেন। গঙ্গার পানি বন্টন চুক্তি, পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তিসহ বেশকিছু গুরুত্বপূর্ণ কাজ করলেও দলটি ধীরে ধীরে জনসমর্থন হারাতে থাকে এবং ২০০১ সালে জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিপুলভাবে পরাজিত হন। (দেখুন, দ্বিতীয় অধ্যায়, শেখ হাসিনার শাসনামল)।

বাংলাদেশের রাজনীতিতে নেতৃত্বের সঙ্কটের বহুবিধ কারণ বিদ্যমান থাকলেও প্রশাসনিক দুর্বলতা, রাজনৈতিক জ্ঞান ও দক্ষতার অভাব, নেতৃত্বের দুর্নীতিপরায়নতা, নেতৃত্ব সংক্রান্ত

Dhaka University Institutional Repository

প্রাতিষ্ঠানিক জ্ঞানের অভাব, মনস্তাত্ত্বিকও সাংস্কৃতিক সংকটএবং সর্বোপরি নেতৃত্বের ঐতিহ্যের সংকট সংক্রান্ত বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করে নেতৃত্বের সঙ্কটের কারণ উদঘাটনের চেষ্টা করা হয়েছে। (দেখুন, তৃতীয় অধ্যায়)।

আপামর জনসাধারণের মুক্তির বিশাল প্রত্যাশা নিয়ে দেশ স্বাধীন হলেও মানুষের প্রাপ্তি ন্যূনতম পর্যায়েই রয়ে গেছে। মানুষের বঞ্চনার শেষ আজও হয়নি। চোখের সামনে সোনার বাংলা শ্মশানে পরিণত হয়েছে। গণমানুষের অর্থনৈতিক মুক্তি আসেনি। কিছুসংখ্যক লোক সমস্ত অর্থসম্পদের মালিক হয়ে গেছে। অশিক্ষা, অনাহার, বেকার সমস্যা, সন্ত্রাস, দুর্নীতি দৈনন্দিন ঘটনায় পরিণত হয়েছে। মানুষের জীবনের মূল্য নেই বললেই চলে। (দেখুন, চতুর্থ অধ্যায়ে)।

সিভিল সোসাইটির একটি রাষ্ট্রের সর্বোত্তম শ্রেণী। তাদের ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা যেকোনো অসম্ভবকে সম্ভব করতে পারে। একাডেমিক সংস্থা, শ্রমিক সংস্থাসমূহ, পেশাজীব বেসরকারি সংগঠন, সাংবাদিক সংস্থাসমূহ, এনজিও এবং থিয়েটারসংস্থাসমূহ বাংলাদেশের নেতৃত্বের সংকট নিরসনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারেনি। (দেখুন, পঞ্চম অধ্যায়)।

পরিশেষে বলা যায়, আদর্শ নেতার যাবতীয় গুণাবলী পুষ্ট নেতৃত্ব যেমন জাতির ভাগ্য বদলের প্রধানতম হাতিয়ার তেমনি প্রতিটি নাগরিক শিক্ষা, সংস্কৃতি, সুনাগরিকের গুণাবালী অর্জন করে যদি নেতার পাশে দাঁড়ায় জাতি গঠন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে তবেই দূরীভূত হবে নেতৃত্বের সংকট, ফিরে আসবে সুশাসন। জাতি উন্নতি, অগ্রগতি ও সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে যাবে। বিশ্বের দরবারে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবে। সেদিনই মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে মানুষ যে মুক্তি চেয়েছিল সেই সুমহান মুক্তি মিলবে। (বিস্তারিত দেখুন, ষষ্ঠ অধ্যায়ে)। বাংলাদেশের রাজনীতিতে নেতৃত্বের সংকটবিদ্যমান থাকলেও অদূর ভবিষ্যতে এ সঙ্কটের নিরসন হওয়ার ক্ষেত্রে এ গবেষণা ভূমিকা রাখবে বলে আশাবাদ রইল।

Dhaka University Institutional Repository

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী (Book References)

বাংলা গ্রন্থ

চৌধুরী, ড. হাসানুজ্জামান আওয়ামী লীগ ও বাকশাল ১৯৭২-৭৫, সিলেট: বাংলাদেশ প্রকাশনী, ১৯৮০

চৌধুরী, ড. হাসানুজ্জামান বাংলাদেশের রাষ্ট্র ও সরকারের সামরিকীকরণ, ঢাকা; ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, (ইউ.পি.এল.), ১৯৯১।

চৌধুরী, ড. হাসানুজ্জামান, বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক বাস্তাবতা ও রাজনীতি, ঢাকা; বর্ণালী প্রকাশনী, ১৯৮৫, ১৯৮৬, ১৯৮৭।

চৌধুরী, ড. হাসানুজ্জামান, নবপ্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের সংসদীয় ব্যবস্থা, ঢাকা; অক্ষর, ১৯৯২।

চৌধুরী, ড. হাসানুজ্জামান, সামরিক রাজনীতির চালচিত্র বাংলাদেশ পরিপ্রেক্ষিত, ঢাকা আহমদ পাবলিশিং হাউস, ১৯৯৩।

চৌধুরী, ড. হাসানুজ্জামান, ১৫ই আগষ্টের সামরীক অভ্যুত্থান মুজিব হত্যা ও ধারাবাহিকতা, ঢাকা; অঙ্কুর প্রকাশনী, ১৯৯৪, ২০১০।

চৌধুরী, ড. হাসানুজ্জামান, আমাদের ভবিষ্যৎ ও করণীয়; নব্বইয়ের যৌথঘোষণার আলোকে, ঢাকা; রাজনীতি গবেষণা ব্যুরো ১৯৯৯।

ম্যাসকারেনহাস, বাংলাদেশ: এ লিগেসি অব ব্লাড ভাষান্তর বাংলাদেশ: রক্তের ঋণ, অনুবাদক : শাহজাহান মোহাম্মদ, হাক্কানী পাবলিশার্স, ফেব্রুয়ারি-২০০২।

সিদ্দিকী ড. রেজওয়ান, বাংলাদেশ ভারত সম্পর্ক ও পার্বত্য চট্টগ্রাম, সূচীপত্র, ফেব্রুয়ারী, ২০০৪।

রহমান হাবিবুর, পার্বত্য চুক্তি ও পাহাড়ে শান্তির সম্ভাবনা, অ্যাডর্ণ পাবলিকেশন, একুশে গ্রন্থমেলা ২০০৫।

Dhaka University Institutional Repository

ওবামা বারাক, দ্য অ্যাডাসিটি অব হোপ, অঙ্কুর প্রকাশনী, ২০০৮।

মকসুদ, সৈয়দ আবুল, রাজনীতি ও ধর্মীয় রাজনীতি, সূচয়নী পাবলিশার্স, ফেব্রুয়ারী ২০০২।

আরেফিন, এ এস এম সামছুল (সম্পাদিত) বাংলাদেশর নির্বাচন ১৯৭০-২০০১, বাংলাদেশ রিসার্চ এ্যান্ড পাবলিকেশন্স, ঢাকা-২০০৩।

আহমদ, এমাজউদ্দীন, বাংলাদেশ: রাজনীতির গতি প্রকৃতি ও অন্যান্য প্রবন্ধ, ঢাকা, বুকসোসাইটি, ১৯৮২।

উমর, বদরুদ্দীন, সামরিক শাসনও বাংলাদেশর রাজনীতি, ঢাকা খান ব্রাদার্স এন্ড কোম্পানী, ১৯৯৫।

তালুকদার, আব্দুল ওয়াহেদ, গণতন্ত্রের অন্বেষণায় বাংলাদেশ, ঢাকা, পাণ্ডুলিপি ১৯৯৩।

রেহমান, তারেক শামসুর (সম্পাদিত) সেনাবাহিনীর ভূমিকা ও উন্নয়ন প্রসঙ্গে, ঢাকা, এম আব্দুল্লাহ এন্ড সন্স, ১৯৯৪।

হক, ড. আবুল ফজল, বাংলাদেশের শাসন ব্যবস্থা ও রাজনীতি, টাউন স্টোর্স রংপুর, ২০০৩
হক, আজিজুল বাংলাদেশঃ সমাজ রাজনীতি ও গণতন্ত্র, ঢাকা কম্পিউটার্স, ১৯৯২।

চৌধুরী, সিরাজুল ইসলাম, গণতন্ত্রের পক্ষে বিপক্ষে, বিদ্যা প্রকাশ, ফেব্রুয়ারি-১৯৯০।

চৌধুরী, সিরাজুল ইসলাম, নির্বাচিত রাজনৈতিক প্রবন্ধ, অন্য প্রকাশ, একুশে বইমেলা-২০০০।

হোসেন, সৈয়দ আনোয়ার হোসেন, বাংলাদেশের রাষ্ট্র, রাজনীতি, গণতন্ত্র ও সুশাসন, একুশে বাংলা প্রকাশন, একুশে বইমেলা-২০০৬।

মনিরুজ্জামান, তালুকদার, বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংকটও বিশ্লেষণ, বাংলাদেশে কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ, মার্চ-২০০৯।

ছিদ্দিক, রহমত আলী, সামাজিক গবেষণার পদ্ধতি তত্ত্ব ও প্রয়োগ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা। মে-২০০২।

Dhaka University Institutional Repository

রহিম, ড. মুহাম্মদ আব্দুর, চৌধুরী ড. আবদুল মমিন, মাহমুদ ড. এ.বি.এম, ইসলাম, ড. সিরাজুল, বাংলাদেশের ইতিহাস, নওরোজ কিতাবিস্তান, মে-১৯৯৮।

আয়া, জেসমিন, বাংলাদেশের রাজনীতিতে নারী নেতৃত্ব, নারীকেন্দ্র, ফেব্রুয়ারি-২০০৪।

মেজর, জলিল রচনাবলী, সম্পাদনায় মজুমদার মাসুদ, মেজর জলিল পরিষদ, ১০ নভেম্বর-১৯৯৭।

ইসলাম, ড. সৈয়দ সিরাজুল, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, হাসান বুক হাউস, জুলাই-১৯৯০।

আহমেদ, তোফায়েল, *সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচি, কুমিল্লা সমবায়ের নবতর প্রাতিষ্ঠানিক পুনর্গঠন*, কুমিল্লা; বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, ২০০৪।

আহমদ, মোজাফ্ফর, *ক্ষুদ্র গ্রামীণ ব্যবসায় ব্যবস্থাপনা (সম্পাদিত)*, ঢাকা; এশিয়া প্যাসিফিক উন্নয়ন কেন্দ্র, ব্যবসায় প্রশাসন ইনস্টিটিউট, ১৯৮৪।

আহমদ, শাকির উদ্দিন, *বাংলাদেশে সমবায় আন্দোলন*, ঢাকা; ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব লোকাল গভর্নমেন্ট, ১৯৮৯।

আয়েশ উদ্দীন, মুহাম্মদ, *রাষ্ট্রচিন্তা পরিচিতি (প্লেটো থেকে মার্কস)*, ঢাকা; আইডিয়াল লাইব্রেরি, ১৯৮৩।

ইসলাম, সিরাজুল, *বাংলাদেশের ইতিহাস ১৭০৪-১৯৭১ (সম্পাদিত)*, ঢাকা; এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ১৯৯৩।

উদ্দিন মনির, *সমবায় গ্রামবাংলা*, ঢাকা; আহমেদ পাবলিকেশন, ১৯৭৮।

দেলোয়ার হোসেন, মোঃ শেখ, *শিক্ষা উন্নয়ন ঃ উন্নয়নশীল দেশের প্রতিশ্রুতি*, ঢাকা; শাকিল প্রকাশনী, ১৯৯৮।

ফারুক মুহাম্মদ,আবুল কাসেম, *সহজ সমবায় শিক্ষা*, কুমিল্লা; সংযোগ প্রকাশনী, ১৯৮৮।

বসু, নগেন্দ্রনাথ (সংকলিত), *বিশ্বকোষ পঞ্চদশ ভাগ*, কলিকাতা ; বসু এন্ড কোং, বাং-১৩১১।

Dhaka University Institutional Repository

বারী (সম্পাদিত), ফজলুল, *গ্রুপ সংগঠকদের মৌলিক প্রশিক্ষণ কোর্সে ব্যবহৃত হ্যান্ড আউটসমূহের* সংকলন, ঢাকা; বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড, ১৯৯৬।

ভট্টাচার্য, হরশংকর ও সুভাষ সোম, *জনপ্রশাসন ও জন অর্থনীতি*, কলিকাতা; ক্যালকাটা বুক হাউস, ১৯৮৯।

মাহমুদ আনু, *বাংলাদেশের এনজিও ঃ দারিদ্য বিমোচন ও উন্নয়ন*, ঢাকা; হাক্কানী পাবলিকেশন, ১৯৯৮।

মিত্র, সতীশচন্দ্র, *যশোর খুলনার ইতিহাস (২য়খণ্ড)*, কলকাতা; চক্রবর্তী চ্যাটার্জী এ্যান্ড কোং, বাং-১৩২১।

রহমান, মিজানুর, *বাজারজাতকরণ (তৃতীয় সংকরণ)*, ঢাকা; নিউ এজ পাবলিকেশন ।

সাদেক, মোঃ ও আবদুল হালিম, *বাংলাদেশের সমষ্টি উন্নয়ন ও পল্লী পুনর্গঠন*, ঢাকা; বাংলা একাডেমী, ১৯৭৬।

সিদ্দিকী, কামাল, *বাংলাদেশের গ্রামীণ দারিদ্র স্বরূপ ও সমাধান*, ঢাকা; শোভা প্রকাশ, ২০০২।

হক, আবুল ফজল, *বাংলাদেশের শাসন ব্যবস্থা ও রাজনীতি*, রংপুর; টাউন স্টোর্স, ১৯৯২।

হাবিবুর রহমান, এম, *সমষ্টি উন্নয়ন ও সমষ্টি সংগঠন*, ঢাকা; বাংলা একাডেমী, ১৯৯৯।

হামিদ, মুঃ আবদুল, *পল্লী উন্নয়ন বাংলাদেশে*, ঢাকা ; মুহাম্মদ ব্রাদার্স, ১৯৮৮।

Dhaka University Institutional Repository

ইংরেজী গ্রন্থ

Rahman, Ataur, Essays on Democracy and Leadership: Bangladesh Perspectives, Bangladesh Political Science Association. March 31, 2007.

Khan, Mizan R., Kabir Mohammad Humayan, Civil Society and Democracy in Bangladesh, Academic Press and Publishers Limited in Association with Bangladesh Institute of International and Strategic Studies Dhaka, January-2002.

Ahmed, Maniruddin, *Co-Operatives In Bangladesh (An Anerview),* Dhaka; Polwel Printing Press, 1989.

Bahadur, R.M.C, *Summary Of The Changes In Hurisdiction Of The Districts In Bangladesh, 1757-1916,* Calcutta; Bengal Secretarial Press, 1918.

Bailey, Jack., The British Co-Operative Movement, London; Hutchinson University, 1955.

Bedi, R,D., *Theory, History And Practice Of Co-Operation*, Meerut, INDIA; International Publishing House, 1971.

Begum, Dr. Afroza, *Government-NGO interface in Development Management*, Dhaka ;A H Development Publishing, 2010.

Birchall, Johnston., *Rediscovering The Co-Operative Advantage.* Geneva; Co-Operative Branch, International Labour Office. 2003.

Sobhan, Rehman., "Element And Social Issues In The Formulation Of Policy For The Handloom Industry," *The Bangladesh*

Dhaka University Institutional Repository

Development Studies, Vol. XVII, No. 1 & 2, March-June 1989, Dhaka; The Bangladesh Institute Of Development Studies.

Talukdar, Mobarak., "Some Historical Events And Documents Of Ancient," Co-Operatives. Co-Operation, Yearly Journal Of Co-Operative Department, Dhaka, 2002.

Chada, Mr.K.M., *Role Of Co-Operatives In Alleviation Of Rural Poverty And Unemployment*, New Delhi; Ministry Of Agriculture, 1996.

Choudhury, Hasanuzzaman, An Uncertain Beginning Perspectives on Parlieamentary Democracy in Bangladesh Calcutta: Naya Prokash, 1992.

Choudhury, Dr. Hasanuzzaman, Globalization and 'Market-Friendly' Myth A Provoking Note, Dhaka.. Center for Islamic Research, 2008.

Chaudhary, A, Rahim., *Social Co-Operatives For Rural Development,* Pakistan Lahore; Haqqani Printing Press, 1973.

Chowdhury, Pisush Kauti, Et-Al., *Co-Operative As Institutions For Development Of The Rural Poor,* Comilla; Bangladesh Academy For Rural Development, 1987.

Cole, G.D.H., *A Century Of Co-Operation,* Holyoake House, Hanover State, Manchester; Co-Operative Union Ltd, 1944.

Cherington, P.T., *Elements Of Marketing*. N.Y, Macmillan, 1920.

Dhaka University Institutional Repository

Converse, Huggy And Mitchel., *Element Of Marketing*, Englewood Cliffs N-J; Prentice Hall, 1965.

Digby, Margaret., *The World Co-Operative Movement*, London; Hutchinson University Library, 1960.

--------. Oxford; *Agricultural Co-Operation In The Common Wealth.* 1951.

Dumont, Rene. *Problem and Prospect For Rural Development In Bangladesh.* The Ford Foundation, Dacca, 1973.

Dutta, S.K. *Co-Operative Societies And Rural Development.* Mittal Publication's, New Delhi, India, 1991.

G.I, Hassis., *Rural Development Theories Of Peasant Economy And Agrarian Change,* London; Hutchinson And Company, 1982.

Harbison, Frederick & A, Cherlse Myers., *Education Manpower And Economic Growt,* New York;. Megraw Hill, 1964.

Hough, E.M., *The Co-Operative Movement Before Partition And Independent India (3rd),* London; Oxford University Press, 1953.

Hussi, Pekka, Et.Al., *The Development Of Co-Operatives And Other Rural Organisation,* Washington, D,C. U.S.A ; The World Bank, 1993.

I,C,A., *The Needs Of Co-Operative Movement Of Bangladesh,* New Delhi; Regional Office Of Education Centre For South -East Asia, 1972.

Dhaka University Institutional Repository

Jawad, Ali., *Economic Development, An Explanatory Eassay*, New Delhi; Anmol Publication Pvt, 1993.

Kamat, G.S., *New Dimensions Of Co-Operative Management,* Bombay; Himalay Publishing House, 1978.

Kotler, Philip., *Marketing Management,* New Delhi; Prentice Hall Of India Private Limited, 1996.

Kulkarni, K. R., *Theory And Practice Of Co-Operative In India And Abroad,* Bombay; Co-Operator's Book Depot, 1955.

Machima, Pradit, Et-Al., *Co-Oprative For Development Of The Rural Poor,* Dhaka; Centre On Integrated Rural Development For Asia And The Pacific, 1987.

Mercer, T.W., *Co-Operations Prophet.* Manchester; Co-Operative Union Limited, 1947.

Mukhopadhay, Swapna And Chee Peng Lim., *The Rural Non Firm Sector In Asia*, Kualalampur, Malaysia ; Asia And Pacific Development Center, 1985.

Olsan, H.M., *Some Principles and Practices of Farmers Co-Operatives,* Danvelle, U.S.A; The Interstate Printers And Publishing Inc. 1964.

O'Malley, L.S.S., *Bengal History Of India,* London; Oxford University Press, 1967.

Quddus (Edit), Md. Abdul., *Rural Development In Bangladesh,* Comilla; Bangladesh Academy For Rural Development, 1996.

Dhaka University Institutional Repository

Rahman, Dr. A.K.M. Motinur, *NGO and Development-Myth & Reality*, A H Dhaka; Development Publishing House, 2010.

Rahman, Mahamudur., *Development Of Agricultural Marketing In Bangladesh,* Comilla; Bangladesh Academy For Rural Development, 1974.

Roy, E.P., *Co-Operatives; Today And Tomorrow,* Danvelle, U.S.A; The Interstate Printers And Publishers Inc, 1964.

Shah, V.M., *Co-Operatives In Support Of Rural Development*, India; Kuruk Shetra, 1987.

SHING, KATAR. *Rural Development –Principles, Policies and Management,* New Delhi; SAGE Publications India Pvt. Ltd 2009.

Solaiman, M.Et-Al., *A Review Of Total Development Programme,* Comilla; Bangladesh Academy For Rural Development, 1980.

Tepper, Eliot., *Changing Patterns Of Administration In Rural East Pakistan,* Michigan State University ; Asian Studies Centre, 1966.

Westland, J., *A Report On The District Of Jessor; Its History And Its Commerce*, Calcutta; Bengal Secratarial Press, 1874.

World Bank., *Social Indicators Of Development 1990*, Baltimore, London; The Johns Hapkins University Press,

Ahmed Moudud, Bangladesh: Era of Sheikh Mujibur Rahman, UPL, Dhaka, 1983, P-250)

Dhaka University Institutional Repository

Ahmed, Maniruddin., "Strategies Of Co-Operative Development." *Co-Operative*, A Half Yearly Journal (January-June) 1987, Dhaka; Bangladesh Jatiya Somabaya Union.

Ahmed, Momtaz Uddin., "Financing Rural Industries In Bangladesh", *The Bangladesh Development Studies*, VOL. Xii, No, 1&2, (March-June) 1984, Dhaka; Bangladesh Institute Of Development Studies.

Ali, Md. Ashraf., "Development of Rural Co-Operative; Problems, Opportunity, Challanges and Remedial Measures", *Co-Operation*, Yearly Journal of Co-Operative Department, Dhaka, 2002.

Ali, Md. Harun, Et-Al., "Co-Operative For Improving Lot Rural Poor; The Lesson From BRDB", *Co-Operation*, Yearly Journal Of Co-Operative Department, Dhaka, 2001.

Aslam, M.,,"Rural Development Experience ; An Asian Perspective," *Afro-Asian Journal Of Rural Development*, Vol. XXXVII, No.2 July-December, 2004, New Delhi ; Afro-Asian Rural Development Organisation,

Azad, Md. Abul Kalam., "Socio-Economic Aspect Of Potato Marketing In Bangladesh", *Co-Operation*, Yearly Journal Of Co-Operative Department, Dhaka, 2001.

Chowdhury, Mukhlessur Rahman., "Co-Operative Marketing Of Agricultural Products," *Coperation*, Quarterly Journal, July-September, 1986, Bangladesh Jatiya Somabaya Union, Dhaka.

Dhaka University Institutional Repository

Deb, Nibaran, C, Et-Al., "Demand For Rural Industries Product In Bangladesh," *The Bagnladesh Development Studies*, Vol. XII, No. 1 & 2, March-June, 1984, Dhaka; Bangladesh Institute Of Development Studies.

Faruk, A.K.M., "Prospect's Of Development Of Marketing Co-Operatives In Bangladesh," *Co-Operation*, A Half Yearly Jouranal, January-June, 1988, Dhaka; Bangladesh Jatiya Somabaya Union.

Khan, Mizan R., Kabir Mohammad Humayun, Civil Society and Democracy in Bangladesh, BIISS, 2002.

Khan, G, N. Nazmul Hossain, "Co-Operative Movement And The Role Of State In Co-Operative Department In Bangladesh," Yearly Journal Of Co-Operative Department, Dhaka, 2000.

Khan, Md. Azizur Rahman, Et-Al., "A Prescription On Co-Operatives In Retrospect," *Co-Operation*, Yearly Journal Of Co-Operative Department, Dhaka, 2002.

Lian, Tan Kin., "The Unique Co-Operative Response To Globalisation," *Co-Operation*, Yearly Journal Of Co-Operative Department, Dhaka, 2002.

Mannan, M.A., "Rural Development In Bangladesh; A Study For Inter Country Comparative Analysis In SAARC Member Countries," Rural Development Academy, Bogra, 1987.

Momtaz, Salim., "Traditional Co-Operative System In Bangladesh ; Role Of Central Society And Its Relationship With Primary

Dhaka University Institutional Repository

Society", *Co-Operation*, Yearly Journal Of Co-Operative Department, Dhaka, 1993.

Nassar, Md. Abu., "Hundred Years Of Co-Operative Movement," *Co-Operation,* Yearly Journal Of Co-Operative Department, Dhaka, 2003.

----------., "The Present Scenario Of Co-Operatives In The South Asian Countries," *Co-Operation*, Yearly Journal Of Co-Operative Department, Dhaka, 2000.

Rahman, Khondaker Mizanur., "Co-Operatives In Hundrade Years," *Co-Operation*, October-December, 2004, Co-Operative Department, Dhaka.

Sattar, Md. Abdus., "Co-Operative Movement ; Its Socio-Economic Agenda," *Co-Operation*, Yearly Journal Of Co-Operative Department, Dhaka, 2000.

Sardar, Md. Abdur Rouf.,"Community Development In South-East Asia; An Approach Or An Apology," *Local Government Quarterly Journal*, Vol. 4, No. 1 To 4, 1975, Dhaka.

Dhaka University Institutional Repository

জার্নাল: বাংলা/ইংরেজী

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা, যুক্তসংখ্যা: ৮৩-৮৪ অক্টোবর ২০০৫ ও ফেব্রুয়ারী ২০০৬।

কলা অনুষদ পত্রিকা, খন্ড-২, সংখ্যা ২ ও ৩, জুলাই ২০০৬-জুন ২০০৮।

The Arts Faculty Journal Vol.2 Nos 2 & 3, July 2006-June 2008.

Social Science Review D. U. Vol-19 Number 1 June-2002.

A Quest for Stabilitary and Democracy, Asian Studies, No, 16.

Chowdhury, Dilara, Democarcy in Bangladesh: Problems and prospects, Asian studies No-12, 1993.

আওয়াল, মোঃ আবদুল, "দলীয় কর্মকাণ্ড টেকসহিকরণঃ পদ্ধতি ও গুরুত্ব" ফজলুল বারী (সম্পাদিত), *গ্রুপ সংগঠকদের মৌলিক প্রশিক্ষণ কোর্সে ব্যবহৃত হ্যান্ড আউটসমূহের সংকলন*, ঢাক; বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড, ১৯৯৬।

আবুল কাসেম, এম, "বিশ্বায়িত পরিবেশে সমবায় আন্দোলন" *সমবায়*, ৪৩ বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা, (অক্টোবর-ডিসেম্বর) ২০০১, ঢাকা ; সমবায় অধিদপ্তর ।

আবু নাসের, মোঃ, "দক্ষিণ এশিয়ার কয়েকটি দেশে সমবায়" *সমবায়*, ৪৩ বর্ষ- ২য় সংখ্যা, (এপ্রিল-জুন) ২০০১, ঢাকা; সমবায় অধিদপ্তর।

আলম, এম, খোরশেদ, "টেকসই উন্নয়ন এবং পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ" *বাংলাদেশ উন্নয়ন সমীক্ষা*, দ্বাদশ খণ্ড, বার্ষিক সংখ্যা, ১৪০১ বাং, ঢাকা; বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান।

আলী, মোঃ আশরাফ, "আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সমবায়" *সমবায়*, ৪৪ বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা, (অক্টোবর-ডিসেম্বর) ২০০২, ঢাকা; সমবায় অধিদপ্তর ।

আলী, সেকেন্দার, "বাংলাদেশে সমবায় আন্দোলন" *সমবায়*, ৪৪ বর্ষ, ১ম সংখ্যা (জানুয়ারি-মার্চ) ২০০২, ঢাকা; সমবায় অধিদপ্তর ।

Dhaka University Institutional Repository

আলী, শেখ মাকসুদ, "বাংলাদেশে দারিদ্র্য বিমোচন, উন্নয়ন, সংগঠন ও সামাজিক চুক্তি' *সমবায়*, ৪০ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, (এপ্রিল-জুন) ১৯৯৮, ঢাকা ; সমবায় অধিদপ্তর ।

আহমদ, মনির উদ্দীন, "শতবর্ষের সমবায় ঃ একটি মূল্যায়ন" *সমবায়*, ৪৭ বর্ষ- ১ম সংখ্যা, জানুয়ারি-মার্চ ২০০৫, ঢাকা; সমবায় অধিদপ্তর ।

আহমেদ, তোফায়েল, "অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন ও দরিদ্র হ্রাসকরণে সমবায় সেক্টরের পুনর্গঠন" *সমবায়*, ৪৭ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, (এপ্রিল-জুন) ২০০৫, ঢাকা; সমবায় অধিদপ্তর।

এরশাদ আলী, সৈয়দ, "প্রেক্ষিত; বাংলাদেশে সমবায়" *সমবায়*, ৪২ বর্ষ- ১মসংখ্যা, (জানু-মার্চ) ২০০০, ঢাকা ; সমবায় অধিদপ্তর, ।

করীম, প্রফেসর আনোয়ারুল, "একটি গ্রাম; একটি সংগঠন (এনজিও)" কুষ্টিয়া ; বাংলাদেশ ফোকলোর রিসার্স ইনস্টিটিউট-২০০৪ ।

কাদের, মোঃ আব্দুল, "সমবায়ের অতীত ও বর্তমান" *সমবায়*, ৪০ বর্ষ ৩য় সংখা, (জুলাই-সেপ্টেম্বর) ১৯৯৮, ঢাকা; সমবায় অধিদপ্তর।

কাসেম, মোঃ আবুল, "বাংলাদেশে দারিদ্র বিমোচন সম্ভব কি", *বাংলাদেশ উন্নয়ন সমীক্ষা* , দ্বাদশ খণ্ড, বার্ষিক সংখা, ১৪০১ বাং, ঢাকা ; বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান ।

খান, আবু সাইদ, "সমবায় ও স্বনির্ভরতা অর্জন", *সমবায়*, ৪৭ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, (জানু-মার্চ) ২০০৫, ঢাকা; সমবায় অধিদপ্তর।

খলিল, কে,এম, আই, "আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সমবায়ের ভূমিকা" *সমবায়*, ৪৪ বর্ষ, ২য় সংখা, (এপ্রিল-জুন) ২০০২, ঢাকা ; সমবায় অধিদপ্তর।

চৌধুরী, হাসানুজ্জামান, নয় বছরের সামরিক নিয়ন্ত্রনাধীন শাসন ও সামরিকীকরণ; প্রতিরক্ষা, স্বরাষ্ট্র ও পররাষ্ট্র মন্ত্রানালয়ের নমুনা চিত্র (পুস্তিকা), ঢাকা; প্রশাসনিক গবেষনা কেন্দ্র, ১৯৯১।

----------, "সমবায় ব্যবস্থাপনা গণতন্ত্রের চর্চা ও অধিদপ্তরের ভূমিকা", *সমবায়*, ৪০ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা (জুলাই- সেপ্টেম্বর) ১৯৯৮, ঢাকা ; সমবায় অধিদপ্তর।

----------," রচডেলের অগ্রণী সমবায়ের পূর্বেকার সময়", *সমবায়*, ৪৩ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, (জুলাই-সেপ্টেম্বর), ২০০১, ঢাকা ; সমবায় অধিদপ্তর।

Dhaka University Institutional Repository

----------,"বাংলাদেশে সমবায়ের ক্রমবিকাশ", সমবায়, ৪৪ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, (অক্টোবর-ডিসেম্বর), ২০০২, ঢাকা ; সমবায় অধিদপ্তর।

নাথ, নারায়ণচন্দ্র, "দারিদ্রের প্রত্যায়গত ধারণা এবং পরিমাপগত সমস্যা", *বাংলাদেশ উন্নয়ন সমীক্ষা*, দ্বাদশ খণ্ড বার্ষিক সংখ্যা, ১৪০১ বাং, ঢাকা ; বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান ।

বারী, কে, এ; ওয়াই হায়দার, "দারিদ্র্য বিমোচনে সমবায়ের ভূমিকা," *সমবায়*, ৪০ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, (এপ্রিল-জুন), ১৯৯৮, ঢাকা ; সমবায় অধিদপ্তর ।

মুন্সী, মোঃ শামছুদ্দিন," বাংলাদেশে অর্থনৈতিক উন্নয়নে শিল্প সমবায়", *সমবায়*, ৩৩ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, (জুলাই-সেপ্টেম্বর), ১৯৯১, ঢাকা ; সমবায় অধিদপ্তর ।

মান্নান, এম, এ, "উন্নয়ন; ধারণা ও সংজ্ঞা," ফজলুল বারী (সম্পাদিত) *গ্রুপ সংগঠকদের মৌলিক প্রশিক্ষণ কোর্সে ব্যবহৃত হ্যান্ড আউটসমূহের সংকলন*, ঢাকা ; বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড ১৯৯৬ ।

রহমান, আতিউর, "রবীন্দ্র ভাবনায় স্ব-উন্নয়ন ও আত্মশক্তি," *বাংলাদেশ উন্নয়ন সমীক্ষা*, দ্বাদশ খণ্ড, বার্ষিক সংখ্যা ১৪০১ বাং, ঢাকা ; বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান।

রায়, দিলীপ কুমার, "বাংলাদেশে গ্রামীণ শিল্পায়নে অনুসৃত নীতিমালা", *বাংলাদেশ উন্নয়ন সমীক্ষা*, সপ্তম খণ্ড, বার্ষিক সংখ্যা, ১৩৯৬ বাং, ঢাকা ; বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান ।

শহীদুল ইসলাম, খন্দকার, "তৃতীয় সহস্রাব্দে সমবায়ের অগ্রযাত্রা," *সমবায়*, ৪৩ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, (এপ্রিল-জুন) ২০০১, ঢাকা ; সমবায় অধিদপ্তর।

---------, "বাংলাদেশে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সমবায় এবং বর্তমান শতাব্দির চ্যালেঞ্জ," *সমবায়*, ৪৩ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, (অক্টোবর-ডিসেম্বর) ২০০১, ঢাকা ; সমবায় অধিদপ্তর।

সরকার, মোঃ আবদুর রশিদ, "বাংলাদেশের পল্লী উন্নয়নের কৌশল ঃ বিআরডিবি ও সমবায়ের ভূমিকা," *সমবায়*, ৪৭ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, (জানুঃ-মার্চ), ২০০৫, ঢাকা ; সমবায় অধিদপ্তর।

Dhaka University Institutional Repository

দৈনিক ও সাপ্তাহিক পত্রিকা (বিভিন্ন তারিখে)

দৈনিক সংবাদপত্র

দৈনিক ইত্তেফাক

দৈনিক বাংলার বানী

দৈনিক বাংলা

দৈনিক আজাদ

দৈনিক মুক্তিবানী

সংবাদ চিত্র

সাপ্তাহিক বিচিত্রা

সাপ্তাহিক পূর্ণিমা